প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

৩৩তম পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পাঠসংকলন দুটি প্রণীত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ-উপকরণ অবলম্বনে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল সংকলনের লেখক, সম্পাদক, পরিকল্পনায় প্রত্যেকের অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

পাঠসংকলনের বর্তমান আকার দিতে বিশেষভাবে যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন :

পাঠক্রম : পর্যায় : এফ. এস. টি.-৫

: অনুসৃজন :	**: সম্পাদনা :**
ড. বিজন কুমার মণ্ডল	ড. প্রতীপ কুমার চৌধুরী
ড. ইরা ঘোষ	অধ্যাপক পরিমল রায়
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ	অধ্যাপক সুব্রত দত্ত
	অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ
	অধ্যাপক সুকুমার সেন

পাঠক্রম : পর্যায় : এফ. এস. টি.-৬

: অনুসৃজন :	**: সম্পাদনা :**
ড. ভূপতি চক্রবর্তী	অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ	অধ্যাপিক আরতি দাশ
অধ্যাপিকা আরতি দাশ	অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী

পাঠক্রম : পর্যায় : এফ. এস. টি.-৭

: অনুসৃজন :	**: সম্পাদনা :**
ড. কল্লোল মুখার্জী	ড. দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী	অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী
	অধ্যাপক অশোক চৌধুরী

পাঠক্রম : পর্যায় : এফ. এস. টি.-৮

: অনুসৃজন :	**: সম্পাদনা :**
অধ্যাপক অমল চন্দ্র দাস	অধ্যাপক নিতাই চরণ মুখোপাধ্যায়
	অধ্যাপক দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

: প্রধান সম্পাদক :

অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

FST 5-8

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
5

একক 19 খাদ্য এবং কৃষি 9-33

একক 20 বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং সামাজিক বাস্তবতা 34-47

একক 21 খাদ্য ও পুষ্টি 48-72

একক 22 স্বাস্থ্য ও রোগ 73-104

পর্যায়
6

একক 23 মন ও দেহ 109-127

একক 24 আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক দিক 128-149

একক 25 তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 150-167

একক 26 যোগাযোগের পদ্ধতি 168-188

পর্যায়
7

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন

একক 27 শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 193-207

একক 28 প্রযুক্তি ও আর্থিক উন্নয়ন 208-226

একক 29 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—প্রথম ভাগ 227-249

একক 30 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—দ্বিতীয় ভাগ 250-275

পর্যায়
8

একক 31 উপলব্ধি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা 281-293

একক 32 বিজ্ঞান—উন্নয়নের পথ 294-304

কৃষি, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য

আগের চারটি পর্যায়ে আপনারা বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে শুরু করে পৃথিবী ও জীবনের উৎপত্তি এবং পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন।

এই পর্যায়ে আমরা শিখব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে কিভাবে আমাদের কৃষিকাজের উন্নতি করা যায় এবং খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায়। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট মাত্রায় বাড়লে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, প্রকৃত পুষ্টির গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করব। এই পর্যায়ের প্রথম দুটি এককে আমরা কৃষি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষত ভারতের পঠভূমিকায় আলোচনা করব কৃষিক্ষেত্রের মূল উপাদান, শস্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং এদের উৎপাদন বাড়াতে এখনও পর্যন্ত ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির রূপরেখা। বিকল্প খাদ্যের সংস্থান এবং তাদের উৎপাদন বাড়ানোর বর্তমান পরিকল্পনাও আমরা আলোচনা করব। আমাদের দেশে কতকগুলি এলাকায় শস্যের বৃদ্ধির জন্য বর্তমান অবস্থা পর্যাপ্ত নয়। আমরা দেখব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এ সমস্ত এলাকাকে কৃষিক্ষেত্রে কিভাবে লাভজনক করে তুলেছে। আধুনিক চাষবাস একটি জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এতে আছে প্রভূত পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার, বর্ধিত সেচের আকারে বিপুল শক্তির ব্যবহার এবং রাসায়নিক সারর ও কীটনাশকের প্রয়োগ। এগুলি একত্রে শস্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে। কিন্তু ইতিবাচক দিকগুলি বাদ দিলেও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে যা এখানে আলোচনা করা হবে। জৈব প্রযুক্তি এবং কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে আমরা শেষভাগে আলোচনা করব। যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য একটি সামাজিক দায়। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ ছাড়াও খাদ্যের গুণগত মানও শরীর সুস্থ রাখার পক্ষে জরুরী। পরবর্তী এককে আমরা তাই প্রকৃত পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব।

শরীর সুস্থ রাখতে পুষ্টির প্রয়োজন। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ যা খায় তা হল মূলত ধান, গম, জোয়ার এবং ভুট্টা জাতীয় খাবার। কিন্তু এই সমস্ত খাবারে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ কম মাত্রায় থাকে। এর ফলে প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন ছাড়াও অপুষ্টিজনিত সমস্যা উচ্চবিত্ত সমাজেও দেখা যায় মূলত সুষম খাদ্য-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতার জন্য। সুতরাং, সুস্বাস্থ্য ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা কমাতে আমাদের দেশে পুষ্টি-সংক্রান্ত জ্ঞান জরুরী।

এগুলি ছাড়াও স্বাস্থ্যহানি বা রোগের প্রাদুর্ভাবের আরও কারণ আছে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের জটিল সম্পর্কও অনেক সময় রোগের কারণ হয়ে ওঠে। পরিবেশগত কারণ যেমন বাতাস, জল, আবাসন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিবেশ দূষণ ব্যক্তিবিশেষ নয়, এমনকি সমগ্র সমাজেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে। আমরা যে জায়গায় বসবাস করি সেই পরিবেশের ওপর নির্ভর করে দৈহিক এবং মানসিক চাপও ভীষণভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। সুতারং রোগ প্রতিরোধ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তাই আমরা দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছু উপায় সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করছি।

মূল্য উদ্দেশ্য : এই পর্যায় থেকে আপনারা জানতে পারবেন :

★ কৃষি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

★ বিভিন্ন শস্য এবং বিকল্প খাদ্যের সংস্থান বাড়ানোর জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।

★ আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থার সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ।

★ সুস্বাস্থ্য এবং শরীর নীরোগ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধনের উপায়।

★ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং নির্মূল করার জন্য বিগত দুই শতাব্দীর প্রযুক্তিগত অবদান।

★ সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রতিরোধই প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায়—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধি।

একক ১৯ □ খাদ্য এবং কৃষি

গঠন

১৯.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১৯.২ ভারতে কৃষি—জীবনের একটি অঙ্গ

১৯.৩ কৃষির মূল উপাদানসমূহ

১৯.৩.১ সূর্যালোক

১৯.৩.২ মাটি

১৯.৩.৩ জল

১৯.৪ ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ

১৯.৫ কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

১৯.৫.১ খাদ্যশস্য

১৯.৫.২ ডাল ও সয়াবিন

১৯.৫.৩ তৈলবীজ

১৯.৫.৪ চিনি-শস্য

১৯.৫.৫ তন্তু-শস্য

১৯.৫.৬ আবাদি ফসল

১৯.৫.৭ আলু ও অন্যান্য কন্দ

১৯.৫.৮ ফল ও শাকসবজি

১৯.৫.৯ আবাদিবন

১৯.৬ কৃষিপ্রযুক্তি

১৯.৬.১ শস্যচক্র

১৯.৬.২ সার প্রয়োগ

১৯.৬.৩ ফসলের সুরক্ষা

১৯.৭ প্রাণীসম্পদ

১৯.৭.১ গবাদি পশু

১৯.৭.২ ভেড়া ও ছাগল

১৯.৭.৩ শূকর

১৯.৮ হাঁস-মুরগি

১৯.৯ মৎস্য চাষ

১৯.৯.১ সামুদ্রিক মৎস্য চাষ

১৯.৯.২ অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ

১৯.১০ সারাংশ

১৯.১১ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১৯.১২ উত্তরমালা

১৯.১ ভূমিকা

আপনারা ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে জেনেছেন যে প্রাচীন সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে খাদ্যের লভ্যতার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। পরবর্তীকালে চাষবাস শুরু হওয়ার ফলে খাদ্যের জোগান মানুষের কাছে সুনিশ্চিত হল। তখন তারা যাযাবর জীবন ত্যাগ করতে পারল। কৃষিকাজ এবং এর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল ব্যাপারগুলি আমরা এভাগে তুলে ধরব।

দ্বিতীয় এককে ২.৩ খণ্ডে কৃষি ও সভ্যতার উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। আপনারা ওই খণ্ডটি পুনরায় দেখে নিতে পারেন। এরপর আমরা খাদ্য ও কৃষি বিষয়ে আলোচনা করব। এই এককে আপনারা অনেক সংখ্যার উল্লেখ পাবেন। আপনাদের পক্ষে ওই সবই মনে রাখা সম্ভব নয়। এগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল পুরো বিষয়টির ওপরে আপনাদের কাছে একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ার পর আপনি যা পারবেন—

- কৃষির মূল উপাদানগুলির আলোচনা করতে;
- শস্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির তালিকা তৈরি করতে;
- বিভিন্ন কৃষি-প্রযুক্তি আলোচনা;
- বিকল্প খাদ্য ও তাদের উৎপাদন সম্পর্কিত অগ্রগতির বর্ণনা দিতে;
- কৃষির অগ্রগতির পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান উপলব্ধি করতে।

১৯.২ ভারতে কৃষি—জীবনযাপনের একটি উপায়

ভারতীয় অর্থনীতির মূলে আছে কৃষিকাজ। ভারতের প্রায় ২৪.৫ কোটি কর্মজীবী মানুষের মধ্যে প্রায় ৯.৩ কোটি মানুষ কৃষক, ৫.৬ কোটি মানুষ কৃষি-শ্রমিক (১৯৮১ সালে হিসাব অনুসারে)। অর্থাৎ ৬০ শতাংশ কর্মীমানুষই কৃষিকাজে নিযুক্ত। এই ১৪.৯ কোটি মানুষের কাছে কৃষি শুধু একটি মুখ্য পেশাই নয়, জীবনধারণের একমাত্র উপায়ও। ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকা হল ৩২.৯ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে ১৪.২ কোটি হেক্টর এলাকায় চাষবাস হয়। ৩.১ কোটি হেক্টর এলাকায় বছরে একাধিক বছরে একাধিক ফসলের চাষ হয়। সুতরাং, শস্য উৎপাদনের মোট এলাকা দাঁড়াল ১৭.৩ কোটি হেক্টর। ভারতে মোট বনভূমি প্রায় ৬.৭ কোটি হেক্টর এলাকা দখল করে আছে।

আমাদের মোট নীট জাতীয় উৎপাদন বর্তমান মূল্যে ১,৭৩,২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্র থেকে ৫৭,০৬৬ কোটি টাকা আসে। অরণ্য সম্পদ থেকে আসে ১৫৯৭ কোটি টাকা এবং মৎস্য থেকে ১৪৪৩ কোটি টাকা। আমাদের শ্রমিক সংখ্যার ৬০.৫ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক। কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিকরা মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩৪.৭ শতাংশ উৎপাদন করে থাকে। এই সংখ্যাগুলি আলোচনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদের মনে রাখতে হবে।

(১) আমাদের বেশিরভাগ কৃষক দরিদ্র। তাই, তাদের জমি থেকে সর্বাধিক ফসল পাওয়া সম্ভব হয় না।

(২) বর্তমানে কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকেদের বেশি সংখ্যায় কৃষিক্ষেত্রে কাজ দিতে আমাদের কৃষি-প্রযুক্তি ও কৃষিনীতি, অন্তত আগামী কিছু সময়ের জন্য, শ্রমিক-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। জোরালো শ্রমিক-সংকোচনশীল প্রযুক্তির প্রবর্তন বিপুল সংখ্যায় কৃষি-শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করবে। এজন্য গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র্য বাড়বে, ফলে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেবে।

সুতরাং আপনারা জানতে পারলেন যে আমাদের মানবসম্পদের একটা বড়ো অংশ কৃষিতে নিযুক্ত এবং কৃষিই তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়। এখন আমরা কৃষির মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করব।

১৯.৩ কৃষিক্ষেত্রে মূল উপাদান

কৃষিক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব অবদান বাদ দিলে মূল উপাদানগুলি হল সূর্যালোক, মাটি এবং জল। এগুলি একে একে আলোচনা করা হবে।

১৯.৩.১ সূর্যালোক

আমরা জানি সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারে না। গড়ে ১২ ঘণ্টা দিন হিসাবে আমরা পৃথিবীতে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৫০০ কিলো ক্যালোরি সূর্যের বিকিরিত আলোকশক্তি পেয়ে থাকি। এর মধ্যে গাছেরা সালোকসংশ্লেষের জন্য মাত্র ২২২ কিলো ক্যালোরি ব্যবহার করে। তত্ত্বগতভাবে যদি জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পুষ্টিকারক উপাদানগুলি উপযুক্তভাবে পাওয়া যায় তা হলে ১ বছরে ১ হেক্টর জমি থেকে ১৪০ টন শস্য পাওয়া

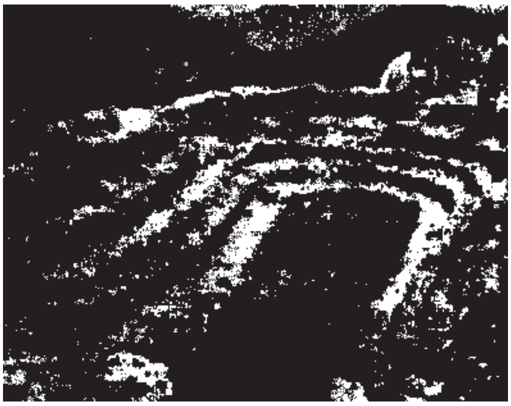

চিত্র ১৯.১ : বৃষ্টির জল ধরে রাখার জলাধার

সম্ভব। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ১ বছরে ১ হেক্টর জমি থেকে মাত্র ২৫ টন দানাশস্য পাওয়া যায়। বর্ষাকালে সূর্য বেশিরভাগ সময় মেঘে ঢাকা থাকে বলে প্রাপ্ত আলোর পরিমাণ কমে যায়। আবার, গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি

সূর্যালোক পাওয়া যায়। এ সময়ে অসুবিধা একটাই—জলের পরিমাণ সব থেকে কমে যায়। এমতাবস্থায় আমরা বর্ষার অতিরিক্ত জল নীচু জায়গায় জলাধারে (চিত্র ১৯.১) ধরে রাখতে পারি, যা গ্রীষ্মকালে শস্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সারা গ্রাম বা ব্লকের সহযোগিতা প্রয়োজন যেহেতু আর্থিক কারণে ব্যক্তিগতভাবে চাষিদের পক্ষে জলাধার তৈরি সম্ভব নয়। শীতকালে অবশ্য আলো ও মাটিতে রসের যোগান যথাযথভাবে পাওয়া যায় বলে এটিই বছরের চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

১৯.৩.২ মৃত্তিকা

পৃথিবীর উপরিভাগে ১ সেন্টিমিটার পুরু মাটি তৈরি হতে অন্তত ৫০ বছর সময় লাগে। কিন্তু প্রতি বছর বাতাস, জল এবং মানুষের অবহেলার কারণে সারা পৃথিবীতে ২৬ লক্ষ টন নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম এবং ৩৩ লক্ষ টন ফসফরাস-সহ ৬০০ কোটি টন মাটির অবক্ষয় হয়ে থাকে। মাটির এই অবক্ষয় প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল পর্যাপ্ত গাছ ও ঘাস দিয়ে মাটির উপরিতল ঢেকে রাখা। শস্য উৎপাদনের জন্য জমির প্রয়োজন খুব বেশি হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে জলপ্রবাহের রাস্তা ঠিক করা দরকার। আল-বাঁধ নির্মাণ এবং নালিপথে জলের গতিরোধের (gully plugging) ব্যবস্থা করে তারপর বাঁধের ওপর সবুজ সারের গুল্ম এবং বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে আমাদের দেশে শণ, ধৈঞ্চা, সেঞ্জি, বরবটি, বারসিম, কলাই, মশুর ইত্যাদি সবুজ সার জাতীয় শস্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

> আল-বাঁধ তৈরি হয় মাঠের মধ্যে মাটি জমা করে। নালিপথে জলস্রোতের গতিরোধ করতে ঝোপ, মাটি ও বালির বস্তা ব্যবহার করা হয়। এতে মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি থিতিয়ে যায় এবং মাটি অধিক জল শোষণ করতে পারে।

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, অনেক সভ্যতা ধ্বংসের মূলে আছে মাটির ভুল ব্যবহার। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট মাটি, ইট ও রাস্তা তৈরির জন্য নষ্ট করছি। এই অভ্যাস অবিলম্বে ত্যাগ করে বিকল্প ও বেশি স্থায়ী উপাদান দিয়ে ইট ও রাস্তা তৈরি করা উচিত।

আজ যে মানুষটি জন্মগ্রহণ করছে তার খাদ্যোৎপাদনের জন্য চাই ০.৪ হেক্টর জমি এবং বাসস্থান, রাস্তা, জলের ব্যবস্থা, শক্তি সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে আরও ০.০৮ হেক্টর জমি দরকার। অথচ, বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ ০.৩৩ হেক্টর। তাই এখনই জমির প্রকৃত মূল্য ও বৈজ্ঞানিকভাবে জমি ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে দেশজুড়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত। একথা বুঝতে হবে যে যদি আমরা আমাদের মৃত্তিকার অবহেলা করি তাহলে আমরা ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কায় পড়ব।

এখন দেখা যাক আমাদের দেশে কত ধরনের মাটি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকাকে প্রকৃতি অনুসারে ২৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সহজভাবে ভারতীয় মাটিকে ১০টি মূল শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। শস্য উৎপাদনের তুলনামূলক অনুপাতের বিচারে ভারতের মাটির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫৭.২ কোটি টন। পলি মাটিতে ১৫৩.৬ কোটি টন, কৃষ্ণ মৃত্তিকায় ১২৩.৬ কোটি টন, লাল মাটিতে ৫৩ কোটি টন, লাল হলুদ মাটিতে ৬৬.৯ কোটি টন, সমুদ্র-তীরবর্তী ও ব-দ্বীপের পলিমাটিতে ৭১.৩ কোটি টন, ও বাদামি রুক্ষ মরুভূমির মাটি ও পাথুরে মাটিতে ১৭.৬ কোটি টন ফসল ফলতে পারে।

আমরা জানি যে, আমাদের মাটি বিভিন্ন প্রকারের গুণযুক্ত। যে-কোনো মাটিতে ফসল বা অন্য কোন গাছ লাগানোর আগে বুঝতে হবে যে আমরা যে গাছ লাগাতে চলেছি আমাদের মাটি সে গাছের জন্য উপযুক্ত কিনা। তাই পুষ্টিকারক উপাদান ও ভৌত বৈশিষ্ট্যের জন্য মাটি পরীক্ষা করতে হয়। এটা জরুরি, কারণ মাটি যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে শুধু কম ফলনই নয়, মাটির ক্ষতিসাধনও হতে পারে।

১৯.৩.৩ জল

আমাদের দেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে জলের প্রয়োজন মেটাতে মূলত বৃষ্টির ওপরে নির্ভরশীল হতে হয়। এদেশের ১৪.২ কোটি হেক্টর নীট চাষের জমির মধ্যে মাত্র ৪ কোটি হেক্টর সেচ-সেবিত। বাকি জায়গাগুলি বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় কৃষিকে অনেক সময় মৌসুমি বৃষ্টিপাত নিয়ে জুয়াখেলা বলা হয়। এই বক্তব্যের পিছনে কিছুটা সত্যতা আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি বায়ুবৃত্তের মধ্যে ভারতের অবস্থান। এখানে বৃষ্টিপাত নিয়মিত নয় এবং সারাবছরে সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয়ও না। যে কারণে এদেশে বৃষ্টি-নির্ভর শস্যের ভালো ফলন হয় না। ভারতের অধিকাংশ জায়গায় সারাবছরে বৃষ্টিপাত ঘটে ৩ মাসেরও কম সময়ের জন্য আর বাকি সময় থাকে শুকনো। রাজস্থানের মতো জায়গায় ৩ দিন বৃষ্টির পর তিন বছর পর্যন্ত খরা চলতে পারে। প্রত্যেক বছরে ভারতের কোন না কোন অংশে খরা বা বন্যার প্রকোপ দেখা যায়, যা আমাদের অর্থনীতির পক্ষে চরম ক্ষতিকর। ভারতে খরার ইতিহাস বহু প্রাচীন।

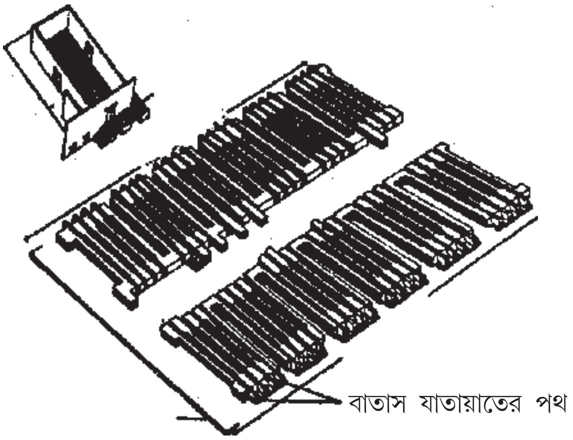

চিত্র ১৯.২ : হরপ্পার যুগের শস্যভাণ্ডার

মহাভারতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার উল্লেখ আছে। হরপ্পায় পাওয়া বিশাল শস্যাগার (চিত্র ১৯.২) যেমন ভালো কৃষি-ব্যবস্থার সূচক তেমনি এটি সম্ভবত খরার সময়ে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণে শস্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হত এমন ধারণাও করা যায়। ১৯৮৭ সালে এ শতাব্দীর জঘন্য খরা দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমাদের সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় সেই দুর্দশার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৭৭, ১৮৯৯ এবং ১৯১৮ সালে দেশজুড়ে খরার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। আবার ১৮৭৮, ১৮৯২ ও ১৯১২ সালে বিভিন্ন জায়গায় বন্যা দেখা দেয়। গড়ে প্রতি ৪ বছরে ভারতের এক এক অঞ্চলে এবং প্রতি ২০ বছরে ভারত জুড়ে খরার প্রকোপ দেখা যায়। অবশ্য খরা অথবা বন্যার ঘটনার ক্ষেত্রে কোন নিয়মিত পর্যায়ক্রম নেই। আমরা যেহেতু আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা বদলাতে পারি না, এই অনিয়মিত বর্ষাকে নিয়েই আমাদের বাঁচার উপায় বের করতে হবে। এদেশে ৩৭ কোটি হেক্টর-মিটার (১ হেক্টর-মিটার ১০,০০০ ঘন মিটারের সমান) বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়। দেশের অধিকাংশ জায়গায় মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর জন্য। আনুমানিক ৮ কোটি হেক্টর-মিটার বৃষ্টির জল মাটির নীচে চলে যায়। এর মধ্যে অর্ধেক মাটির ওপরের স্তরে থেকে গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে। বাকিটা মাটির আরও ভেতরে চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে যায়, যার $^{৩}/_{৪}$ অংশ আবার গাছের বৃদ্ধির জন্য, ব্যবহৃত হতে পারে। তবে বর্তমানে আমরা মাত্র $^{১}/_{৪}$ ভাগ ব্যবহার করছি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে

মাটির ভেতরের জল সতর্কভাবে পরীক্ষার পরই ব্যবহার করা উচিত। কেননা কিছু জায়গায় মাটিতে সঞ্চিত লবণের জন্য সেখানকার জল গাছের জন্য ব্যবহার করা যায় না। এই লবণ মাটির নীচের জলে মিশে থাকে, জল তোলার সাথে সাথে ওপরে উঠে আসে এবং মাটির ওপরে জমা হয়ে জমিকে অনুর্বর করে তোলে।

অনুশীলনী ১

(ক) ভারতবর্ষকে কেন কৃষি-নির্ভর দেশ বলা হয়? দু'তিনটি কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

...., ..., ...,

(খ) নীচের প্রদত্ত তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয় —————— মৌসুমি বায়ুর জন্য।

২। মোট যে পরিমাণ সূর্যালোক পৃথিবীতে পড়ে তার —————— এর কম গাছেরা সালোকসংশ্লেষের জন্য ব্যবহার করে।

৩। মাটির ক্ষয়সাধনের ফলে আমরা শুধু মাটিই হারাই না আরো অনেক —————— ও হারাই।

৪। —————— মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাকি নয় শ্রেণির তুলনায় সবচাইতে বেশি।

৫। আমাদের বেশিরভাগ কৃষিজমিই বর্ষার ওপর নির্ভরশীল এবং খুবই কম পরিমাণ, প্রায় —————— শতাংশ সেচ-সেবিত।

(পলি, দক্ষিণ-পশ্চিম, আঠাশ, পুষ্টিকারক দ্রব্য, অর্ধেক)।

১৯.৪ ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ

আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে আমাদের দেশে ২০,০০০-এরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই সংখ্যাটা পৃথিবীর যেসব দেশে আরো অধিক পরিমাণ জমি আছে তাদের চেয়েও বেশি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের মাটি ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের জন্য। এই ২০,০০০ প্রজাতির মধ্যে ৫০০ প্রজাতিকে কোন না কোন কাজে লাগানো হয় এবং গুল্ম, ওষধি ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছপালা ছাড়াও প্রায় ২৫০টি প্রজাতির উদ্ভিদ চাষ হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে প্রায় ৩৫টি প্রজাতির চাষ প্রথম শুরু হয় ভারত ও সংলগ্ন দেশগুলিতে। এই তালিকায় আছে—ধান, জোয়ার, খামালু, ডাল, বিন, সরষে, এশিয়ার তুলো, পাট, শণ, বেগুন, পালং শাক, শসা, বিভিন্ন প্রকারের কুমড়ো, গোলমরিচ, লংকা, আদা, হলুদ, এলাচ, আম, দারুচিনি, পিপুল, কচু, কলা, লেবু, কাঁঠাল, খেজুর, তেঁতুল, আমলকী, কুল, বেল, ফলসা, জাম ও বিভিন্ন ওষধি গুণসম্পন্ন গাছ।

প্রাণীদের মধ্যে ভারতে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল কুঁজবিশিষ্ট গবাদি পশু ও মোষের। অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার সময়ে কুঁজবিহীন গবাদি পশুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় গুজরাট ও রাজস্থানে (২৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) পাওয়া সীলমোহরে (চিত্র ১৯.৩)। রাজস্থানের কালিবাঙ্গানে সবচেয়ে পুরোনো (২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) কর্ষিত ভূমির প্রমাণ মেলে। আশ্চর্যের ব্যাপার মধ্যপ্রদেশে প্রথম লাল বনমোরগের (চিত্র ১৯.৪) দেখা মেলে যার থেকে সারা পৃথিবীর কুক্কুটবংশের উৎপত্তি।

এখন আমরা আমাদের দেশে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখি তাদের সবার উদ্ভব এদেশে প্রথম হয়নি। বেশ কিছু প্রজাতির গাছপালা ও গৃহপালিত পশু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাচীন যুগ হতে ব্যবসা সূত্রে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রজাতি আনা হয়েছিল সেগুলি হল : যব, গম, মশুর, মটর, সিম, পেঁয়াজ, রসুন, বিট, গাজর, মুলো, মেথি, জিরে, মৌরি, কালোজিরে, আলফা-আলফা, তিসি, বেলাডোনা, পোস্ত,

চিত্র ১৯.৩ : হরপ্পা-যুগের কুঁজবিহীন গবাদি পশু। খাবারের পাত্র থেকে বোঝা যায় পশুটি গৃহপালিত।

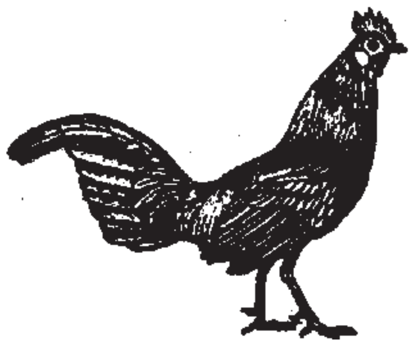

চিত্র ১৯.৪ : লাল বনমোরগ

ব্ল্যাক সাইলিয়াম, লাইকোরাইস এবং শিয়াল কাঁটা। আফ্রিকা থেকে এসেছিল জোয়ার, বাজরা, রাগি (মাড়ুয়া), বরবটি, রেড়ি, তিল, ঢ্যাঁড়স, গিণিঘাস, নেপিয়ার ঘাস ও কফি। এইভাবে চীন থেকে আনা হয়েছিল প্রোসোদানা, সয়াবিন, টুং, ট্যালো, লোকোয়াট, লিচু, পীচ, খুবানী, আখরোট ও চা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা প্রজাতিগুলি হল ব্রেডফ্রুট, (সবজি), বিলিম্বি, ক্যারামবোলা, বাতাবিলেবু, মিষ্টি কমলাবেলু, গন্ধলেবু, পাতিলেবু, ম্যাঙ্গো স্টীন (পূর্ব ভারতীয় ফল), নারকেল, সাবুদানা, তাল, সুপারি, পাম ও হেনা। আমেরিকা থেকে এসেছিল ভুট্টা, আলু, তামাক, মিষ্টি আলু, এরারুট, টম্যাটো, লংকা, লাউ, পেঁপে, পেয়ারা, আতা, চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, আমেরিকার তুলো, রবার, সূর্যমুখী, আঙুর, স্কোয়াশ ও সার্সাপারিলা। এই সমস্ত উদ্ভিদগুলি আমাদের দেশে পৌঁছানোর পর বৈচিত্র্যপূর্ণ মাটি ও আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্মভূমির তুলনায় বেশি ভালো ফল দিচ্ছে।

এর মধ্যে গম ও অধিকাংশ ডালশস্য আমাদের দেশে বিপুল খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এ সমস্ত ফসল চাষ করতে এদের বৈশিষ্ট্য উন্নত করার প্রয়োজন হয় যাতে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা কিছু উচ্চফলনশীল ও রোগ-প্রতিরোধী প্রজাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি নিয়ে আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

১৯.৫ কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

সাম্প্রতিককালে আমাদের কৃষি-উৎপাদনশীলতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উদ্ভিদসমূহের জিনগত গঠন (যেমন বেঁটে-জাত) ও গাছের বৃদ্ধির সময়সূচিতে পরিবর্তনই (যেমন গাছে ফুল আসার সময়ে) এই বর্ধিত উৎপাদনশীলতার কারণ। ধরা যাক কোন উদ্ভিদ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বোচ্চ ফলন দেয়। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বছরের যে-কোনো সময়েই এর লাভজনক ফলন সম্ভব করেছেন। এ ধরনের বহু উদাহরণ মেলে। গাছের বৃদ্ধির সময়সূচির পরিবর্তনের ফলে এখন বাজারে সবসময়েই আলু, সিম ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আপনারা অবহিত না হলেও আপনাদের বাবা-মায়েদের স্মরণে থাকবে যে এইসব ফসল কয়েক দশক আগে বছরের কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কয়েক মাস পাওয়া যেত। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের বৃদ্ধির সময়সূচির পরিবর্তনের মাধ্যমে।

১৯.৫.১ খাদ্যশস্য

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় যে সমস্ত শস্যের বীজ বোনা হয় সেগুলি হল খরিফ শস্য। উত্তর ভারতে জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হল খরিফ মরসুম। এর পর অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে লাগানো শস্য হল রবিশস্য। খরিফ শস্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, মাড়ুয়া ও অন্য ছোটো দানার শস্যই প্রধান। রবিশস্যের মধ্যে আছে গম, যব, ওট ও রাই।

ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান। চাষযোগ্য জমির প্রায় ৮০ শতাংশে ধানচাষ হয়। ১৯.৪ অংশে আপনারা পড়েছেন যে, ধান আমাদের দেশের প্রথম খেতে চাষ করা উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত লম্বা ও দুর্বল কাণ্ডের ধান চাষ করা হত। সূর্যালোক বা পুষ্টিকারক উপাদানগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে না পারার জন্য শিষে দানা কম হত (চিত্র ১৯.৫ দেখুন)। কিন্তু এখন উচ্চফলনশীল প্রজাতিগুলি খর্ব, শক্ত খড়বিশিষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে পাশকাঠি উৎপন্ন করে। সার প্রয়োগ করলে এগুলিতে ফলন বেড়ে যায় কারণ শিষে প্রচুর দানা জন্মায়। শিষের নীচের পাতা বা ধ্বজপত্র (flag leaf) সবসময় সোজা ও সবুজ থাকে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত। সেটি খাদ্য তৈরি করে দানায় পাঠায়, ফলে পুষ্ট দানা পাওয়া যায়। বেশিরভাগ নতুন প্রজাতির ফলনের জন্য কোন নির্ধারিত বিশেষ সময় নেই। এদের বছরের যে-কোনো সময়েই চাষ করা যায়। এগুলি গ্রীষ্মে, শীতে বা বর্ষাকালে অন্য শস্যের সাথে চাষ করা যেতে পারে।

এর ফলে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৫০ লক্ষ টন ধানের ফলনের তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫৯০ লক্ষ টন ধানের ফলন হয়েছে। হেক্টর প্রতি ফলন ২৮০ কেজি থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪২৫ কেজি। এই সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৯ কোটি থেকে ৭৫.১ কোটি, কিন্তু মাথাপিছু চাল পাওয়ার পরিমাণও বেড়েছে দিনপিছু ১৫৯ গ্রাম থেকে ২০৭ গ্রাম।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রবিশস্য গমের কাহিনি আরও চমকপ্রদ। ওই একই সময়ে হেক্টর প্রতি গমের ফলন ৮২৭ কেজি থেকে হয়েছে ১৮৭৩ কেজি। ফলনের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেশের কৃষিক্ষেত্রের চালচিত্র আমূল বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তনই সাধারণভাবে সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু গমের প্রাপ্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ গ্রাম থেকে দিন প্রতি ১৩০ গ্রাম।

যে সমস্ত জায়গায় আগে মাড়ুয়া, কোদো ইত্যাদি শস্য চাষ করা হত, উচ্চফলনশীল প্রজাতি বেরোনোর পর সেখানে এখন ধান ও গম চাষ শুরু হয়েছে। ফলে, এই সমস্ত শস্যের এলাকা ৪৪৭ লক্ষ হেক্টর (১৯৫৮-৫৯) থেকে

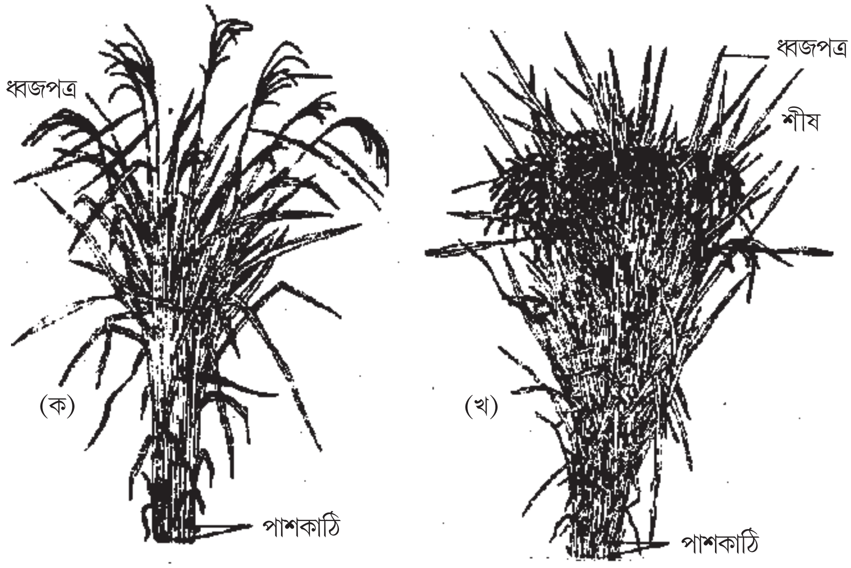

চিত্র ১৯.৫ : (ক) ধানের পুরাতন প্রজাতি (খ) উন্নত প্রজাতি।

১৯৮৪-৮৫ সালে ৩৯২ লক্ষ হেক্টরে নেমে দাঁড়িয়েছে। তবুও এই সময়ে ওই সব শস্যের উৎপাদন ২৩২ লক্ষ টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১২ লক্ষ টনে। এটা সম্ভব হয়েছে নতুন ও উন্নত প্রজাতির চাষের ফলে।

অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এই নতুন ও উন্নত প্রজাতি ব্যবহার করে ফলন বাড়ানোর ধারণা কাজে লাগানো হয়েছে। বিবর্তনের ইতিহাস ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গাছের 'ইডিওটাইপ' বা আদর্শ প্রজাতি তৈরি করেছেন। একটি গাছের অঙ্গসংস্থানগত, শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব রাসায়নিক আদর্শ বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ হল 'ইডিওটাইপ'। বিভিন্ন জার্মপ্লাজমের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে বিজ্ঞানীরা এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক করে যতগুলি সম্ভব বৈশিষ্ট্য একটি প্রজাতির মধ্যে সন্নিবেশ করতে চেষ্টা করেন।

১৯.৫.২ ডাল ও সয়াবিন

ভারতে খাদ্য তালিকায় ডালশস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। এগুলিতে প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নিরামিষাশীদের চাহিদা মেটানোর জন্য ডালের ব্যবহার জরুরি, কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই দুর্বল শ্রেণিভুক্ত এবং তাদের পক্ষে ডিম বা অন্যান্য প্রাণিজ প্রোটিন জোগাড় করা সম্ভব হয় না। ডালশস্য গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ডালশস্যগুলি বিশ্বজাতীয় এবং তারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

এবার আমরা দেশে যেসব ডালশস্য সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব। এদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অড়হর ডাল। আগেকার প্রজাতিগুলিতে পাতা ও শাখা-প্রশাখা বেশি থাকলেও শুঁটি বা দানা কম হত। বর্তমান প্রজাতিগুলি অনেক আঁটোসাটো আর সেগুলিতে শুঁটি ও দানার পরিমাণও বেশি। ১৫০ দিনে বর্তমান প্রজাতির অড়হরের ফসল পাওয়া যেতে পারে। আগে ফসল তোলার জন্য ৩০০ দিনেরও বেশি সময় লাগত, এখন লাগে ১৫০ দিনেরও কম। ছোলায় ছড়ানো গাছের বদলে প্রচুর শাখাবিশিষ্ট এবং খাড়া প্রজাতির সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলি নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে শুঁটি ধারণ করে। বৃদ্ধির পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে মুগ ও কলাই

এখন শীত ও গ্রীষ্মকালেও চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে রাজমা এখন সমতলেও চাষ করা যাচ্ছে যা আগে সম্ভব হত না।

ডালশস্যের চাষের ক্ষেছে শস্যের প্রজাতির তুলনায় শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফসল বুনতে ১৫ দিন দেরি হলে অনেক ক্ষেত্রে কোন ফলনই পাওয়া যায় না। এ সমস্ত শস্য ঠিক সময়ে একবার সেচ দিলে ফসল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে। বাতাসের নাইট্রোজেন যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া আবদ্ধ করে তারা ডালশস্যের শেকড়ে গুটি উৎপন্ন করে তার মধ্যে বাসা বাঁধে। এ কারণে এদের নাইট্রোজেন কম লাগে। কিন্তু এদের ফসফরাস দরকার, তাই মাটি পরীক্ষা করে যথাযথভাবে ফসফেট সার দিতে হবে। ভালো ফলন পেতে গেলে গাছ থেকে গাছে এবং সারি থেকে সারির মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখতে হবে, ঠিকভাবে সেচ দিতে হবে ও রোগপোকা দমন করতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত উচ্চফলনশীল প্রজাতির তুলনায় শস্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উন্নততর উপায় চাষিদের অজানা থেকে গেছে। ফলে ডালশস্যের ফলন সেভাবে বাড়েনি। ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদিত ডালশস্যের পরিমাণ ছিল ১১০ লক্ষ টন যা ১৯৮৬-৮৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ লক্ষ টনে। ইতিমধ্যে আমাদের জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়াতে মাথাপিছু ডালের পরিমাণ দিনে ৪০ গ্রামের থেকেও কমে গেছে (১৯৫৪-৫৫ সালে ছিল ৬০ গ্রাম), যেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে এটি অন্তত দিনপ্রতি ৮০ গ্রাম হওয়া উচিত। এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, কেননা আমাদের দেশের বিশাল সংখ্যক বাড়ন্ত বালক-বালিকার পেশির পুষ্টির জন্য ডালশস্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিন অপুষ্টি শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধিকেই ব্যাহত করে না, এটি বাচ্চাদের মানসিক বিকাশেরও অন্তরায় হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে সয়াবিন চাষের প্রতি নজর দেওয়ার দরকার আছে। যেখানে অড়হরের ১০০ গ্রাম বীজে ২২.৩ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়, সেখানে সয়াবিনের প্রতি ১০০ গ্রাম বীজে আছে ৪৩.২ গ্রাম প্রোটিন সয়াবিন যেখানে হেক্টর ২৯.৬ কুইন্টাল ফলন দেয়, সেখানে অড়হর উৎপন্ন হয় মাত্র ১৬.৬ কুইন্টাল। তা ছাড়া সয়াবিনের দানা থেকে ১৯.৫ শতাংশ তেলও পাওয়া যায় এবং উদ্ভিজ্জ তেল উৎপাদনে সয়াবিন পৃথিবীর শীর্ষস্থানে অবস্থা করছে। উঁচু জমিতে, ধানজমির আলে, তুলো, ভুট্টা, রাগি এবং অড়হরের সাথী হিসেবেব সয়াবিন চাষ করা যেতে পারে। সারা দেশেই সয়াবিনের চাষ করা যায়, তবে ঠাণ্ডা পাহাড়ি জায়গায় সয়াবিনের গুণগতমান ভালো হয় বলে দেখা গেছে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে সয়াবিন চাষ হয়। কিন্তু এর সুবিধাগুলো জানানো হলে ও বাজারজাত করার সুবিধা থাকলে সয়াবিনের চাষ অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে।

১৯.৫.৩ তৈলবীজ

আমাদের দেশে তৈলবীজ হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই চীনাবাদাম, তিল, নাইগার, রেড়ি, সরষের বিভিন্ন প্রজাতি, তিসি এবং কুসুমবীজ চাষ করা হয়ে থাকে। এই তালিকায় বর্তমানে সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং অয়েলপাম নতুন সংযোজিত হয়েছে। আমাদের ব্যবহার্য ভোজ্য তেল এই সমস্ত ফসলগুলি ছাড়াও তুলাবীজ, ধানের ভুষি, ভুট্টা, নারকেল এবং অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়।

যদিও ১৯৬৩-৬৪ সালে আমাদের বৈদেশিক অর্থাগমের ৭ শতাংশ ছিল তৈলবীজের অবদান, তথাপি আমাদের তৈলবীজের উৎপাদন কখনই বেশি ছিল না। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু তৈলবীজ উৎপাদন ২.৫ কেজির তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫.৫ কেজি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে মাথাপিছু উদ্ভিজ্জ তেলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.৭ কেজি থেকে বেড়ে ১.২ কেজি। কিন্তু প্রয়োজনীয় ৩০ গ্রাম তেল ও চর্বির তুলনায় একজন ভারতীয় একদিনে গড়ে মাত্র

১৫ গ্রাম তেল ও চর্বি পেয়েছে। সুষম খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও আমাদের দেশের খাবারে স্নেহপদার্থের ততটা গুরুত্ব নেই। ভারতে অপুষ্টিজনিত সমস্যা খুব বেশি এবং তা দূর করতে গেলে এই ব্যাপারে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

বহুকাল ধরে পতিত ও অনুর্বর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়ে আসছে, যেখানে জল ও মাটির পুষ্টিকারক উপাদান উভয়ই অত্যন্ত কম। ফলে, আমাদের তৈলবীজের প্রজাতিগুলির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি, কিন্তু তাদের ফলন খুবই কম। বর্তমানে এই অবস্থা দূর করার চেষ্টা চলেছে। দেখা হচ্ছে যাতে এমন প্রজাতি তৈরি করা যায় যারা উন্নত চাষ পদ্ধতিতে উচ্চফলন দানে সক্ষম।

চীনাবাদাম আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ শস্য। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য হল এক হেক্টর জমিতে চার মেট্রিক টন শুঁটি ফলিয়ে সেখান থেকে ১ মেট্রিক টন তেল পাওয়া। চীনাবাদাম এবং সরষে, রেপসীড, রেড়ি ও কুসুমের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন প্রজাতি আছে। পুষ্ট বীজ ও শুঁটির ব্যবহার, হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যায় সময়মতো চারা লাগানো, সংকটকালে অন্তত একবার সেচের ব্যবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সার প্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ ফলনের অন্তত ৮০ শতাংশ পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য শর্তগুলি হল সময়মতো আগাছা দমন, প্রয়োজন অনুসারে রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা ও ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে ক্ষতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলে বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য যে উপায়গুলি নেওয়া যেতে পারে তা হল অন্যান্য ফসলের সাথে শস্যচক্রে তৈলবীজ লাগানো, ভালো মাটি এবং যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, এমন এলাকায় লাগানো ও মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয় এমন এলাকায় ভালো ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এর ফলন উপযুক্ত মাত্রায় স্থির রাখা।

১৯.৫.৪ চিনি-শস্য

ভারতে বহুকাল থেকে উন্নত প্রজাতির আখের চাষ হয়ে আসছে। ভারতে উদ্ভূত আখের প্রজাতিগুলি ২৫টিরও বেশি দেশে চাষ হয়। এর মধ্যে এন সি ও ৩১০ প্রজাতিটি আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয়। আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের জন্য আমাদের দেশে আখের ফলন ও মেয়াদের হেরফের হয়। দিন প্রতি উৎপাদনশীলতা বেশি এমন জায়গায় আমাদের আখের চাষ বাড়াতে হবে। বসন্তকাল ও শরৎকালে লাগানো যায় এমন অনেক ভালো প্রজাতি এদেশে আছে। এদের সঠিক পরিকল্পনামাফিক লাগানো গেলে চিনিকলগুলি সারা বছরই চলতে পারে। লাভজনক বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়ের গ্যারান্টি পেলে এটা সম্ভব হতে পারে। আখের কল ও সমবায় সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে চাষিদের সাহায্য করতে পারে। তাদের উচিত চাষিদের কাছে সময়মতো সার ও রোগকীট দমনের জন্য ওষুধ পৌঁছে দেওয়া।

১৯৬০ সাল থেকে ভারতে সুগারবীট চাষ শুরু করা হয়েছে যা আর একটি চিনি-শস্য। যে সোডিয়াম সমৃদ্ধ জমিতে অন্য ফসল ভালো হয় না সেখানে এটি খুব ভালো ও লাভজনকভাবে চাষ হতে পারে। সুগারবীট অতিরিক্ত সোডিয়াম মাটি থেকে সরিয়ে দেয় ফলে মাটি উন্নত হয়। জনসংখ্যা বাড়লেও আমাদের দেশে মাথাপিছু শর্করার পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালে ৪.৭ কেজির তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ১০.৭ কেজি হয়েছে।

১৯.৫.৫ তন্তু-শস্য

তন্তু উৎপাদনকারী শস্যের মধ্যে তুলোর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতেই প্রথম সংকর জাতির তুলো তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের শুধু লম্বা আঁশই নয়, মাঝারি আঁশ ও ছোটো আঁশযুক্ত প্রজাতিরও বেশ কিছু প্রকারণ

চিত্র ১৯.৬ : সংকরজাতির তুলো এল-আর-এ ৫১৬৬

আছে যেগুলোর গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট চাহিদা আছে (চিত্র ১৯.৬)। আমাদের গবেষণালব্ধ সাফল্য সত্ত্বেও সুতির কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু ১৩.৮ মিটারের তুলনায় ১৮৮৪-৮৫ সালে কমে ১০.৬ মিটারে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন মাথাপিছু ১.২ মিটার থেকে বেড়ে ৩.৯ মিটারে দাঁড়িয়েও এই ঘাটতি পোষায়নি। এটা ভেবে খুবই খারাপ লাগে যে, একজন ভারতীয় বর্তমানে কয়েক দশক আগের একজন ভারতীয়ের চেয়ে কম কাপড় ব্যবহার করার জন্য পাচ্ছেন, যদিও পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক জমিতে তুলোর চাষ এবং কাপড়ের কলও এদেশেই সর্বাধিক। এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে তুলোকে অন্য ফসলের সাথে শস্যচক্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যথোপযুক্ত তদারকি ও রোগ-পোকার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে যেহেতু আমরা আর নতুন জমি চাষের আওতায় এনে এ ফসলের চাষ বাড়াতে পারব না।

বৃষ্টি বেশি হয় এমন এলাকায় পাট চাষ হয়। ১৯৮০-৮১ সালে ভারত থেকে ৩৯৯.১ কোটি টাকা মূল্যের ৫৫৮ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্যাকেজিংয়ে বিপুল পরিবর্তনের জন্য পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে ১৯৮৪-৮৫ সালে আমাদের রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে ১৬০ হাজার টনে। অবশ্য ভারতের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে। একারণে ধান, গম, আলু এবং মুগ ফসলচক্রের মধ্যে চাষ করা যেতে পারে কিছু এরকম পাটের প্রজাতি আমাদের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন।

১৯.৫.৬ আবাদি ফসল

আমাদের দেশের মধ্যে চা, কফি, কোকো, রাবার, নারকেল, সুপারি, কাজু, এলাচ, গোলমরিচ ও মশলাপাতির প্রচুর চাহিদা আছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বহুস্তর বিশিষ্ট শস্য উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যাতে আবাদ ও বাগিচায় ফাঁকা জায়গার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়। যেমন, নারকেল ও সুপারি গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে গোলমরিচ চাষ হয়ে থাকে। আবার সুপারি গাছের ফাঁকে ফাঁকে আনারস ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন শিম্ব-গোত্রীয় শস্য বা ঘাস লাগানো যেতে পারে। বহুস্তর বিশিষ্ট শস্যচাষে জমির উৎপাদনশীলতা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়।

চিত্র ১৯.৭ : বহু-স্তরীয় ফসল উৎপাদন। পিছনে লম্বা নারকেল গাছ, মাঝের সারিতে কোকো গাছ আর তৃতীয় স্তরে আনারস।

১৯.৫.৭ আলু ও অন্যান্য কন্দ

ভালো ফসল পেতে নীরোগ বীজকন্দের মাধ্যমে আলু চাষ করা দরকার। কিছুকাল আগেও নীরোগ বীজকন্দ একমাত্র পাহাড়ি অঞ্চলে তৈরি করা যেত। ওই সব অঞ্চলে জাব পোকার আক্রমণ হয় না ফলে ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে না। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বছরের কোন সময়ে কোন অঞ্চলে কোন রোগবাহী জাব পোকার আক্রমণ ঘটে না তা শনাক্ত করেছেন। উপযুক্ত প্রজাতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের সমস্ত আলু উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে জাব পোকার আক্রমণবিহীন সময়ে পুষ্ট এবং নীরোগ বীজকন্দ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। বহুকাল থেকে কাটা বীজকন্দের মাধ্যমে আলুচাষ হয়ে থাকে যেটা আলুচাষের মোট খরচের একটা মুখ্য অংশ। এখন আলু, টম্যাটো বা বেগুনের মতো বীজ থেকে চাষ করা যাচ্ছে। বীজের মাধ্যমে চাষ করলে এই শক্তিদায়ী ফসলটির চাষের খরচ যথেষ্ট কমে যাবে।

ক্যাসাভা (ট্যাপিয়োকা), মিষ্টি আলু, খামালু ও এই ধরনের কিছু প্রজাতির শস্য থেকে বেশিরভাগ গরিব মানুষ প্রাণধারণ করে। আমাদের উন্নয়নের অগ্রগতির সঙ্গে কিছু ভোক্তা তণ্ডুলজাতীয় শস্যে অভ্যস্ত হলেও কন্দজাতীয় শস্য থেকে খুব কম খরচে খাবারের চাহিদা মিটতে পারে এবং এগুলি যে সব জমি অন্য ফসলের পক্ষে অনুপযুক্ত সে সমস্ত জমিতে লাগানো যাবে বলে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে এগুলির গুরুত্ব থেকেই যাবে।

১৯.৫.৮ ফল ও শাকসবজি

বছরে আমাদের দেশে ২০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় ১৫০ লক্ষ টন ফল হয় এবং ১০ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে ১০ লক্ষ টন শাকসবজি পাওয়া যায়। প্রতিদিন আমরা মাথাপিছু মাত্র ৬০ গ্রাম ফল ও ৭৫ গ্রাম শাকসবজি খাই। অথচ সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের যথাক্রমে ৮৫ গ্রাম ফল ও ২০০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া উচিত।

যাই হোক, প্রথম দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা আনা। পরে উদ্যানবিদ্যায় গবেষণার কাজ বেড়ে যায়। ফলে, বিভিন্ন উন্নত ও উচ্চফলনশীল প্রজাতির ফল ও শাকসবজি আমরা গত দুই দশকে উৎপন্ন করেছি।

বর্তমানে দূরবর্তী জায়গায় পরিবহন, প্যাকেজিং, ফল, শাকসবজি, কম চর্বি ও বেশি মাত্রায় প্রোটিন সমৃদ্ধ ছত্রাক (মাসরুম) ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণ এবং পাত্রগতকরণ (ক্যানিং)-এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহার ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রযুক্তি সংস্থা সংগঠিত হয়েছে ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে, ক্রেতাদের কাছে এই খাদ্যবস্তুগুলি খুবই সহজে ও দ্রুত পৌঁছে যাবে।

ফল ও শাকসবজি বছরের বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে। তাই উৎপাদন বেশি হলে ফসলের দাম কমে যায়, অনেক সময় ফসল নষ্টও হয়ে যায়। বিভিন্ন সংরক্ষণ প্রণালীর মাধ্যমে চাষি যাতে লাভবান হয় এবং ক্রেতার প্রয়োজন যাতে মেটে তা দেখতে হবে।

১৯.৫.৯ আবাদিবন

জঙ্গল সাফাই করে জমিগুলি অন্য কাজে লাগানো অথবা গাছ কেটে কাঠকে নির্মাণের কাজে অথবা প্যাকিং বাক্স তৈরির মতো অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করার ফলে আমাদের বনাঞ্চল আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশে এখন মোট ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ২২ শতাংশে অরণ্য আছে, অথচ সুপারিশ অনুসারে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ এলাকা অরণ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। ঝোপ-জঙ্গল এবং জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন সব গাছের সংখ্যার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটছে। যদিও ভাবতে অবাক লাগে তবুও এমন একদিন আসতে পারে যখন লোকজন যথেষ্ট খাবারের সংস্থান করতে পারবে কিন্তু যথেষ্ট জ্বালানি কাঠের জোগান থাকবে না। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে জ্বালানি কাঠের মূল্য প্রায় ৬৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। ফলে, এই অবস্থায় দ্রুত বেড়ে ওঠা গাছসমূহের রোপণ এবং দুসারি গাছের মাঝে উপযুক্ত ফসলের চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব ধরনের গাছ সব ফসলের সঙ্গে পরস্পর সুসঙ্গত নাও হতে পারে। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ সংযোগের ক্ষেত্রেও একে অপরের সর্বোচ্চ ফলনের প্রতিকূল হতে পারে। তবে অরণ্যের ঘাটতি মেটাতে কিছুটা কম উৎপাদনশীলতা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় সুবাবুল গাছের মাঝে মাঝে রবি মরশুমে গম বা রেপসীড এবং খরিফ মরশুমে তিল বা বাজরা চাষ করা যেতে পারে। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় বনঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রথম দু-বছর খাদ্যশস্য এবং পরবর্তী সময়ে গোখাদ্য হিসাবে অগভীর মূল বিশিষ্ট জোয়ার ও বরবটি লাগালে ভালো হতে পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এলাকায় ইউক্যালিপ্টাসের সঙ্গে ভুট্টা এবং পশুখাদ্য হিসাবে বাবলা বা স্টাইলো চাষ করা যেতে পারে।

আমাদের ৬ কোটি হেক্টর জমিতে কোন না কোন কারণে চাষবাস হচ্ছে না। সেসব জায়গায় গাছ লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। গ্রামের পথের ধারের পতিত জমিতে বড়ো গাছ লাগনো যেতে পারে। সেসব গাছ থেকে জ্বালানি কাঠ মিলবে।

তাহলে এ পর্যন্ত আপনারা পড়লেন যে আমাদের শস্যের উন্নতির ফলে ভালো, সুস্থ ও উচ্চফলনশীল গাছের আবির্ভাব ঘটেছে। এখানে জেনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র উন্নত বীজ লাগালেই হবে না সেই সঙ্গে শস্য উৎপাদন পদ্ধতি, সার এবং রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের দরকার আছে। এখন আমরা এসবের মধ্যে কয়েকটি বিষয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব, তবে তার আগে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়া যাক।

অনুশীলনী ২

নীচের প্রদত্ত শব্দগুচ্ছ থেকে সঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১। আমাদের দেশের ————— এবং ————— বৈচিত্র্যের জন্যই এখানে এত প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

২। সারা পৃথিবীর পোলট্রির উৎস লাল বন মুরগির আদি বাসস্থান হল —————।

৩। ————— আমাদের প্রধান খরিফ শস্য ও ————— আমাদের প্রধান রবি মরশুমের শস্য।

৪। গাছের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় ইতিহাস জেনে এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে কৃষিবিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করছেন ————— অর্থাৎ যেসব গাছ আদর্শ কাঠামো এবং অন্যান্য জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় গুণাবলি সংবলিত।

৫। ডালশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ————— -এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল শস্যের তদারকি।

৬। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের দেশে তৈলবীজ চাষ হয়ে আসছে এমন সব জমিতে যেখানে ————— উৎপাদন এবং ————— -এর অভাব; এর জন্যই ————— ফলনযুক্ত শক্ত গাছ হয়েছে।

৭। ————— এমন এক গুরুত্বপূর্ণ শর্করা উৎপাদনকারী ফসল যা লাভজনকভাবে বেশি সোডিয়ামযুক্ত মাটিতে চাষ করা যেতে পারে।

৮। প্রথম সংকর জাতের তুলো উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ————— কৃষিবিদদের।

৯। সুনির্বাচিত আবাদি ফসলের মিশ্র চাষ লাভজনক হতে পারে ————— চাষের মাধ্যমে।

১০। আলু চাষের মোট খরচের একটা মোটা অংশ যায় সুস্থ ————— পাওয়ার জন্য।

১১। —————, —————, ————— ইত্যাদি হল কতকগুলো পদ্ধতি যা যেসব কৃষক বেশিমাত্রায় ফলের চাষ করে তাদের পক্ষে লাভজনক।

১২। —————, —————, ————— এবং ————— হল কতকগুলি জ্বালানি কাঠ সরবরাহকারী গাছ যা আমাদের দেশে ভালোভাবে চাষ করা যাবে।

(শুষ্ককরণ, সুবাবুল, বীজকন্দ, পাত্রে সংরক্ষণ, ভারতীয়, সুগারবিট, বহুস্তর, নিম, বনঝাউ, রস নিষ্কাশন, স্টাইলো, গম, ভারত, বীজের জাত, আদর্শ-প্রজাতি, মাটি, পুষ্টিকারক খাদ্য ইউক্যালিপ্‌টাস, জল সরবরাহ, ধান, জলবায়ু)।

১৯.৬ কৃষিপ্রযুক্তি

আপনারা আগেই জেনেছেন, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ শস্য ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত সার প্রয়োগ এবং রোগজীবাণু ও কীটপতঙ্গ থেকে শস্যরক্ষার ওপর নির্ভর করে। আসুন, এবার এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুটা জেনে নেওয়া যাক।

১৯.৬.১ শস্যচক্র

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত হওয়ায় একই জমিতে বছরে দুটি তার বেশি ফসল ফলানোই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর একমাত্র উপায়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন বাড়বে তেমনি আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনও মিটবে। বদলি শস্য চাষপদ্ধতিতে (relay cropping) পূর্ববর্তী শস্য কেটে ফেলার আগেই পরবর্তী শস্যের বীজ লাগানো হয়। কোন একটি শস্যের জন্য শেষবার যে সেচ দেওয়া হয় সেটি পরবর্তী শস্যের প্রাক্-রোপণ সেচ হিসাবে কাজ করে। এতে জলের সাশ্রয় হয়। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গমের সঙ্গে সুসঙ্গত

ছোলা ও সরষে সমান্তরাল সারিতে বোনা হয়। আবার জোয়ার, ভুট্টা, আখ বা তুলোর মধ্যবর্তী সারিতে মটর, মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও বরবটি লাগানো যেতে পারে। এরকম অন্তর্বর্তী শস্যচাষ পদ্ধতিতে ফলন বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ে।

১৯.৬.২ সার প্রয়োগ

গাছেদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক দ্রব্য হল নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ। এ ছাড়া, সঠিক বৃদ্ধির জন্য কম পরিমাণে দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, মলিবডেনাম ও কোবাল্ট দরকার হয়। এদের কোন একটির পরিমাণ কম হয়ে গেলে ফলন কমে যায়, এমনকি যখন অন্য সব পুষ্টিকারক দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে মেলে। তবে এসব পুষ্টিকারক দ্রব্যগুলির মধ্যে যে-কোনো একটির অতিমাত্রায় উপস্থিত উদ্ভিদের পক্ষে বিষাক্ত হতে পারে।

তণ্ডুলজাতীয় শস্যে ফসফরাস ও পটাশের তুলনায় বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন লাগে। আবার ডালশস্যের ক্ষেত্রে ফসফরাস বেশি দরকারি। এদের শেকড়ের গুটিতে ব্যাকটিরিয়া থাকে যারা সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন যোগ করে। এদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস দরকার হয়। শুধু শস্যের তারতম্যেই নয়, মাটির তফাত হলেও পুষ্টিকারক দ্রব্যের প্রয়োজনের রকমফের হয়। সুতরাং মাটি পরীক্ষা করে গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ খাবারের জোগান দিতে হবে। কিছু মিশ্রসার সাধারণভাবে বাজারে মেলে যার একটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের অনুপাত ১২০ : ৬০ : ৪০। প্রায়শই অপচয় হয় এমনকি ফলনও কমতে পারে। সার প্রয়োগের সময় ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের গভীরতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে চাষিরা জল পেলে প্রয়োজনাতিরিক্ত সেচ দিয়ে ফেলে। ফলে মূল্যবান সম্পদ জলের অপচয় ঘটে এবং ফলনও কমে যায়। তাই শস্যের প্রকারণ যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শস্যের ব্যবস্থাপনাও সঠিক ফলন পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান জরুরি।

১৯.৬.৩ শস্য রক্ষা

মাঠে ও গুদামে বিভিন্ন আগাছা, পোকা, রোগ, ইঁদুর ও পাখি শস্যের ক্ষতিসাধন করে। মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই এই সমস্ত আপদগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল। এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সরানো সম্ভবপর নয়, তা কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী প্রকারণ তৈরির মাধ্যমেই হোক বা উপযুক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করেই হোক, কারণ এরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে মানুষের নির্মূল করার প্রচেষ্টাকে দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করে। সুসংহত কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে শস্যের ক্ষতি সবচেয়ে কম রাখা যেতে পারে। যেখানে এসব আপদের প্রকোপ খুবই প্রকট সেখানে সহনশীল প্রকারণ ব্যবহার, একই রোগ-পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় এমন ধরনের শস্য পরপর না লাগানো, আপদ নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক ওষুধের পরিবর্তে জৈব ব্যবস্থা গ্রহণ, রোগ-পোকার পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছলে তবেই একমাত্র রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার ও এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সমগ্র গ্রাম বা ব্লকের সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রে গোষ্ঠীস্তরে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসব আপদের নিধন এতই দীর্ঘমেয়াদি ও কষ্টসাধ্য যে চাষিরা প্রায়শই খুব বেশি মাত্রায় এবং ঘনঘন রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। এটা খুবই বিপজ্জনক প্রবণতা। যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারের ফলে এগুলির

ক্ষতিকারক অবশেষ হয় ব্যবহার্য কৃষিজ দ্রব্যাদির মাধ্যমে অথবা এসব গাছপালা গোরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীদের খাওয়ানোর পর তাদের থেকে পাওয়া দুধের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করে (একক ১৬, ১৬.২ অংশ দ্রষ্টব্য)। এ কারণে রাসায়নিক ওষুধ নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত যা ক্ষতিকারক নয়।

অনুশীলনী ৩

দুই সারির বিষয়বস্তু মিলিয়ে দ্বিতীয় সারির সঠিক নম্বরটি প্রথম সারির বন্ধনীতে লিখুন।

সারি ১	সারি ২
(ক) বদলি শস্যচাষ প্রথা ( )	(১) ফসফরাস ও পটাসিয়ামের চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন দরকার।
(খ) শস্য সুরক্ষা ( )	(২) সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি শস্য একসাথে খেতে লাগানো হয়।
(গ) তণ্ডুলজাতীয় শস্য ( )	(৩) নির্দিষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়ামের সমন্বয় থাকে।
(ঘ) মিশ্র চাষ ( )	(৪) সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা দমন।
(ঙ) বাজারে প্রাপ্ত মিশ্র সার ( )	(৫) পূর্ববর্তী ফসল কাটার আগেই পরের ফসল লাগানো হয়।

১৯.৭ প্রাণীসম্পদ

গৃহপালিত প্রাণী থেকে আমরা দুধ, মাংস, ডিম, পশম, চামড়া ও অন্যান্য সামগ্রী পাই। এদের জাতীয় উৎপাদনে বাৎসরিক অবদান প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। বস্তুত গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিবার গৃহপালিত পশুপালনে জড়িত যার থেকে গ্রামের লোকজনদের জীবিকা ও কর্মসংস্থান হয়। গোরু, ষাঁড়, মোষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর বা হাঁস-মুরগির সংখ্যা আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা সূচিত করে।

কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশু আমাদের প্রধান অবলম্বন। গ্রামাঞ্চলে ছোটো ছোটো এবং বিক্ষিপ্ত জমি আবাদের জন্য যন্ত্রপাতি বিশেষ কাজে লাগে না। তবু শক্তির স্বল্পতা আমাদের কৃষিতে অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা, কেননা এজন্যই চাষের ক্রিয়াকলাপ সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

ভারতে বর্তমানে ১৮.৫ কোটি গবাদি পশু, ৬.১ কোটি মোষ, ৪.৫ কোটি ভেড়া, ৯.৭ কোটি ছাগল, ১০ কোটি ঘোড়া, ১০ কোটি উট, প্রায় ১০ লক্ষ অন্যান্য গৃহপালিত পশু ও ১৫.৬ কোটি হাঁস-মুরগি, তিতির-টার্কি, পাখি ইত্যাদি রয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে এরা ৪ কোটি মণ দুধ, ১.৩ কোটি ডিম, ৩.৯ কোটি কেজি পশম এবং ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন মাংস উৎপাদন করেছিল।

১৯.৭.১ গবাদি পশু

কুঁজবিশিষ্ট গবাদি পশুর উৎপত্তি হয়েছিল ভারতে। ব্রহম ষাঁড় কষ্টসহিষ্ণু, রোগ প্রতিরোধক প্রাণী এবং এদের ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে। পাশ্চাত্যদেশে প্রধানত মাংসের জন্য গো-প্রজননে এদের প্রচুর চাহিদা। কুঁজবিহীন টরাস প্রজাতির গোরুর উদ্ভব মনে হয় ইউরোপে। হরপ্পা সভ্যতার সময়েও ভারতে এই প্রজাতিটি গৃহপালিত হয়েছিল এমন প্রমাণ মেলে।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রজাতির বেশি দুগ্ধদায়ী, ভারবাহী, অথবা দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধক প্রজাতি পাওয়া যায়। দুগ্ধদায়ী প্রজাতিরা দুধ দেয়, ভারবাহী প্রজাতিরা ভারী কাজ করে এবং দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধক প্রজাতি দুধও দেয় আবার পরিশ্রমের কাজও করতে পারে। দুগ্ধদায়ী প্রজাতিগুলির মধ্যে আছে গীর, সাহিওয়াল, লাল সিন্ধি ও দেওনি; পরিশ্রম করতে সক্ষম প্রজাতিগুলির মধ্যে আছে নাগরী, কেনকাথা, মাল্ভি, হাল্লিকর্, অমৃতমহল, খিলাড়ী, কাঙ্গায়াম, পনওয়ার ও সিরি। দ্বৈত কাজের জন্য হরিয়ানা, দাঞ্জি, রেবতি, ওঙ্গোল, থারপারকার ও কাংক্রেজ প্রজাতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জল-মোষ পাওয়া যায়। তাই এখান থেকে বিভিন্ন দেশ মুরা, মেহসানা, জাফ্রাবাদী, সূরতি, নিলী-রবি আমদানি করে সে দেশের উপযোগী মোষের প্রজাতি তৈরি করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যে জলাজমির মোষ দেখা যায়, আমাদের দেশের উপকূলবর্তী ও জলাভূমি অঞ্চলে যেগুলি প্রায়ই দেখা যায়। এগুলি দুধ কম দেয় বলে জলাভূমি অঞ্চলে এদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয় যেখানে গবাদিপশু ভালো কাজ করতে পারে না।

দুগ্ধ উৎপাদন :

ভারতের অর্থনীতি গ্রামভিত্তিক। গ্রামাঞ্চলে দূর-পরিবহন এবং দুধ বিপণনের অসুবিধার দরুন যুগ যুগ ধরে এমন গবাদি পশু নির্বাচন করা হয়েছে, যারা শুধু পরিবারের দুধের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ফলে ইউরোপের তুলনায় এদেশে গোরুপিছু মাত্র $^{১}/_{৪}$ ভাগ দুধ পাওয়া যায়, যদিও ভারতের গাভিগুলি খুবই কষ্টসহিষ্ণু।

বর্তমানে এদেশে ৫ লাখের কিছু কম ভালো দুগ্ধপ্রদায়ী গোরু ও ২৫০ লাখ মোষ থেকে প্রতিটি বিয়ানে অর্থাৎ বাচ্চা দেওয়ার পরবর্তী সময়ে গড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু হলস্টীন-ফ্রিসিয়ন, ব্রাউন সুইস ও রেড্ ডেন-এর ক্ষেত্রে প্রতিবার ৫-৬ হাজার লিটার এবং জার্সি গোরুর ক্ষেত্রে প্রতিবার ৪ হাজার লিটার দুধ পাওয়া যায়। এগুলি আমদানি করে সংকরায়নের কাজে লাগানো হয়েছে এবং সংকর প্রজাতিগুলি গড়ে ৩ হাজার লিটার দুধ দেয়। কিন্তু কতকগুলি সংকর জাত গ্রামাঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় নয় কারণ গ্রামের লোকেরা এদের উপযুক্ত খাদ্যের সরবরাহ, পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নজর দিতে পারে না।

১৯.৭.২ ভেড়া ও ছাগল

যেখানে চাষবাস বিশেষ হয় না এমন জায়গায় বসবাসকারী প্রায় ১২০-১৫০ লাখ মানুষ ভারতে ভেড়া ও ছাগল পালন করেই জীবিকা নির্বাহ করে। ছোটো নাক ও মুখ এবং ওপরের ঠোঁট কাটা থাকায় ভেড়া খুব ছোটো ঘাসও একটু একটু করে খেয়ে ফেলতে পারে যেটা অন্যান্য বড়ো প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভেড়ার সংখ্যায় পৃথিবীতে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে যে ধরনের বড়ো বড়ো ভেড়ার পাল দেখতে পাওয়া যায়, অত বড়ো পাল এদেশে থাকে না যেহেতু এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৃণভূমি ও চারণক্ষেত্র মেলে না। যথেষ্ট পুষ্টিকর হওয়া সত্ত্বেও ভেড়ার মাংস আমাদের দেশে ততটা জনপ্রিয় নয়।

কাশ্মীর, গদ্দি, চোক্লা, ভাকরওয়াল, মগরা, কালী, মারওয়ারী, বেলারি, ডেকানী এবং নীলগিরি প্রজাতির ভেড়া আমাদের এখানে পাওয়া যায়। এরা গালিচা তৈরির উপযুক্ত খাটো ধরনের পশম উৎপাদন করে। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরির জন্য পশমের গুণগতমান বাড়াতে মেরিনো ও সাফোক প্রজাতির আমদানি করে আমাদের দেশের ভেড়ার প্রজাতিগুলিকে উন্নত করার দরকার হয়েছিল।

ছাগলকে গরিব মানুষের গাভি বলে। সব অবস্থার সঙ্গে ছাগল খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ইউরোপে ছাগলকে 'স্তন্যদায়িনী ধাত্রী' (wet nurse) বলা হয়, কেননা এদের থেকে সুলভে পুষ্টিকর দুধ মেলে। এই দুধে ৪.৫ শতাংশ

চর্বি আছে যা অতি ক্ষুদ্র ফোঁটায় সুন্দরভাবে মিশে থাকে এবং সহজে হজম হয়। টোগ্গেনবার্গ, সানান্, আলপোর এবং নুবিয়ান প্রজাতিগুলি আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গো মানানসই প্রজাতির প্রজননের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল। ছাগলের মাংস ও চামড়ার প্রচুর চাহিদা। আবার পেশমিনা ও চেগু প্রজাতির ছাগল থেকে শাল ও অন্যান্য পোশাক তৈরির নরম ও গরম তন্তু পাওয়া যায়। অ্যাঙ্গোরা প্রজাতি থেকে দামি বয়নযোগ্য লোম পাওয়া যায় যার নাম মোহেয়ার। অন্যান্য ভালো জাতগুলি হল যমুনাপরী, বিটাল, বারবারী, ব্ল্যাকবেঙ্গল, ডেক্যান ও মালাবারী। ছাগলের ব্যাপারে একটা বিষয় পরিষ্কার যে এরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে এবং যখন বাড়ির মধ্যে খাবার দেওয়া হয়, তখন ওরা পরিচ্ছন্ন ও টাটকা খাবার পরিষ্কার পাত্রে খেতে চায়। ভেড়া ও ছাগলের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন হওয়ার জন্য তারা একে অন্যের প্রতিযোগী নয়। মানুষের অবহেলার কারণে অনেক সময় মাটির ওপরে গাছপালা ও ঘাস খাওয়ার জন্য ছাগলের ওপর মৃত্তিকা নিরাবরণ করে পরিবেশ নষ্ট করার দোষ এসে পড়ে কিন্তু পরিশেব রক্ষা করার জন্য মানুষের উচিত এদের ন্যূনতম খাবার দেওয়া।

১৯.৭.৩ শূকর

শুয়োরকে প্রকৃতির প্রোটিন কারখানা বলা হয়। এর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—বেশিরভাগ খাদ্যকেই এরা উচ্চমানের প্রোটিনে রূপান্তরিত করতে পারে। এর পাকস্থলী গোরু, ভেড়া এবং ছাগলের তুলনায় আলাদা এবং একে প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। তাই শূকর খড় ও ভুসি খাবার খেয়েও হজম করতে পারে না। এরা সাধারণত শ্যাওলা সমেত সেলুলোজযুক্ত খাবার খেতে পারে। শরীরে খুব কম ঘর্মগ্রন্থি থাকার জন্য মোষের মতো এদেরও গ্রীষ্মকালে জল দরকার হয় শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য।

ভারতে যারা শূকর চাষ করে তারা এত গরিব শ্রেণির যে কদাচিৎ এই পশুর প্রতি নজর দিতে পারে। তাই এরা কাদায় গড়াগড়ি দেয়, সব রকমের বাজে জিনিস খায় ও বিভিন্ন পরজীবীর বাসা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য এদের নোংরা ও ঘৃণ্য প্রাণী বলে মনে করা হয়। অথচ এরা সুচারু, স্বাস্থ্যবান, উৎপাদনক্ষম এবং দ্রুত প্রজননক্ষম পশু হিসাবে পরিগণিত হতে পারত। আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রোটিনজনিত অপুষ্টি ক্রমবর্ধমান সেখানে শূকর পালন করা সমাজের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই উদ্দেশ্যে দেশি শূকরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিদেশ থেকে হোয়াইট ইয়র্কশায়ার, ল্যান্ডরেস্, ট্যামওয়ার্থ ও বার্কশায়ার প্রজাতিগুলি আমদানি করা হয়েছে।

প্রাণীস্বাস্থ্যে সতর্কতা

ভারতের ক্রান্তীয় ও ক্রান্তীয়-প্রায় আবহাওয়া বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বহু ধরনের রোগের পক্ষে সহায়ক হয় যেমন, গোরুর প্লেগ, এঁসো, জলাতঙ্ক ও যক্ষ্মা। পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন ও উপযুক্ত ওষুধপত্র, উভয়ই প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রাণীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতারও প্রয়োজন আছে। আমাদের গৃহপালিত পশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উচ্চ গুণমানের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও টিকাগুলি অধিকাংশই এখন আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে।

১৯.৮ হাঁস-মুরগি

গত কয়েক দশকে মুরগির ব্যবসা অদ্ভুত ধরনের বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যবসা থেকে বর্তমানে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রায় ১৩৫০ কোটি ডিম ও ৫ কোটি ব্রয়লার মুরগি উৎপাদিত হয়েছিল। এক দশকে

উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে ৪০০ শতাংশ যেটা কৃষিক্ষেত্রে বা কোন শিল্পে সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে ভালো ব্রয়লার প্রজাতিগুলি হল : বি-৭৭, জে বি এল-৮০, আই বি বি-৮৩, আই এল আই-৮০ ও ৮২। মুরগির পুষ্টির বিষয়ে নিরন্তর গবেষণার ফলস্বরূপ যেখানে আগে এক কেজি মাংস বা এক ডজন ডিম পেতে ৬ কেজি খাবার দরকার হত এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২.২ কেজিতে। প্রয়োজনীয় ওষুধও আজ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। এসব ওষুধের অধিকাংশই খুব উচ্চমানের।

এদেশের লাল বন মুরগি (চিত্র ১৯.৪) থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির মুরগির উৎপত্তি হয়েছে। আমাদের বিখ্যাত আসীল্ ছাড়াও কড়কনাথ, ছোটো পা-ওয়ালা নিকোবরী এবং অনেক শক্তপোক্ত জাত আছে যারা আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। ভবিষ্যতে মুরগির ব্যবসা বাড়াতে এর জাতের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

মুরগির তুলনায় হাঁসের জল বেশি লাগে। তবে আমাদের এ ভুল ধারণা যে সাঁতার কাটার জন্য হাঁসের জলের প্রয়োজন হয়। এরা নানারকম জলজ জীব খেয়ে থাকতে পারে যা মুরগি পারে না। যেজন্য জলা জায়গায় হাঁস পালন খুব প্রচলিত। হাঁস-মুরগির মোট সংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ হল হাঁস, তাই হাঁসের সংখ্যা বাড়াতে আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার।

১৯.৯ মৎস্য চাষ

সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলের মাছে প্রচুর প্রাণিজ প্রোটিন পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি বাড়ে প্ল্যাংকটন, আগাছা ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী খায় এবং উচ্চ জৈবমানসম্পন্ন খাদ্যে রূপান্তরিত করে।

১৯৮৪ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছিল এবং ভারত পৃথিবীতে এই ক্ষেত্রে অষ্টম স্থান আমাদের দখল করেছিল। আমাদের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১২০ লক্ষ টনে, কারণ দেশের সুদীর্ঘ উপকূলরেখার সন্নিহিত বিশাল জলাভূমি মাছ দরার কাজে লাগানো যেতে পারে। দেশের ভেতরে ১৬ লক্ষ হেক্টর মিষ্টি জলের জলাশয় আছে এবং নোনা জল ও খাঁড়ি অঞ্চল আছে ২০ লক্ষ হেক্টর জুড়ে।

১৯.৯.১ সামুদ্রিক মৎস্য চাষ

বর্তমানে আমরা সমুদ্র থেকে ১২ লক্ষ টন মাছ পেয়ে থাকি। কিন্তু ভারতের সমগ্র উপকূল বিশেষত উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে মাছধরা বাড়ানোর প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে মাছের ঝাঁক খুঁজতে

চিত্র ১৯.৮ : মৎস্য চাষে ব্যবহৃত আধুনিক জাহাজ এম. ভি. সরস্বতী

বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন দূর সংবেদন ও উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। মুক্তো, ঝিনুক, শামুক, চিংড়ি, সামুদ্রিক আগাছা ইত্যাদি চাষের জন্য উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে। তা ছাড়া মাছ ধরতে এখন যান্ত্রিক নৌকা (চিত্র ১৯.৮) ও জাহাজ মাছ সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা গুদামঘর ও পাত্রজাত করার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯.৯.২ অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ

অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ দু'ভাগে ভাগ করা হয় : যথা, "ধরা" এবং "চাষ"। "ধরা" বলতে বোঝায় নদী বা জলাধার থেকে মাছ ধরা এবং সংগ্রহ করা। অপরপক্ষে "মাছ চাষ" প্রথমে পুকুরে ও জলাশয়ে মাছ রেখে যখন সেগুলি প্রয়োজনীয় মাপের হয় তখন ধরা হয়।

পুকুরে মাছ চাষ আমাদের দেশে বহুদিনই প্রচলিত। এতে হেক্টর পিছু বাৎসরিক গড় উৎপাদন প্রায় ৬০০ কিগ্রা। পুকুরে যদি বিভিন্ন ধরনের মাছ রাখা হয় যারা পুকুরের তলদেশে, মধ্যভাগে এবং ওপরের তলের খাবার খেতে পারে, তাহলে মাছেরা পরস্পরের মধ্যে খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা করবে না এবং পুকুরের সমস্ত অংশ জুড়ে খাদ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে। এই ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় মিশ্র মৎস্য চাষ। মাছচাষিরা গড়ে প্রতি হেক্টরে ও প্রতি বছরে প্রায় ৫ টন মাছ এই ধরনের মিশ্র চাষ থেকে পেয়ে থাকেন, কিন্তু হেক্টর পিছু বাৎসরিক উৎপাদন ১১ টন পর্যন্ত হতে পারে। মাছ, চিংড়ি, ব্যাঙ, হাঁস এবং প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রজাতির নিবিড় চাষ খুবই লাভজনক, যেহেতু তারা সমস্ত পুকুরের পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে। যেসব মাছ বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় সেগুলির চাষ পরিত্যক্ত জলাভূমিতেও করা যায়। এগুলির বাৎসরিক উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৫ টন পাওয়া গিয়েছে। তাদের ব্যবহার আমাদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

অনুশীলনী ৪

নীচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১। আমাদের দেশের বেশিরভাগ চাষি তাদের বিভিন্ন কৃষিকাজের দরকারি শক্তির জন্যে —————— র ওপর নির্ভর করে।

২। আমাদের দেশে —————— এবং —————— -এর সুযোগ ভালো না থাকায় শুধু পারিবারিক দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য ইত্যাদি পশুর প্রজনন করা হয়েছে।

৩। যেসব এলাকায় কৃষিকাজ সীমিত সেখানে —————— এবং —————— লাভজনকভাবে পালন করা যেতে পারে।

৪। —————— -কে সাধারণভাবে প্রকৃতির প্রোটিনের কারখানা বলা হয়।

৫। বিগত কয়েক দশকে, —————— -র ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিস্ময়কর এবং কৃষি বা শিল্পের অন্যান্য শাখায় তার তুলনা মেলে না।

৬। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর মৎস্য উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে —————— এবং এখানে —————— এবং —————— উভয় ক্ষেত্রেই মৎস্য চাষ বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনা আছে।

(সামুদ্রিক, শূকর, পরিবহন, গৃহপালিত পশু, ছাগল, অন্তর্দেশীয় বিপণন, হাঁস-মুরগি, ভেড়া, অষ্টম)

১৯.১০ সারাংশ

এই এককে আপনারা শিখেছেন

- আমাদের দেশ হল কৃষিপ্রধান দেশ এবং আমাদের কৃষিজ পণ্য উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থনীতিতে সাহায্য করে।
- সূর্যালোক, মৃত্তিকা এবং জল আমাদের কৃষিকার্যের প্রধান সম্পদ, এ ছাড়া বহুবিধ শস্য, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং চাষিদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো হয়। আমাদের কৃষিজ উৎপাদন, ওপরের যে-কোনো একটি সীমিত অথবা বিঘ্নিত হলে বিপন্ন হবে।
- আমাদের প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় সেগুলির বেশিরভাগই আমাদের দেশেই উদ্ভূত হয়েছে। এবং অনেক উদ্ভিদ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে।
- আধুনিক কৃষি তার পুরাতন দিন থেকে অনেক পথ এগিয়ে এসেছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন, উচ্চফলনশীল এবং উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। কোন ফসলের অধিক ফলন শুধুমাত্র উন্নত, উচ্চফলনশীল বীজের ওপর নির্ভর করে না। পরন্তু শস্যচক্র, সারের মাধ্যমে পুষ্টিকারক দ্রব্যসমূহ সরবরাহ, সময়মাফিক সেচ এবং যথোপযুক্ত শস্য সংরক্ষণের পন্থার ওপরেও নির্ভর করে।
- গৃহপালিত পশুকে আমাদের বিকল্প খাদ্যসম্পদ হিসাবে ধরা যেতে পারে। এরা অন্যান্য উপযোগী জিনিস যেমন উল, চামড়া ইত্যাদির উৎস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আমাদের উন্নত প্রজাতির গৃহপালিত পশু আছে। কিছু প্রজাতি শুধু দুধ উৎপাদনের জন্য, কিছু শ্রমদানের জন্য এবং অন্যান্যগুলি উভয় উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ দুধ ও শ্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শূকর পালন ইত্যাদির জন্য আমাদের যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত।
- আমাদের দেশে হাঁস-মুরগির প্রতিপালন হল দ্রুত বিকাশশীল শিল্প। গত কয়েক দশকে এগুলির উৎপাদন কৃষি ও শিল্পের যে-কোনো শাখাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে গবেষণার ফলে আরও ভালো প্রজাতির ব্রয়লার মুরগি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা অল্প খাদ্য সরবরাহ করে অধিক ওজনের ব্রয়লার এবং ডিম উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি।
- সামুদ্রিক ও অন্তর্দেশীয় মৎস চাষের প্রসারেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে এখনও কাজে লাগানো যায়নি। আধুনিক প্রযুক্তি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চাষিদের ওয়াকিবহাল করলে শুধু যে তাদের ভালো আয় হবে তাই নয়, অধিক মাত্রায় খাদ্যের সংস্থান করাও সম্ভবপর হবে।

১৯.১১ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। কৃষির প্রাথমিক উৎসগুলির ওপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করুন।

২। নিম্নলিখিত বিভাগগুলির প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন যেগুলি আমাদের দেশে সাধারণভাবে চাষ করা হয়।

বিভাগ	**উদাহরণ**
(ক) তণ্ডুলজাতীয় দানাশস্য	
(খ) ডালশস্য	
(গ) তৈলবীজ	
(ঘ) শর্করাজাতীয় শস্য	
(ঙ) তন্তুজাতীয় শস্য	
(চ) কন্দজাতীয় শস্য	
(ছ) আবাদি (বাগিচা) ফসল	
(জ) ফল ও শাকসবজি	

ওপরে আপনি যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন, তাদের যে-কোনো দুটির উন্নয়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য নীচের তালিকায় লিখুন।

উদ্ভিদের নাম	**অনুন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য**	**উন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য**
(১)	(ক)	(ক)
	(খ)	(খ)
	(গ)	(গ)

উদ্ভিদের নাম	**অনুন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য**	**উন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য**
(২)	(ক)	(ক)
	(খ)	(খ)
	(গ)	(গ)

৩। নীচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(ক) মিশ্র এবং বদলিচাষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(খ) সার ব্যবহারের সময় কী কী বিষয়ের ওপর নজর রাখা উচিত?

(গ) রোগপোকা দমনের আদর্শ উপায় কী?

৪। (ক) প্রাণীজ খাদ্যের উৎসগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

(খ) নিম্নলিখিত প্রাণীজ খাদ্যসমূহের উৎপাদনের জন্য কী ধরনের উন্নতি করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(১) দুধ

(২) মাছ

(৩) ব্রয়লার মুরগি

(৪) ডিম

১৯.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) (১) ভারতের প্রায় ৬০.৫ শতাংশ মজদুর কোন না কোনভাবে কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল।

(২) আমাদের প্রায় ৫৩ শতাংশ জমি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৩) বিভিন্ন কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৩৪.৭ শতাংশ আসে।

(খ) (১) দক্ষিণ-পশ্চিম (২) অর্ধেক (৩) পুষ্টিকারক বস্তু (৪) পাললিক (৫) আঠাশ (২৮)

২। (১) মাটি, জলবায়ু (২) ভারতবর্ষ (৩) ধান-গম (৪) আদর্শ প্রজাতি (৫) বীজের জাত (৬) পুষ্টিকারক, জল সরবরাহ, নিম্ন (৭) সুগার বীট (৮) ভারতীয় (৯) বহুস্তর (১০) বীজকন্দ (১১) শুষ্ককরণ, পাত্রে সংরক্ষণ, রসনিষ্কাশন (১২) সুবাবুল, সাউ, স্টাইলো, ইউক্যালিপ্‌টাস।

৩। ক-(৫) খ-(৪) গ-(১) ঘ-(২) ঙ-(৩)।

৪। (১) গৃহপালিত পশু (২) যোগাযোগ, বিপণন (৩) ভেড়া, ছাগল (৪) শূকর (৫) হাঁস-মুরগি (৬) অষ্টম, সামুদ্রিক অন্তর্দেশীয়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। (ক) **সূর্যালোক :** এটি সারা বছর ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে সূর্যালোকের অনেকাংশ মেঘের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যতটা সম্ভব সূর্যালোক ব্যবহার করে নিতে পারে যদি অন্যান্য কারণগুলি যেমন জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পুষ্টির অপ্রতুলতা না ঘটে।

(খ) **মৃত্তিকা :** আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের মাটি পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক মাটি বিভিন্ন ধরনের ফসলের জন্য উপযুক্ত। এই ধরনের মাটির যে-কোনো একটিতে কোন ফসল লাগানোর আগে অবশ্যই মাটির পুষ্টিকারক দ্রব্যগুলি ও ভৌত বৈশিষ্ট্যাবলি দেখে নেওয়া উচিত।

(গ) **জল :** আমাদের কৃষিকার্য, মূলত উৎপাদনের জন্য, বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৃষ্টিপাত আমাদের দেশে সমানভাবে হয় না। বৃষ্টিপাত চলাকালীন জলের কিছুটা অংশ মাটির নীচে চুঁইয়ে চলে যায়, ওপরের স্তরের জলই উদ্ভিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ভূগর্ভস্থ জল ও তার গুণাগুণ যাচাই করবার পরে সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। (ক) ধান, বাজরা

(খ) অড়হর, ছোলা

(গ) চিনাবাদাম, সরষে

(ঘ) আখ, সুগারবীট

(ঙ) তুলা, পাট

(চ) আলু, ক্যাসাভা (সাবুদানা)

(ছ) চা, সুপারি

(জ) আম, বেগুন

উদ্ভিদের নাম	অনুন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য	উন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য
(১) ধান	(ক) লম্বা, দুর্বল কাণ্ড	(ক) খাটো, শক্ত কাণ্ড
	(খ) সূর্যালোকের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় না যেহেতু ধ্বজপত্র তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।	(খ) সূর্যালোকের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় যেহেতু ধ্বজপত্র সবুজ এবং অনেক দিন ধরে সোজা থাকে।
	(গ) আলগা শিষে অল্প দানা থাকে।	(গ) অনেক শিষে প্রচুর দানা থাকে।
(২) অড়হর	(ক) উদ্ভিদের অনেক পাতা এবং শাখাপ্রশাখা থাকায় নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত।	(ক) উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং আঁটসাট।
	(খ) ৩০০ দিনে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়।	(খ) ১৫০ দিনের মধ্যে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়।
	(গ) স্বল্প ফলন।	(গ) উচ্চ ফলন।

৩। (ক) মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে অনেকগুলি সুসঙ্গত ফসল একসঙ্গে চাষ করা হয়। বদলি চাষের ক্ষেত্রে আগের ফসল কাটার আগেই অন্য ফসল মাঠে বোনা হয়।

(খ) (i) ফসলের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট প্রকারের সার প্রয়োগ করা উচিত, যেমন ধান জাতীয় উদ্ভিদের জন্য অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন দরকার হয়।

(ii) মাটি পরীক্ষা করবার পরই সার প্রয়োগ করা উচিৎ, যার সাহায্যে কোন পুষ্টিকারক দ্রব্য কম আছে তা বোঝা যায়।

(iii) শস্যের নির্দিষ্ট বৃদ্ধিকালে সার প্রয়োগ করা দরকার, নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং সঠিক স্থানে।

(গ) সুসংহত উপায়ে রোগপোকা দমন হল সব থেকে আদর্শ পন্থা যেহেতু এর সুদূরপ্রসারী ফল পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। স্বল্পতম পরিমাণ রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারে এই ধরনের ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ জমে যায় না এবং খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

৪। (ক) গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগি, মাছ।

(খ) (i) বর্তমানে আমাদের পাঁচ লাখ ভালো গোরু এবং ২৫০ লাখ মোষ আছে যেগুলি ১০০০-১৫০০ লিটার দুধ প্রতি বিয়ানে দেয়। প্রতি বিয়ানে ৩০০০ লিটার দুধ উৎপাদনে সক্ষম এমন সংকর প্রজাতির গাই আমাদের দেশে প্রজনন করা হয়েছে।

(ii) মাছ উৎপাদনে ভারত বিশ্বের বাজারে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে এবং এর উৎপাদন আরও বাড়ার সুযোগ রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিক নৌকা ইত্যাদির ব্যবহারে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অন্তর্দেশীয় মাছ চাষে মিশ্র মৎসচাষের মাধ্যমে উচ্চফলন এবং সম্পদের ব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল।

(iii) নিবিড় গবেষণার ফলে প্রচুর ভালো এবং অধিক উৎপাদনক্ষম ব্রয়লার প্রজাতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এখন খাদ্যের সুদক্ষ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি বেরিয়েছে, অল্প খাদ্য ব্যবহার করে অনেক বেশি ওজনের ব্রয়লার পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

(iv) সাম্প্রতিককালে ডিম উৎপাদনও বেড়ে গেছে। হাঁস-মুরগিকে অল্পমাত্রায় খাদ্য সরবরাহ করে অনেক বেশি ডিম পাওয়া যাচ্ছে।

একক ২০ □ বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং সামাজিক বাস্তবতা

গঠন

২০.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২০.২ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য
২০.২.১ শুষ্ক অঞ্চল
২০.২.২ নীরস অঞ্চল
২০.২.৩ পাহাড়ি অঞ্চল
২০.৩ লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটির পুনরুদ্ধার
২০.৪ আধুনিক কৃষিকার্যে সমস্যা
২০.৫ উৎপাদনে মানুষের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য এবং ব্যবহারে সামাজিক অসামর্থ্য দুই-এর মধ্যে বৈষম্য
২০.৬ কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তি
২০.৭ সারাংশ
২০.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২০.৯ উত্তরমালা

২০.১ প্রস্তাবনা

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে খাদ্য এবং কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেটা পড়ার পরে এটা সহজেই বোধগম্য হয়েছে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির নিয়ত সংযোজন কৃষি উৎপাদনে পূর্বের অনেক বাধা দূর করে উন্নতি সম্ভব করেছে। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যায় যে, এই বিষয়ে আপনাদের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়েছে। এই ভাগে আমরা আপনাদের সঙ্গে কৃষির সঙ্গে জড়িত কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করব। এও আপনাদের জানাতে চাই যে যদিও এই ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সম্ভব হয়েছে তা সত্ত্বেও এর ফল অনেক মানুষের কাছে এখনও পৌঁছাতে পারেনি। এমনকি আজকের দিনেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত থাকতে হয়। এই সমস্যাটা আমাদের কাছে সত্যিই খুব বড়। সে কারণে এটা আমাদের জানা দরকার যে, কী কারণে আমাদের উন্নয়নের সুফল সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি এবং পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হয়েছে তা প্রচলিত অবস্থার কতটা উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি জানার পরে আপনারা সমর্থ হবেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করতে—

- প্রতিকূল পরিবেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কৃষিক্ষেত্রে কতটা উন্নতি এনেছে;
- আধুনিক কৃষিকার্যের সমস্যাবলি;

- উৎপাদনে মানুষের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য এবং ব্যবহারে সামাজিক অসামর্থ্য—এই দুইয়ের মধ্যে বৈষম্যের কারণ;
- জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব।

২০.২ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য

আমাদের দেশে বিচিত্র জলবায়ু এবং বিভিন্ন ধরনের মাটি কৃষিতে অসাদৃশ্য আনায় সাহায্য করছে। সারা বছর ধরে দেশের কোন না কোন প্রান্তে কৃষিকাজে চলতে থাকে। ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদার জন্যই, যেসব অঞ্চলে কৃষিকাজ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য ছিল সেই সব অঞ্চলকে এখন চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এইসব অঞ্চলে আর্দ্রতা, সঠিক তাপমাত্রা ইত্যাদি যে বিষয়গুলি ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলি পাওয়া যায় না। সেই কারণে যে সমস্ত উদ্ভিদ এই ধরনের প্রতিকূলতা সহ্য করতে পেরেছে সেগুলি চাষ করা হয় এবং অনুরূপভাবে এইসব অঞ্চলে কষ্টসহিষ্ণু পশুও পালন করা হয়। এই এককে আমরা এই রকম তিনটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।

২০.২.১ শুষ্ক অঞ্চল

আমাদের দেশে মুখ্য শুষ্ক অঞ্চলগুলি হল—রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক এবং লাদাখ। এটি প্রায় চার লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে। এর মধ্যে লাদাখ শীতল মরুভূমি প্রায় সত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে।

এখানে শুষ্কতা এবং নিম্ন উষ্ণতার দরুন কৃষিকাজ বছরে মাত্র পাঁচ মাসে সীমিত থাকে। সে কারণে যে সব ফসল স্বল্পমেয়াদি এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে—একমাত্র সেগুলিই জন্মায়। এগুলি হল কিছু দানাশস্য, তৈলবীজ এবং পশুখাদ্যের উদ্ভিদ, প্রাণীদের মধ্যে পাশমিনা ছাগল। এদের গাত্রের লোম থেকে তৈরি শাল ও অন্যান্য পোশাকের চাহিদা আছে। এই প্রজাতির ছাগলকে লাদাখে লাভজনকভাবে প্রতিপালন করা যেতে পারে। এটিই আমাদের দেশের একমাত্র জাগয়া যেখানে দুই কুঁজধারী ব্যাকট্রিয়ান উট পাওয়া যায়। স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতের ক্ষেত্র ছাড়াও দুধ, মাংস ও পশমের জন্য এই প্রাণীটি শীতল মরুভূমিতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এদের আশু সুরক্ষা ও নির্দিষ্ট প্রজনন পন্থার প্রয়োজন, কারণ আর মাত্র ৫৬টি নমুনার অস্তিত্ব বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানার তপ্ত মরু অঞ্চলে যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের জন্যে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় যেসব জায়গার অনেক এলাকায় আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চিত আছে। এই জলকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজে লাগানো দরকার। এই সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং তা বছরে ১০০ থেকে ৪৫০ মিলিমিটারের মধ্যে ওঠানামা করে। এতৎসত্ত্বেও অনেক উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় গবাদি পশুর সংখ্যা মানুষের সংখ্যার তুলনায় বেশি। এই অঞ্চল ঘাস ও গাছে সমৃদ্ধ। পাশাপশি, জমিগুলিও সুসংহত ব্যবস্থাপনায় আনা সম্ভব। প্রতি বছর মাঠে চরানো পশুর সংখ্যা বাড়লেও গোচারণ ভূমির এলাকা কমে যাচ্ছে। কারণ ফসল উৎপাদনের জন্যই আরও বেশি জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরনের প্রবণতা অবশ্যই কমাতে হবে, নইলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হবে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে এইসব অঞ্চলকে কীভাবে এমন উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য ব্যবহার করা যায় যেগুলি আমাদের উপকারে লাগবে এবং কোন ধরনের উদ্ভিদ এই অঞ্চলের

জন্য উপযুক্ত। এই সমস্ত শুষ্ক অঞ্চলে কুল, ডালিম প্রভৃতি ফলের গাছ এবং জ্বালানি কাঠ সরবরাহকারী গাছ যেমন একাশিয়া (বাবলা), প্রসোপিস এবং ইউক্যালিপ্‌টাস (সফেদা) প্রভৃতি লাগানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রক্ষাবলয় হিসাবে গাছ লাগালে বায়ুজনিত কারণে ভূমিক্ষয়ও রোধ হয়। এটি ঘাস এবং গোচারণ ভূমি তৈরিতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চলে বাজরা এবং মুগ চাষ করা যেতে পারে।

এখন আমরা এ অঞ্চলের অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব। মরু অঞ্চলে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়, যা কিনা তাপ উৎপাদনে, রান্নার কাজে এবং আলো জ্বালানোর কাজে লাগাতে পারা যাবে। সেটা সম্ভব হলে জ্বালানি উৎপাদনকারী গাছের সংখ্যা কমানো যেতে পারে। যেহেতু আগেই বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু পাওয়া যায়, তাই গোবর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ব্যবহার হল মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়া যাতে মাটি উর্বর হয়। সেই কারণে এই ধরনের সম্পদের প্রথাগত ব্যবহার থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। এতে আমাদের শুষ্ক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের এবং ভবিষ্যতে সমগ্র দেশের উপকার হবে। মরু অঞ্চলে সৌরশক্তিকে আর এক উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। এখানে সাধারণত জল লবণাক্ত। সৌরশক্তির সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা যেতে পারে, যা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবে।

যে সমস্ত বছরে ওই অঞ্চলে ভালো বৃষ্টিপাত হয়, যেমন আমরা ১৯৮৮ সালে দেখেছিলাম, তখন ঘাস, ঝোপ এবং অন্যান্য গাছ যেগুলি ভিজে মাটিতে তাড়াতাড়ি বাড়ে, সেগুলির বীজ মাটিতে ছড়ানোর প্রচেষ্টা করা উচিত। দুর্ভিক্ষের "কোড" থেকে আমরা আমরা জানতে পারি কি করে মানুষ এবং গৃহপালিত পশুদের কষ্ট কমাতে হয়। বর্তমানে আমাদের একটা ভালো আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি বানানো উচিত যাতে লোকজন জানতে পারে বৃষ্টিপাত ভালো হয়ে তাদের কী করতে হবে।

২০.২.২ নীরস অঞ্চল

নীরস অঞ্চল আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের খাদ্যের ৪২ শতাংশ এই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়। এখান থেকে আমাদের বাজরা শস্য ও ডালশস্য এবং তুলা ও চিনাবাদাম আসে, যার অনেকাংশের ওপর আমাদের শিল্প নির্ভরশীল।

সমগ্র কৃষিজমির ৭৪ শতাংশ নীরস অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এসব জায়গা বৃষ্টিপাতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই সমস্ত এলাকায় ফসলের ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে মৌসুমি বায়ুর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বর্ষা কখনও খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে আসতে পারে অথবা ঠিক সময়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে। কখনও দু'পশলা বৃষ্টির মাঝখানে অনেকটা বিরতি হতে পারে। যখন বাষ্পায়ন ও মাটিতে জল চুঁইয়ে নষ্ট হওয়ার পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হয়, তখন এই সমস্ত অঞ্চলে খরা, পানীয় জলের অভাব হয়, ফসল নষ্ট হয়। এর ফলে বেকারত্ব ও মানুষের অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট বাড়ে।

জল সংরক্ষণের ভালো পন্থা এবং অল্প জলে তাড়াতাড়ি জন্মাতে পারে এমন ফসল উদ্ভাবিত হওয়ায় নীরস অঞ্চলে ফসল উৎপাদন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যেহেতু নীরস অঞ্চলে জলাভাবই হল প্রধান অন্তরায় সেখানে সর্বসাধারণের জন্যে নির্মিত পুকুরে গড়িয়ে যাওয়া জল ধরে রাখা উচিত যাতে গাছে জীবন রক্ষাকারী জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। শুকনো লাল মাটি অঞ্চলে গভীরভাবে লাঙলচাষ জল ধরে রাখতে সাহায্য করে। কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে

একই সঙ্গে দুটি ফসল লাগানো যায় মাটির জল নিষ্কাশন এবং সুসংহত জলবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। পাতা এবং ফসলের অবশেষ যখন মাটির সঙ্গে মিশে যায় তখন মাটির গঠন এবং জলধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অড়হর কিংবা রেড়ি জাতীয় ফসল যাদের গভীর মূল আছে, যেগুলি এই অঞ্চলে চাষ করা এই ধরনের ফসলের মূল মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়িয়ে দিয়ে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি করে।

এখন এমন জোয়ার, বাজরা, সূর্যমুখী, কুসুম, সরিষা, চিনাবাদাম, বিভিন্ন প্রকার ডালশস্য এবং তুলার প্রকরণ আমাদের লভ্য হয়েছে যেগুলি খুব অল্প সময়ে এবং জলের অভাব দেখা দিলেও বেঁচে থাকতে পারে। সেগুলি চাষ করে নীরস অঞ্চলে প্রচলিত উদ্ভিদের বদলে বিচিত্রকরণ সম্ভবপর হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফসল এবং চাষের পদ্ধতি কৃষকদের বিভিন্ন জলবায়ু এবং মৃত্তিকায় সঠিক ধরনের শস্য নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

২০.২.৩ পাহাড়ি অঞ্চল

পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের চিরাচরিত প্রথায় ঝুম অর্থাৎ কাটা এবং পোড়ানো অথবা পদু চাষের পদ্ধতি চালু রেখেছে। এই পন্থায় পাহাড়ের কিছু অংশের জমিতে গাছপালা নির্মূল করে দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই ছাই মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং তা বাজরা শস্যের পক্ষে সহায়ক হয়। এতে যা উৎপন্ন হয় তা ওই অঞ্চলের উপজাতি মানুষজনদের সাময়িক প্রয়োজন মেটায়। যখন ফসল কেটে নেওয়া হয়, চাষের জমি খালি পড়ে থাকে এবং উপজাতি সম্প্রদায় পাশাপাশি এলাকায় গিয়ে একই পন্থার পুনরাবৃত্তি ঘটনায়। পাঁচ বছর আগে যে জমিতে কাটা এবং পোড়ানো পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছিল সে জমি স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরে পায় এবং সেসব জমি ঝোপ জাতীয় গাছর জন্য উপযোগী হয়। উপজাতি সম্প্রদায় আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে এবং আগের পন্থাই অনুসরণ করে। যদিও এগুলি শোনায় ভালো আসলে কিন্তু তা নয়। এই পদ্ধতি ভালো মতোনই কাজ করত যখন জনসংখ্যা ছিল অল্প এবং ঝোপ-জঙ্গাল ছিল বেশি। কিন্তু আজকের দিনে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের স্থান পরিবর্তন করার মতো বেশি জমি নেই। ফলে, একই জমিতে বারে বারে তাদের চাষ করতে হচ্ছে। যেহেতু সাধারণভাবে কোন সার প্রয়োগ করা হচ্ছে না এবং স্বাভাবিকভাবে মাটি তার পুষ্টিকারক দ্রব্যের ক্ষয়পূরণ করতে পারছে না, ফলে বছরের পর বছর জমিতে উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। মাটির ক্ষয় এই সমস্যাকে আরও ত্বরান্বিত করে।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, পাহাড়ি অঞ্চলে এই সমস্যার কোন সমাধান আছে কিনা। হ্যাঁ, আছে। জমির ঢাল এবং মাটির গভীরতা অনুযায়ী এবং জলের বন্দোবস্ত অনুযায়ী, বিজ্ঞানীরা এক মজাদার পদ্ধতি নকশা করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে খুবই কম খরচে এবং বাস্তুতন্ত্রকে পরিবর্তন না করে জমিকে উর্বরা করা যায়।

এই ধরনের ব্যবস্থায় উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলগুলিকে বনাঞ্চলের জন্য ধরা হয়েছে। পরবর্তী অঞ্চল ফলের চাষ এবং বহুবর্ষজীবী গোখাদ্য—ঘাস এবং সিম জাতীয় ফসল চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। সিম জাতীয় উদ্ভিদের মূল নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করে মাটির উন্নয়নে সাহায্য করে। তৃতীয় অঞ্চলে কম দামের যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্মিত চত্বরে মিশ্রচাষ করা হয়। স্থানীয় জিনিসপত্র দিয়ে মাটির বাঁধ তৈরি করা হয়। এতে সেচের কাজে এবং মাছ চাষে ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট জল ধরে রাখা যায়। হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, শূকর খামার, মৌমাছি পালন, ভোজ্য ছত্রাকের চাষ ইত্যাদি কাজকর্মের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য, রেখে এক স্ব-নির্ভরশীল পরিপূর্ণ কৃষিখামার তৈরি করা যায়।

এ পর্যন্ত আপনারা যা শিখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশে কৃষিতে সাহায্য করেছে। এখন আমরা আর একটি নির্দিষ্ট সমস্যার দিকে যাব, যা হল অপ্রকৃষ্ট মাটি। লবণাক্ত এবং

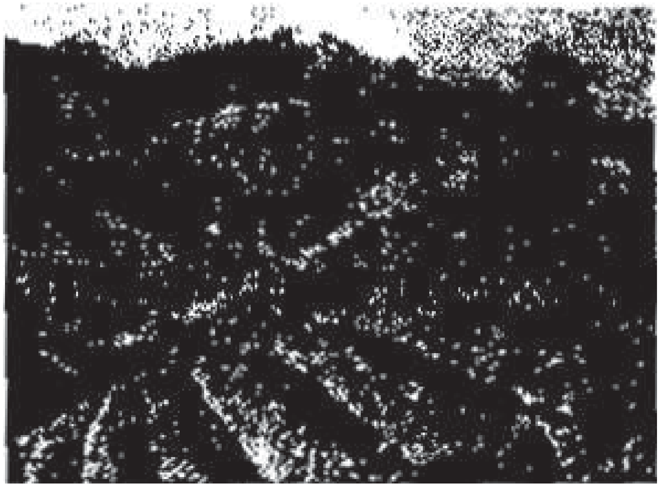

চিত্র ২০.১ : মেঘালয়ে ঝুম চাষের পরিবর্তে জমির আদর্শ ব্যবহার।

ক্ষারীয় মাটি আমাদের চাষিদের নানা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। এখন আমরা দেখব কীভাবে এদের সঙ্গে আচরণ করা যায়।

২০.৩ লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মৃত্তিকার পুনরুদ্ধার

শত শত বৎসরের অবহেলা ও অপব্যবস্থাপনার জন্য লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৭০ লক্ষ হেক্টর জমি এইভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এই বন্ধ্যা মৃত্তিকার মধ্যে রাজস্থান ও গুজরাটে ২৫ লক্ষ হেক্টর, কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ১৪ লক্ষ হেক্টর ও সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে ২১ লক্ষ হেক্টর জমি আছে। ক্ষারীয় মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট থাকে। লবণাক্ত মৃত্তিকায় ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট থাকে। ওপরোক্ত দু'ধরনের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকায় গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

১৯৬৮ সাল থেকে পরিচালিত গবেষণার দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন রকম ঘাস যেমন প্যারা ঘাস (Brachiaria mutica), নীলন ঘাস (Panicum antidotable), দূর্বাঘাস (Cynodon dactylon) এবং নানা জাতের বৃক্ষ যেমন বিলাতি খেজরি (Prosopis chilensis), বাবলা (Acacia nilotica) ও সংকর জাতের ইউক্যালিপ্টাস চাষ করে ক্ষারীয় মৃত্তিকা সংশোধন করা সম্ভব। ছোটো ছোটো গর্তের মধ্যে জৈব সার ও সামান্য পরিমাণে জিপসাম মিশিয়ে বৃক্ষ রোপণ করলে গাছ তাড়াতাড়ি লাগে ও বড় হয়। প্রথম বছর ঘাস লাগিয়ে মাটি সংশোধন করার পর সে জায়গায় অন্য ফসল লাগানো যেতে পারে। এখানে খরিফ মরশুমে বিশেষ জাতের ধান ও রবি মরশুমে গম লাগানো যেতে পারে। দেখা গেছে, এই ফসলগুলি খুব ভালো ফলন দেয়।

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা লবণাক্ত মৃত্তিকার সংশোধনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লবণাক্ত মৃত্তিকায় মাটি অল্প গভীরতায় জল থাকে। ত্রিশ মিটার অন্তর এক মিটার গভীর জল নিষ্কাশনী নালা জলের তল নীচে নামিয়ে দেয় এবং মাটির লবণাক্ত ভাব কমাতে সাহায্য করে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা আমাদের ভুললে চলবে না। মাটির লবণাক্ত ভাব অপর্যাপ্ত জলনিকাশি ব্যবস্থার ফলে বেড়ে যাওয়ায় মেসোপটেমিয়ায় গম চাষ বন্ধ করতে হয়েছিল এবং লবণাক্ত মাটি সুমেরীয় সভ্যতা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে একটি মূল ভূমিকা নিয়েছিল।

উপরিউক্তভাবে লবণাক্ত মাটি সংশোধন করে জোয়ার, ভুট্টা ও গম প্রভৃতি কিছুটা লবণাক্ত অবস্থায় জন্মাতে পারে, সেগুলি লাভজনকভাবে লাগানো যেতে পারে, যদিও মাটি সংশোধনের আগে এসব জমিতে কোন গাছ রোপণ করা হত না।

অনুশীলনী ১

নীচের প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে প্রকৃত শব্দ/শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কোন কোন জায়গায় কৃষিকাজের অনুপযুক্ত তা মূলত সঠিক মনে করা হত ————— এবং ————— না থাকার জন।

(খ) শীতল মরুভূমির জন্য ————— এবং ————— প্রকারণগুলি লাগানোর পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

(গ) জ্বালানি কাঠ উৎপাদনকারী গাছ যেমন —————, ————— এবং ————— নীরস এলাকায় লাভজনকভাবে চাষ করা সম্ভব হতে পারে।

(ঘ) ————— শুষ্কাঞ্চলে প্রধান অন্তরায় এবং এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে উপযুক্ত ————— কৌশলের সহায়তায়।

(ঙ) কিছু শস্য যেমন ———— ও ———— যখন শুষ্ক এলাকায় চাষ করা হয় তখন মাটির প্রভূত উন্নতি ঘটায়।

(চ) ————— পদ্ধতিতে চাষ পার্বত্য এলাকাতে ————— -র গুণগত মান কমার অন্যতম কারণ।

(ছ) অধিক পরিমাণে সোডিয়ামের ————— ও ————— থাকাই মাটির ক্ষারত্বের কারণ।

(জ) লবণাক্ত মাটিতে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর ————— এবং ————— প্রচুর পরিমাণে থাকে।

(ঝ) লবণাক্ত মাটি ঠিক করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল —————।

(ঞ) বর্তমানে ————— এবং ————— প্রজাতিসমূহ চাষ করে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা সম্ভব। শেষোক্ত প্রজাতিগুলি মাটিতে ছোটো ছোটো গর্ত খনন করে সেগুলি সার এবং ————— পূর্ণ করে লাগানো।

(রেড়ি, শীতসহ. বাই-কার্বনেট, গোখাদ্য ঘাস, উগ্নতা, সফেদা, অড়হর, বৃক্ষ, ক্লোরাইড, জল নিষ্কাশন, স্বল্পমেয়াদি, জিপসাম, সালফেট, কার্বনেট, জল ব্যবস্থাপনার, বাবলা, কাটা এবং পোড়ানো, প্রসোপিস, মাটি, জলাভাব)

২০.৪ আধুনিক কৃষিকার্যে সমস্যা

আধুনিক কৃষিকার্যের লক্ষ্য হল অল্প সময়ের মধ্যে কম জায়গায় এবং অল্প শক্তি ব্যয় করে বেশি পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যাতে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য পেতে পারে।

১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময়ে এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, এক কুইন্টাল অর্থাৎ ১০০ কেজি শস্য-দানা উৎপন্ন করতে এশিয়ার ও আফ্রিকার কৃষকদের ২.৫ থেকে ১০টি কাজের দিন দরকার। সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করতে ফ্রান্সের কিছু অংশে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা এবং আমেরিকায় মাত্র ৬-১২ মিনিট। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আয়ের, ক্রয়ক্ষমতার ও জীবনধারণের মানের পার্থক্যের এটাই কারণ।

অন্যদিকে, একজন আমেরিকার কৃষক ১ কেজি গোমাংস-জাত প্রোটিন উৎপন্ন করতে ৬৫,০০০ কিলো ক্যালোরি এবং এক কেজি গমজাত প্রোটিন উৎপন্ন করতে ২,৮৬০ কিলো ক্যালোরি শক্তি ব্যয় করে। এই শক্তির জন্য কৃষক যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে তার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক তৈলসম্পদ থেকে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির

ব্যবহারও শক্তি যোগায়। যন্ত্রগুলি চালাতে আবার পেট্রোল, কেরোসিন অথবা ডিজেল লাগে। এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ নবীকরণযোগ্য নয়। অপরদিকে এশিয়ার কৃষকরা এক কেজি ধান্যজাত প্রোটিন তৈরি করতে ২৮৬ কিলো ক্যালোরি শক্তি ব্যয় করে। দৈহিক ও পশুশক্তি ছাড়া এরা মূলত নবীকরণযোগ্য কৃষিভিত্তিক ও জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে। তাদের প্রযুক্তিতে কম শক্তি ব্যয় হয় কিন্তু এটি শ্রম এবং সময়সাপেক্ষ।

অনেকে মনে করেন যে, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কৃষি উৎপাদন অ-নবীকরণযোগ্য সম্পদের ওপর এত বেশি নির্ভর করে যে মাটির নীচের খনিজ তৈল এবং কয়লা একসময় শেষ হয়ে যেতে পারে এবং মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যদি আমরা পশ্চিমি দেশের মতো কৃষির আধুনিকীকরণ করি তাহলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু বর্তমানে ব্যবহৃত মানবশক্তির কেবলমাত্র এক-দশমাংশ নিয়োগ করেই উৎপন্ন করতে পারি। এখন প্রশ্নটা হল, বাকী মানুষজনেরা কী করবে? তারা কি বেকার হয়ে পড়বে? যদি তাই হয় তাহলে তারা কীভাবে কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী কিনবে? এটা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিকার্যে কম শক্তি ব্যয় করার ফলে দেশবাসী কোনরকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের উন্নতি ব্যাহত হয় এবং তারা অপুষ্টিতে ভোগে; কিন্তু যদি উন্নত দেশের অনুকরণ করা হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। তাই মধ্যপন্থাই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পথ। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে নবীকরণ হয় না এমন বস্তু ও শক্তির ব্যবহার কমানো দরকার। তা ছাড়া প্রয়োজনে উৎকৃষ্টতর বীজ ও উন্নত মানের কৃষিপদ্ধতির প্রয়োগ, সবরকম অপচয় রোধ তা জমি, জল অথবা এমনকি গাছের পাতা ও কাণ্ড, যাই হোক না কেন।

কিছু উৎসাহী ব্যক্তি মনে করেন যে, আমাদের রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে রাসায়নিক সার পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। ইউরোপ ও জাপানে যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয় তার সামান্য অংশই আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রাসায়নিক সার জৈব সারের তুলনায় অনেক ভালো কিন্তু তাতে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয় এবং কিছু সাবধনতা অবলম্বন করে ব্যবহার করতে হয়। অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে এর বেশ কিছু অংশ সেচের ও বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় এবং পুকুর ও নদীকে দূষিত করে। আমাদের বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক ও জৈব সারের সুচিন্তিত সমন্বয় প্রয়োগ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। চিরাচরিত কৃষি-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোই আমাদের বিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য।

প্রতি হেক্টর জমি পিছু প্রায় ৮৭,০০০ টন বায়ুমণ্ডল আছে এবং এর শতকরা ৭০ ভাগ নাইট্রোজেন, যা উদ্ভিদের কাজে লাগে। আমরা এই বিশাল নাইট্রোজেনের উৎসকে ডালজাতীয় শস্য, বিন ও মটর লাগিয়ে ব্যবহার করতে পারি। আপনারা আগেই জেনেছেন যে এই সমস্ত গাছ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে সংযুক্ত করে এবং মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়।

আমাদের দেশে আপদনাশক ওষুধের (pesticide) গড় ব্যবহার উন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম। এখনকার উচ্চফলনশীল জাতের গাছগুলিতে বৃদ্ধি এত বেশি ঘটে যে রোগ ও পোকার উপদ্রব বেশি হয়, যেমন আমরা সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হই। উদ্ভিদের সুরক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশ অনুসারে ব্যবহার করাই নিরাপদ। যথেচ্ছ ও অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হলে এসব রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকারক অবশেষ আবার পরিবেশ দূষণ করে। এর ফলে বিশেষ করে জলসম্পদ দূষিত হয়। জৈব পদ্ধতিতে পোকা দমনের উপায় খোঁজা তাই খুবই জরুরি।

বর্তমানে কৃষির অগ্রগতি নিয়ে প্রভূত আলোচনার ফলে বিস্তৃত এলাকায় উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান ও গমের চাষ হচ্ছে। এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার ও জল নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়ার প্রয়োজন। উর্বর বিস্তৃত অঞ্চলে একই ফসল চাষ করলে বহু পোকা আকৃষ্ট হয়। সেজন্য কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার আবশ্যক। আপদনাশক সার ও ওষুধ তৈরির জন্য শুধু যে শক্তিরই দরকার হয় তা নয়, প্রযুক্তিগত কারণে অনেক জিনিসের আমদানিরও প্রয়োজন হয়। সেগুলি সংগ্রহ

করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রারও প্রয়োজন; যার ফলে দেশে "সবুজ বিপ্লব" হয়েছে, প্রচুর ফলন বেড়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরতাও বেড়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট মাত্রায় জলসেচের বন্দোবস্ত করে ফসল সুরক্ষার ব্যবস্থা করা একমাত্র বড়ো জোতের কৃষিজীবীদের পক্ষেই সুবিধাজনক। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমির মালিকানা ছোটো চাষিদের কাছে থাকায় বর্তমান কৃষিপ্রযুক্তি তাদের কাছে তেমন সুবিধাজনক হচ্ছে না। তাই, এ ধরনের কৃষিকাজ পূর্ববর্ণিত অন্যান্য বিষয়গুলিসহ গ্রামীণ এলাকায় ধনীদের আরও ধনী করেছে আর গরিবরা আরও গরিব হয়েছে।

অন্য একটি ধারণা হল যে, মাটি কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর অন্য কোন বিকল্প নেই এবং ক্ষুদ্র চাষিরাও যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে আধুনিক প্রযুক্তির সাফল্য চাষের পরিমাণ ক্ষুদ্র না বৃহৎ তার ওপর নির্ভর করবে না। অবশ্য গরিবদের মধ্যে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়।

আমাদের মতো বিশাল দেশে মাত্র ১০ শতাংশ কম উৎপাদনই খাদ্যাভাবে মৃত্যু ডেকে আনে। আবার সমপরিমাণ অধিক উৎপাদনের ফলে সংরক্ষণের সমস্যা হয়, দানা পচে যায়, বাজারে চাহিদার চেয়ে বেশি সরবরাহ চাষিদের বিপদে ফেলে এবং তারা ফসল আপৎকালীন বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পচনশীল বস্তুসমূহ যেমন, সবজি, ফল, ডিম, মাছ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে সমস্যাটা বেশি প্রকট। উৎপাদনের খরচের ওপর নির্ভর করে চাষিদের ন্যূনতম সুনিশ্চিত মূল্য দেওয়া এবং যথোপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কবন্দি করে ক্রেতাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। আবার আমাদের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত প্রযুক্তির সহায়তায় যদি এই প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কবন্দি করা হয় তাহলে সেটাই হবে সর্বোত্তম। যদি বিদেশি অথবা অংশীদারভুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয় তবে আমরা আমাদের লোকেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসমগ্রী যেমন, শাকসবজি, ফলের রস এবং মাছের প্রোটিন পাওয়া থেকে বঞ্চিত করব। সেইসঙ্গে ভারতীয় বাজারে এদের দামও বাড়বে। সুতরাং আপনারা দেখলেন যে বিজ্ঞান ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর ও আমাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পথ দেখাতে সক্ষম কিন্তু একমাত্র প্রকৃত জননীতি গ্রহণ করেই সুস্থির গতিশীল কৃষিবিকাশ সম্ভব হতে পারে।

২০.৫ উৎপাদনে মানুষের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য এবং ব্যবহারে সামাজিক অসামর্থ্য—দুইয়ের মধ্যে বৈষম্য

দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের আছে। কিন্তু সুষ্ঠু কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় আমাদের অনেক লোকই গরিব। সুতরাং, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা খাদ্য পায় না। যতদিন না আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা ছাড়া সমাহিত হয়, ততদিন দারিদ্র্য ও অপুষ্টির হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

আমাদের দেশের প্রায় ২৩ শতাংশ লোক কৃষিশ্রমিক, যাদের চাষযোগ্য জমি অথবা পালন করার গবাদি পশু নেই। তারা যেমন কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক তেমনি তারা দিনের শেষে রোজগারের অর্থ আশা করে। যেহেতু দিনমজুরি দিয়ে তাদের সংসার চলে, সেজন্য একমাত্র কর্মসংস্থানের এক জোরদার প্রচেষ্টাই তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে আবার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে আমাদের দেশে দান-খয়রাতির সমতুল বলে ধরা হয় এবং একজন কর্মপ্রার্থীকে যেন সামাজিক দায় বলে মনে করা হয় যদিও

প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে, তার নিজের ও দেশের স্বার্থে সেবায় নিযুক্ত করতে চাইছে। নীতি-নির্ধারক থেকে গ্রামস্তরের কর্মী, সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কাজের সুযোগ সৃষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গণ্য করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যাবে : (১) সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে (২) ব্যাংকের অর্থলগ্নির সহায়তায় গ্রামীণ সমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগের দ্বারা বিপণন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রেতা পরিসেবা ইত্যাদি গ্রামবাসীর পক্ষে এককভাবে সম্ভবপর নয়। গ্রামীণ সমবায় সংস্থার দ্বারাই এটা সম্ভব, যা অবশ্যই জাতীয় বিপণনসংস্থার সাথে যুক্ত থাকবে।

সেচ, পানীয় জল সরবরাহ, স্থায়ী রাস্তা তৈরি ও গ্রামে সুপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের প্রকল্প সরকারের তরফ থেকে দেশ জুড়ে নেওয়া যেতে পারে। এসব স্থায়ী জাতীয় সম্পত্তিই গ্রামবাসীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত রুজিরোজগার ও ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম।

ব্যাংক ও বিমা সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম্য সমবায়গুলির উচিত জাতীয় সমস্যাগুলির দিকে নজর রাখা যা সংঘবদ্ধ কাজের দ্বারাই সমাধান করা যেতে পারে।

দ্রুতহারে হ্রাস পাওয়া অরণ্যসম্পদ ও মাটিক্ষয়ের মতো দ্বৈত সমস্যা আমাদের চাষযোগ্য পতিত জমিতে ও গ্রাম্য রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ আকারে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা দশটি গাছ কেটে নিয়ে মাত্র একটি গাছ লাগাই, তাই এটি খুব জরুরি। শুধু গাছ লাগিয়েই আমাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না, গাছটি পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যত্ন নেওয়া উচিত, যার পর থেকে তারা নিজেরাই বাড়তে পারে।

মিশ্র মৎস্য-চাষ (একক ১৯, অনুচ্ছেদ ১৯.৯.২ দ্রষ্টব্য) এবং দামি সবজি ও ফলের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। কিন্তু আমাদের চাষিরা বেশি উৎপাদনের ফলে বাজারে অত্যধিক জোগান ও কম মূল্য পাওয়ার মতো সমস্যার ভয়ে ভীত গ্রাম্য সমবায়গুলি, বণ্টন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার একত্রীকরণ করলে উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়েই সুবিধা পাবে।

আমাদের খাদ্যে বিপজ্জনক রকমের কম পরিমাণ প্রোটিন ও চর্বি থাকা একটি উদ্‌বেগের কারণ। সুসংগঠিত বিপণন ও পদ্ধতিকরণ ব্যবস্থা প্রোটিন সমৃদ্ধ সয়াবিন চাষের বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে যেটা আমাদের অপুষ্টি পীড়িত মানুষের কাছে হবে আশীর্বাদস্বরূপ। সেই সঙ্গে নানা ধরনের তৈলবীজ (অয়েল পাম-সহ) উৎপাদনের দিকেও নজর দিতে হবে। বর্তমানে আমরা প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য তেল আমদানি করি। ধনী দেশগুলিতে অধিক পরিমাণে চর্বি-জাতীয় খাবার খেতে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে এটা হৃদরোগের প্রকোপ বাড়াতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু ধনী লোকদের বাদ দিয়ে, বেশি পরিমাণ চর্বি-জাতীয় জিনিস খাওয়া শুধু দরকারিই নয় এটা গুরুত্বপূর্ণও বটে, কারণ চর্বি শুধুমাত্র ঘনীভূত খাদ্যশক্তির উৎসই নয় এটি কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিনের বাহক হিসাবে কাজ করে।

কাপড়ের মাথাপিছু কম প্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সবচেয়ে উর্বর তুলো চাষের জমিতেও উৎপাদন প্রতি হেক্টরে মাত্র ৩৭০ কেজি যেখানে মিশরে প্রতি হেক্টর উৎপাদন প্রায় ৭০০ কেজি। সেখানে তুলো চাষ করা হয় সমবায়ের ভিত্তিতে মালিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। তুলো, ধান, চীনাবাদাম, আখ ও আবাদি (বাগিচা) ফসলসমূহে পোকার আক্রমণ ও গবাদি পশুর ছোঁয়াচে রোগ দমনের ক্ষেত্রে একমাত্র পুরো গ্রাম বা ব্লকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবে। সেখানে একক প্রচেষ্টা নিরর্থক। সুপরিচালিত যেসব সমবায় সংস্থাগুলির উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে, সেগুলি আমাদের গ্রামে এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৃষ্টির বয়ে যাওয়া অতিরিক্ত জল পুকুরে ধরে রাখা, ভূগর্ভস্থ জলের যথোপযুক্ত ব্যবহার, কৃষিজাত বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার, সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহার ও 'বায়ো গ্যাস' উৎপাদক স্থাপনে গ্রামীণ সমবায় সংস্থাগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ করতে পারে। এসবের মাধ্যমে প্রচুর রোজগারের বন্দোবস্ত হবে ও মহাত্মা গান্ধির অন্ত্যোদয়ের স্বপ্ন পূরণ হবে। যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন করি অথচ আমাদের অধিকাংশ লোকের ওই খাবার কেনার সামর্থ্য না থাকে তবে একটি নিতান্তই স্ববিরোধী অবস্থার সৃষ্টির হবে।

২০.৬ কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তি

কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করা। প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি এ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারছে না। সম্প্রতি জৈবপ্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে কৃষি বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে যেগুলির সমাধান সম্ভবপর হতে পারে। আরো এগোবার আগে জানা যাক জৈবপ্রযুক্তি বলতে আমরা কী বুঝি। জৈবপ্রযুক্তি হল কোন জৈবতন্ত্রের বা তার কার্যপ্রণালীর শিল্পের আকারে ব্যবহার।

বর্তমানে কৃষি-জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন গাছ তৈরি করা সম্ভব। এই উন্নত গুণগুলি হল : উচ্চফলন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, উন্নত পুষ্টি-গুণ এবং প্রতিকূল অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। উন্নত গাছ তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রজনন পদ্ধতি। এর দ্বারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের এক বা একাধিক পছন্দসই গুণ তাদের বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এজন্য গাছ লাগানোর বিভিন্ন রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেন। খুব সাধারণ পদ্ধতিগুলি হল :

(১) প্রচলিত রীতি, যেখানে বীজ ও শিকড় উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে গাছ তৈরি হয় (২) যে-কোনো একটি উদ্ভিদকোশ থেকে একটি নতুন গাছের সৃষ্টি হতে পারে। এর ওপর নির্ভর করে একটি কোশ বা অনেকগুলি কোশ বা গাছের একটি অংশ যেমন কাণ্ডের একাংশ, পাতা ইত্যাদি গবেষণাগারে সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পুষ্টিকর মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে। এটাই "টিসু কালচার" নামে প্রচলিত।

ফুল ফোটানো, বীজ উৎপাদন ও তাদের অঙ্কুরোদ্গম ছাড়াই এই উপায়ে আমরা একটি প্রকৃত সন্ততি-প্রজাতি পেতে পারি। শস্যের উন্নতি সাধনে এই পদ্ধতির বিশাল সম্ভাবনা আছে। উন্নত জাতের ধান, গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য বিভিন্ন গাছ তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র সাধারণ ফসলের উন্নত জাত তৈরিতেই নয়, অসাধারণ ও নতুন শস্যের সৃষ্টিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে যেগুলি যার স্বল্পমেয়াদি, উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধের ও প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন। শস্যের উন্নয়নে নিযুক্ত কৃষিবিজ্ঞানীর কাছে অন্যতম সমস্যা হল এই যে বহু নতুন ফসলের থেকে উদ্ভূত ভ্রুণ প্রকৃতিতে বাঁচবে না। ফলে তাঁরা পূর্ণবয়স্ক গাছ পেতে সক্ষম হন না। তবে এই অসুবিধা "টিসু কালচার" প্রয়োগে এড়ানো সম্ভব যেখানে এই ভ্রূণগুলি পুষ্টিসমৃদ্ধ মাধ্যমে গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জন্মানো হয় এবং পরে মাঠে লাগানো হয়।

বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আরেকটি কৌশল, যা কৃষিবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে একটি গাছের জিনগত উপাদানে অন্য কোন গাছের জিনগত উপাদান সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করা হয়। আপনারা ইতিপূর্বে শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ ও তাদের নাইট্রোজেন বন্ধন করার ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদদের নাইট্রোজেন ধরার ক্ষমতাযুক্ত জীবনগত উপাদানকে অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদে স্থানান্তরের চেষ্টা চালাচ্ছেন। কৃষির ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল অবদান হয়ে দাঁড়াবে।

জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে যদি আমরা বাগিচা বানাই সেক্ষেত্রে ফলের গাছগুলি হবে পছন্দসই, সঠিক উচ্চতাবিশিষ্ট এবং উপযুক্ত কাঠামোর। উৎপাদিত ফলগুলির আকার ও আকৃতি, রং ও ওজন হবে একইরকম। তাদের স্বাদ ও পুষ্টিগত মান একই হবে ও একই সময়ে পাকবে। এর ফলে ফল তোলা, সংরক্ষণ করা, বাক্সবন্দীকরণ, পরিবহন, পাত্রজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি সহজ হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত আমরা গাছের উন্নতির জন্য জৈবপ্রযুক্তির ব্যাবহারিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। একইভাবে জৈবপ্রযুক্তির সাহায্যে আমাদের বিভিন্ন পশু প্রজাতির উন্নতির প্রভূত সুযোগ আছে। ভ্রূণ স্থাপন প্রযুক্তির সাহায্যে

অনেক ভালো জাতের পশু অনেক কম সময়ে তৈরি করা যেতে পারে। এর জন্য হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় ডিম্বাণু তৈরি করতে উন্নত প্রজাতির একটি গোরুকে প্রবৃত্ত করা হয়। নিষেকের পরে ভ্রূণগুলি সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যবতী গোরুর দেহে স্থাপন করা হয়, যাদের আমরা 'বদলি-মা' বলে থাকি। এভাবে আমরা কম সময়ে উন্নত প্রজাতির অনেক বাছুর পাই। নতুন জৈবপ্রযুক্তি অনেক ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নজর কেড়েছে যারা নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা লগ্নি করতে উদ্যোগী হয়েছে। অনেকে এও আশঙ্কা করছেন যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি শীঘ্রই একচেটিয়া চাষের কারখানা (factory farming) শুরু করবে এবং বিশাল হারে এমন সস্তা দামে খাদ্য উৎপাদন করবে যার ফলে উন্নয়নশীল দেশের গতানুগতিক চাষিরা প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে যাবে এবং দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তবে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, যৌথ প্রয়াস এবং প্রযুক্তির হাতবদলের মাধ্যমে, জৈবপ্রযুক্তি সমগ্র বিশ্বের ভাবীকালের কৃষিপ্রকল্পে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

অনুশীলনী ১

নীচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ/শব্দসমূহের দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আধুনিক কৃষিকাজের অন্যতম বড় সমস্যা হল ————————।

(খ) এটা বলা হয় যে উন্নত দেশের কৃষিপ্রযুক্তি হল ———————— ভিত্তিক ও উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপ্রযুক্তি ———————— ভিত্তিক।

(গ) ———————— -এর ব্যবহার আধুনিক কৃষিকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং এর অধিকমাত্রায় ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত সমস্যা অনেকটা এড়ানো যাবে এর সাথে ———————— মিশিয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে।

(ঘ) বিভিন্ন ———————— রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেহেতু এদের অনেকগুলিই পরিবেশে ক্ষতিকারক ———————— রেখে যায়।

(ঙ) আমরা আধুনিক কৃষিকাজের অনেক সমস্যা কমাতে পারি ———————— শক্তির উৎস, ভালো ———————— ও ———————— পদ্ধতির ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন রকমের ———————— কমিয়ে।

(চ) অধিক পরিমাণে উৎপাদিত পচনশীল সামগ্রীর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য আমাদের চাই ————————, ———————— এবং ———————— করার উপযুক্ত ব্যবস্থা যাতে এগুলি ক্রেতাদের কাছে সহজপ্রাপ্য হয়।

(ছ) আমাদের শুধুমাত্র কৃষির ———————— বাড়ালেই হবে না, আমাদের ———————— গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনও আনতে হবে।

(জ) একজন গ্রামবাসী একক প্রচেষ্টায় তার উৎপাদিত সামগ্রীর ————————, ————————, ———————— ও ———————— করতে পারে না। এটি জাতীয় বিপণন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ ———————— গুলির দ্বারাই সাধিত হতে পারে।

(ঝ) ———————— বা ———————— থেকে অথবা ———————— কৌশল প্রয়োগ করে উন্নত মানের উদ্ভিদ তৈরির জন্য ছোটো চারাগাছ তৈরি করা যেতে পারে।

(ঞ) অতি অল্প সময়ে একই ধরনের অনেকগুলি বাছুর পাওয়ার উপায় হল ———————— প্রযুক্তি, যাতে সুস্থ মা থেকে ———————— স্থানান্তরিত করে ———————— মায়ের মধ্যে সংস্থাপন করা হয়।

(সামাজিক, পুনর্নবীকরণযোগ্য, বদলি, পরিবহন, বিপণন, উৎপাদন, বীজ, রাসায়নিক সার, অপচয়, ভ্রূণ, কলম বীজ, ভ্রূণ স্থানান্তর, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, অবশিষ্টাংশ, জৈব সার, শক্তি, শ্রম, চাষ, বাক্সবন্দি, পরিবহন, টিসু কালচার, বিতরণ, সমবায়, শস্যরক্ষক, শক্তি, প্রক্রিয়াকরণ)

২০.৭ সারাংশ

- বর্তমানে আমরা লাভজনক উপায়ে শুষ্ক অঞ্চল, নীরস এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহার করতে পারছি। এটা সম্ভবপর হয়েছে এই অঞ্চলগুলির পক্ষে সবচেয়ে বিভিন্ন প্রকারের ফসল চাষ করে এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পালন করে। এই অঞ্চলগুলিকে আমরা আরও উৎপাদনশীল করতে পারব যদি আমাদের গতানুগতিক পন্থার সামান্য পরিবর্তন করি।
- কৃষিজমির অনেকাংশই ক্ষারীয় ও লবণাক্ত মাটির জন্যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধরনের মাটিতে লবণের ভাগ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষারীয় মৃত্তিকা উপযোগী গাছ এবং ঘাস লাগিয়ে ব্যবহারের পাশাপাশি উন্নতি করাও সম্ভব। পরবর্তীকালে এই মাটিতে ক্ষার সহনশীল ধান এবং গম লাগানো যেতে পারে। লবণাক্ত জমিকে ব্যবহারোপযোগী করার প্রধান চাবিকাঠি হল জলনিকাশি ব্যবস্থা। যদি এই ব্যবস্থা ভালো থাকে তাহলে লবণাক্ত ভাব সহ্য করার মতো বিভিন্ন প্রকারের জোয়ার, ভুট্টা এবং গম লাভজনকভাবে চাষ করা যেতে পারে।
- আধুনিক কৃষিকার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হল খুব অল্প সময়ে, অল্প জায়গায় এবং অল্প শক্তি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপন্ন করা। বর্তমান কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা জড়িয়ে আছে। সব থেকে প্রধান ব্যাপার হল শক্তি। এর মধ্যে অনেকটাই নির্ভর করতে হয় পুনর্নবীকরণ করা যায় না এমন সম্পদের ওপর। এই সম্পদ সীমিত এবং তা শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে। আমাদের সেই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে পুনর্নবীকরণ হয় না এমন সব বস্তুর প্রয়োগ কমিয়ে এবং এটা করা সম্ভব হলে ভালো জাতের বীজ, চাষ-পদ্ধতি এবং রাসায়নিক সার ও জৈবসারের সুসংহত ব্যবহারের মাধ্যমে। আরেকটা প্রধান সমস্যা হল উৎপাদিত পরিমাণের সমস্যা। যদি উৎপাদন কম হয় তাহলে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা। আবার অতিরিক্ত উৎপাদনও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। উৎপাদনের খরচের ওপর ভিত্তি করে কৃষকদের জন্য একটা ন্যূনতম মূল্য ধার্য করা উচিত। এ ছাড়া, গ্রাহকরা যাতে উৎপাদিত দ্রব্য সহজে পেতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং বাঁধাছাঁদার কাজের সুবিধা থাকা দরকার।
- বর্তমানে আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান এবং প্রযুক্তি রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম হওয়ায় তারা খাবারের সংস্থান করতে পারে না। এইরকম পরিস্থিতির উন্নতি প্রচুর কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই সম্ভবপর। এ ছাড়াও গ্রামীণ সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে চাষীদের বিপণন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির উদ্ভাবন দ্রুত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

২০.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। নিম্নোক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলিতে কৃষিকাজের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করুন।

(ক) শুষ্ক অঞ্চল

(খ) নীরস মাটি

(গ) পাহাড়ি অঞ্চল

২। আধুনিক কৃষিকাজের মূল সমস্যাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩। "মানুষের উৎপাদন করার বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ও তার ব্যবহারের সামাজিক অক্ষমতার মধ্যে অমিল বর্তমান"—বিশ্লেষণ করুন।

৪। কীভাবে জৈবপ্রযুক্তি কৃষিকাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?

২০.৯ উত্তরমালা

১। (ক) উষ্ণতা, আর্দ্রতা

(খ) স্বল্পমেয়াদি, শীতসহ

(গ) বাবলা, প্রসোপিস, সফেদা

(ঘ) জল, জল-ব্যবস্থাপনার

(ঙ) রেড়ি, অড়হর

(চ) কাটা ও পোড়ানো, মাটি

(ছ) কার্বনেট ও বাইকার্বনেট

(জ) ক্লোরাইড, সালফেট

(ঝ) জল নিষ্কাশন

(ঞ) গোখাদ্য ঘাস, বৃক্ষ, জিপসাম

২। (ক) শক্তি

(খ) শক্তি, শ্রম

(গ) রাসায়নিক সার, জৈব সার

(ঘ) শস্যরক্ষক, অবশিষ্টাংশ

(ঙ) পুনর্নবীকরণ

(চ) পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, বাক্সবন্দি

(ছ) উৎপাদন, সামাজিক

(জ) বিপণন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সমবায়

(ঝ) বীজ, টিস্যু কালচার

(ঞ) ভ্রূণ স্থানান্তর, ভ্রূণ বদলি।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। (ক) শুষ্ক অঞ্চলে যেখানে উষ্ণতা এবং জল সরবরাহ কম, সেখানে শস্যেরই চাষ করা হয় যারা তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। সেই সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী যেমন ছাগল ও উট এসব অঞ্চলে পালন করা হয়। যেসব এলাকায় উষ্ণতা বেশি, সেখানে উপযুক্ত ঘাস এবং ফল ও জ্বালানি কাঠের গাছ লাগানো হয়। এ ধরনের অঞ্চলে ভালো ভালো প্রজাতির গবাদি পশু, ভেড়া এবং ছাগল পালন করা যেতে পারে।

(খ) এসব এলাকা বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। অধুনা উন্নত জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি এসব অঞ্চলগুলিকে কৃষিকাজের উপযোগী করে তুলেছে। এখানে সেই সব ফসলের জাতই লাগানো হয় যাদের কম জল লাগে। জোয়ার, সূর্যমুখী, কুসুম, সরষে, চিনাবাদাম, তুলো এবং বিভিন্ন ধরনের ডালশস্য এসব এলাকায় লাগানোর উপযোগী ফসল। এসব ফসল চাষে মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোজিত হয়, যার ফলে মাটির জলধারণের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

(গ) কিছু পাহাড়ি এলাকায় বহুদিন যাবৎ এমনকি আজও "ঝুম" প্রথায় চাষবাস হয়। এই ধরনের চাষ মাটির প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। বর্তমানে, একটি আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক জায়গায় চাষ হচ্ছে এবং সেটি খুবই ভালো মনে হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের উপরিভাগের জঙ্গলে পরিণত করা হয়। পরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ, ঘাস ও শিম্বী জাতীয় ফসল লাগানো হয়। শেষ যা নীচের এলাকায় পাহাড়ের ধাপে মিশ্র ফসলের চাষ করা হয়, জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। মৎস্য চাষ, মৌমাছির চাষ ইত্যাদি সংযোজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

২। (ক) বর্তমানে পুনর্নবীকরণ হয় না, এহেন শক্তির উৎসের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(খ) খুব বেশি যন্ত্র সহযোগে চাষ নিঃসন্দেহে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম তবে তা সেই সঙ্গে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেবে। ফলে লোকজনদের কেনার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

(গ) অনেক ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি খুবই অপচয়কারী বলে মনে হয়। কিছু কিছু অপচায়িত বস্তু যেমন রাসায়নিক সার এবং আপদনাশক ওষুধসমূহ পরিবেশে জমতে থাকে এবং এরা দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষতিসাধন করে।

(ঘ) বহু আধুনিক প্রযুক্তি বড়ো বড়ো জমিতে প্রয়োগ করার উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ চাষিই ক্ষুদ্র জোতের মালিক এবং তাই তারা অধুনালব্ধ প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারে না।

(ঙ) আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যদি শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে তাহলেই গুদামজাতকরণের সমস্যা দেখা দেয়, বাজারে চাহিদার চেয়ে বেশি সরবরাহ হয় এবং চাষিরা আপৎকালীন বিক্রিতে বাধ্য হয়। এই সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে যদি এইসব সামগ্রী পচনশীল হয়।

৩। (ক) যদিও আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিশেষ দক্ষতা দেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ লোকজনই দরিদ্র এবং তাই এসব পদ্ধতি লাগাতে পারে না। একটা বিশাল সংখ্যক মানুষের অর্থাভাবের ফলে তাদের খাবার ক্রয়েরও সামর্থ্য থাকে না।

(খ) আমাদের দেশের প্রায় ২৩% লোক কৃষিশ্রমিক এবং ভূমিহীন। তারা যে রোজগার করে তাই দিয়ে পেটের খিদে মেটায়।

(গ) বিপণন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রেতা পরিসেবা, এসবের একজন চাষির, বিশেষ করে যারা সামান্য জমির মালিক, সুযোগ নাগালের বাইরে।

(ঘ) জৈবপ্রযুক্তি গাছের এবং প্রাণীর উন্নত প্রজাতি তৈরিতে প্রচুর সাহায্য করতে পারে। নয়া কৌশল, যেমন "টিসু কালচার" শুধু যে অভিনব গাছ তৈরিতে সক্ষম তাই নয়, এর সাহায্যে কম সময়ে বহুসংখ্যক গাছ উৎপন্ন করতে পারা যায়। এজন্য বিভিন্ন ধাপ, যেমন ফুল ও বীজ উৎপন্ন হওয়া এবং বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের দরকার হয় না। জিনতাত্ত্বিক কলাকৌশলের (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অভীষ্ট গুণসম্পন্ন গাছ উৎপন্ন করা যায়। যদি আমরা বাগিচা তৈরির ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করি তাহলে যেসব ফল ধরবে সেগুলি হবে সমান মাপের, আকৃতির এবং ওজনের। এর ফলে তাদের ফল চয়ন, গুদামজাতকরণ, প্যাকিং, পরিবহন, পাত্রজাত করা (ক্যানিং) ও প্রক্রিয়াকরণ সহজতর হবে। ভ্রূণ স্থানান্তরিতকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে বেশিসংখ্যক ভালো প্রজাতির প্রাণী দ্রুততার সঙ্গে উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

একক ২১ □ খাদ্য ও পুষ্টি

গঠন

২১.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

২১.২ পুষ্টির গুরুত্ব

২১.৩ পৌষ্টিক বর্গগুলি এবং তাদের ক্রিয়া

২১.৪ অপরিহার্য পৌষ্টিক উপাদানসমূহ

২১.৫ দেহ-যন্ত্রে ইন্ধন রূপে খাদ্য

২১.৬ সুষম খাদ্য

২১.৭ খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

২১.৮ খাদ্যঘটিত অ্যালার্জি

২১.৯ খাদ্যে ভেজাল

২১.১০ অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য

২১.১১ সারাংশ

২১.১২ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

২১.১৩ উত্তরমালা

২১.১ প্রস্তাবনা

ভারতে খাদ্যের প্রাপ্তি ও বণ্টনের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে পূর্ববর্তী এককে আপনারা পড়েছেন। আমাদের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। আহারের জন্য যথেষ্ট খাদ্য না থাকা ছাড়াও সাধারণত তাদের খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য কয়েকটি উপাদানের অভাব থাকে। উপরন্তু সঠিক পুষ্টি সম্বন্ধে তাদের সচেতনতারও অভাব আছে। এই এককটিতে আমরা শিখব, আমাদের কাছে সহজলভ্য খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারি।

খাওয়ার টেবিলে ভাত, হাতে-গড়া রুটি, ডাল, সবজি ও দই নিয়ে সরল আহারের চেয়ে ভিজে জল-আনা নানারকম রান্না অনেক বেশি লোভনীয় মনে হয়। তবু জীবনধারণ, বুদ্ধি ও কাজকর্মের জন্য দেহের প্রয়োজনের

দৃষ্টিকোণ থেকে শেষোক্ত খাদ্যগুলি নিকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ হতে পারে। এতে আমাদের দেহকে কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানেরই প্রভাব থাকতে পারে। আবার কিছু কিছু খাদ্য আলাদা দেখালেও পুষ্টিমূল্যের দিক থেকে তাদের মিল আছে, যেমন দুধ, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি।

একজন প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আহার করেও যথাযথ পুষ্টি না পেতে পারেন, কারণ এই খাদ্যে এক বা একাধিক অপরিহার্য উপাদানের অভাব থাকতে পারে। একবারের আহার সম্পূর্ণ কিনা তা আমরা কীভাবে নির্ণয় করব? খাদ্যের পৌষ্টিক বর্গগুলি, আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ এবং কীভাবে সেগুলি আমাদের লভ্য খাদ্য থেকে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে এই এককে আমরা শিখব। সুষম খাদ্যের ধারণাও আমরা শিক্ষা করব।

একথা সত্য যে লোকের খাদ্যনির্বাচন আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়; কিন্তু পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা অর্থাৎ বিচক্ষণতার সঙ্গে খাদ্য নির্বাচন করতে শেখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে আপনি সম্ভবত নিজের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত করতে পারবেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে অবহিত করতে পারবেন। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, বিরাট আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলি অপুষ্টিতে ভুগছে, আবার স্বল্প আয়ের কয়েকটি পরিবার উন্নততর পুষ্টি লাভ করছে। এর কারণ, উপযুক্ত পুষ্টির জন্য নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীগুলির তরফে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহার। এ ছাড়া, আমাদের সকল দেশবাসীর জন্য উপযুক্ত খাদ্যের সহজপ্রাপ্যতা সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলির জটিলতা উপলব্ধি করতে এই সরল ধারণাগুলি আপনাদের সক্ষম করবে। অপুষ্টি ও তার মাত্রার সমস্যাগুলিও আমরা আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পরে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করতে পারা উচিত।

- একটি প্রদত্ত খাদ্যে বিভিন্ন পৌষ্টিক বর্গকে শনাক্ত করা;
- আপনার দৈনিক খাদ্যাহারকে বিচার করা এবং তা আপনার পৌষ্টিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে কিনা, তা দেখা;
- এমন খাদ্যাভ্যাস করা যা এক স্বাস্থ্যবান, আকর্ষণীয় ও সজাগ ব্যক্তির সৃজনে সাহায্য করে;
- বয়স, লিঙ্গ, কাজকর্ম, দৈহিক ওজন ও জলবায়ু অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির খাদ্যসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয়তার তুলনা করা;
- ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যসম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলির বিপদ বুঝতে পারা;
- অপুষ্টি এবং ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের অভাবজনিত রোগগুলির তালিকা প্রণয়ন করা;
- ভেজাল খাদ্যঘটিত অনিষ্ট উপলব্ধি করা;
- গৃহে,দোকানে ও গুদামে খাদ্যকে পচন ও অপচয়ের হাত থেকে রক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারা।

এই এককটিতে বহু সারণি আছে। আপনি এগুলিকে মুখস্থ করবেন, এমন প্রত্যাশিত নয়। প্রয়োজনে দেখার জন্য এগুলি সংকলিত হয়েছে।

২১.২ পুষ্টির গুরুত্ব

খাদ্য ব্যতীত আমরা বাঁচতে পারি না। যে-কোনো প্রকার খাদ্যেই আমাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ থাকার জন্য আমাদের দেহের বিশেষ কয়েক ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য বহু পরিমাণেই নির্ভর করে ভুক্ত খাদ্যের গুণমানের ওপরে। তদুপরি খাদ্য আমাদের চেহারায়, কাজকর্মে, আচরণে ও জীবনের মানে প্রভেদ ঘটাতেপারে।

বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে উপাদানের পার্থক্য আছে এবং কোন এক প্রকারের খাদ্যে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সেগুলির আবশ্যকীয় পরিমাণ থাকে না। আহারে যদি দীর্ঘকাল আমাদের প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ উপাদানের অভাব থাকে, তার পরিণামে রোগ এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং আমাদের দেহের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং তার বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে জানা অত্যাবশ্যক। বহুদেশে গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে, উত্তম খাদ্য শিশুদের যথাযথ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এবং মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়েছে। জাপানি বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি গবেষণা থেকে দেখা গেছে, উন্নত খাদ্য বালক-বালিকার গড় উচ্চতাকে কয়েক দশক আগের চেয়ে বাড়িয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশগুলির অধিকাংশ বালক-বালিকা সাধারণত অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের মধ্যে কারো যথেষ্ট আহার জোটে না, আবার কারো খাদ্য-তালিকায় এমন কিছু খাদ্যের অভাব থাকে যা দেহের পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই আমরা এসব বালক-বালিকার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির নিরন্তর মন্দন ঘটতে দেখি এবং তারা নানা অভাবজনিত রোগে ভোগে।

বর্তমানে পুষ্টিবিজ্ঞান একটি সুবিকশিত বিদ্যা। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কীপ্রকার পুষ্টির প্রয়োজন, এখন সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জানি। কিন্তু প্রধান সমস্যা হল, এই তথ্য আমাদের দেশবাসীর কাছে সহজলভ্য করা এবং এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যে খাদ্যে সকল প্রয়োজনীয় উপাদানই বর্তমান। অবশ্য ওই খাদ্যগুলি তাদের কাছে নিশ্চয়ই লভ্য হতে হবে।

২১.৩ পৌষ্টিক বর্গগুলি এবং তাদের ক্রিয়া

আমাদের দেহ যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে গঠিত, সেগুলির সঙ্গো আমাদের ভুক্ত খাদ্যের সম্পর্ক আছে—একথা আমাদের জানা উচিত। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন খাদ্যে বর্তমান রাসায়নিক পদার্থগুলি এবং দেহে সেগুলির ভূমিকা নির্ণয় করেছেন। তাঁর এই বস্তুগুলিকে পৌষ্টিক উপাদান (নিউট্রিয়েন্ট) আখ্যা দেন এবং এগুলিকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করেছেন।

খাদ্যের পৌষ্টিক উপাদানগুলি সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য আমাদের ঘরে রান্না-করা আলু-মটরের একটি পরিচিত পদ পরীক্ষা করা যাক। এটি রাঁধতে তেল বা ঘি ছাড়া পিঁয়াজ, টম্যাটো ও কিছু মশলাও ব্যবহৃত হয়। এই উপকরণগুলি থেকে কোন কোন পৌষ্টিক উপাদান পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

উপকরণ	পৌষ্টিক উপাদানের শ্রেণি
১. আলু	কার্বোহাইড্রেট
২. মটর	প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট

উপকরণ	পৌষ্টিক উপাদানের শ্রেণি
৩. ঘি/তেল	ফ্যাট
৪. পিঁয়াজ	খনিজ দ্রব্য
৫. টম্যাটো	ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য
৬. মসলা	খনিজ দ্রব্য
৭. জল	জল

আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণির পৌষ্টিক উপাদানই কীভাবে আমাদের আহারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা দেখাতে এই রান্না-করা পদটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই ছয় প্রকার পৌষ্টিক উপাদানই অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও জল আমাদের আহারে সঠিক অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজন। বহু প্রকারের খাদ্যবস্তু দিয়ে রান্না খাদ্যের একটিমাত্র পদ দিয়ে অথবা নানা পদের সংমিশ্রণে এই প্রয়োজন পূরণ করা যায়। প্রস্তাবিত খাদ্য থেকে একটি উপকরণ বাদ দিলে প্রাসঙ্গিক পৌষ্টিক উপাদানটিও আমরা হারাই। এভাবেই প্রত্যেক রান্না-করা খাদ্যের মান আমরা নির্ণয় করি।

আপনারা জানেন, সারা ভারতের নানা স্থানের খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতে বহু অংশে হাতে-গড়া রুটিই প্রধান খাদ্য আবার দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ভাতই প্রধান খাদ্য। অন্যান্য দেশের মানুষেরও খাদ্য সম্পর্কে নিজস্ব পছন্দ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই খাদ্যাভ্যাসের কারণ একটি বিশেষ ধরনের খাদ্যবস্তুর সহজলভ্যতা। যাই হোক, কোন বিশেষ খাদ্যই পরম প্রয়োজনীয় নয়, কারণ বহু বিকল্প খাদ্যই একই পৌষ্টিক উপাদান জোগাতে পারে। এখানে আমাদের অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, কোন একটি খাদ্যবস্তুতে অন্য একটি খাদ্যবস্তুর মতো অবিকল একই রকম পৌষ্টিক উপাদান থাকে না।

যেসবব খাদ্যে একই প্রকারের পৌষ্টিক উপদান বর্তমান, তাদের একই খাদ্যবর্গ বা ফুড-গ্রুপের অন্তর্গত করা যায়। এ থেকে আমরা বিকল্প খাদ্যবস্তু নির্বাচনের প্রশস্ত সুযোগ পাই। সারণি ২১.১-এ এই খাদ্যবর্গগুলি এবং তাদের পৌষ্টিক উপাদানগুলি দেওয়া হল :

সারণি ২১.১ : খাদ্যবর্গগুলি এবং তাদের প্রধান পৌষ্টিক উপাদান

খাদ্যবর্গ	পৌষ্টিক উপাদান
দানাশস্য ও জোয়ার বাজরা 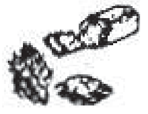	কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লৌহ এবং বি-বর্গীয় ভিটামিনগুলি
ডাল ও শিম্ব	প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লৌহ এবং বি-বর্গীয় ভিটামিনগুলি
বাদাম ও তৈলবীজ	ফ্যাট ও প্রোটিন

খাদ্যবর্গ	পৌষ্টিক উপাদান
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য 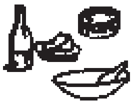	ফ্যাট, প্রোটিন ও ভিটামিন
মাংস, মাছ ও ডিম	প্রোটিন ও কিছু ভিটামিন
তেল-ঘি 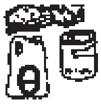	ফ্যাট
চিনি	কার্বোহাইড্রেট
মূল ও কন্দ	কার্বোহাইড্রেট
সবজি ও ফল	ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য

কতকগুলি খাদ্যে একটি পৌষ্টিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু অন্য উপাদানগুলি খুব অল্প আছে বা আদৌ নেই। যেমন, চর্বি ও তেলে প্রধানত ফ্যাট আছে; চিনিতে আছে বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট। ছয়টি পৌষ্টিক উপাদান বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন অনুপাতে বর্তমান। বিদ্যমান পৌষ্টিক উপাদানগুলির আপেক্ষিক হিসাবে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। উত্তর পুষ্টির জন্য আমাদের বহু বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের মিশ্রণ আহারের প্রয়োজন পড়ে।

অনুশীলনী ১

(ক) মধ্যাহ্নভোজনে খাদ্যের যে যে পদ আহার করেছিলেন, সেগুলির তালিকা রচনা করুন, সারণি ২১.১ ব্যবহার করে সেগুলিকে বিভিন্ন খাদ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সেগুলির মুখ্য পৌষ্টিক উপাদানগুলি উল্লেখ করুন। আপনার ধারণার জন্য খাদ্যের প্রথম পদটি সম্বন্ধে তথ্য সারণিতে ভরে দেওয়া হয়েছে। আপনার মধ্যাহ্নভোজনে সব ক'টি পৌষ্টিক উপাদান ছিল কিনা, মিলিয়ে দেখুন।

খাদ্যবস্তু	খাদ্যবর্গ	মুখ্য পৌষ্টিক উপাদানসমূহ
১. হাতে-গড়া রুটি	দানাশস্য ও জোয়ার	কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লৌহ ও বি-বর্গীয় ভিটামিন
২. ভাত	....	....
৩.	....	....
৪.	....	....
৫.	....	....
৬.	....	....
৭.	....	....

টীকা : রান্না-করা খাদ্যের পদ বিবেচনার সময়ে রন্ধন প্রণালীতে ব্যবহৃত সকল উপকরণ অবশ্যই তালিকায় দেবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিস্কুটে বর্তমান পৌষ্টিক উপাদানগুলি নির্ণয়ের জন্য সেটি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত ময়দা, দুধ, চিনি, ফ্যাট প্রভৃতি বিবেচনায় আনবেন।

(খ) খাদ্যের ক্রিয়া কী বলে আপনি মনে করেন?

আরও পড়ার আগে খাদ্যের ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে নীচের শূন্যস্থানে লিখুন :

....

....

আমরা যে খাদ্য আহার করি, তা নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে :

(ক) খাদ্য আমাদের দেহকে উষ্ণতা ও শক্তির জন্য দহনের ইন্ধন দেয়। এই শক্তি দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য, উভয় প্রকার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়। অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টান্ত হল : মস্তিষ্কে কাজকর্ম, হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, খাদ্যের পরিপাক, রেচন প্রক্রিয়া প্রভৃতি। আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকি, এগুলি অবিরাম চলে। বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আছে সকল প্রকার কাজ, খেলাধুলা ও ব্যায়াম।

(খ) প্রধানত শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য আমাদের সবল পেশি গঠন এবং রক্ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি দেয়। দেহকলাগুলির অবিরাম সংস্কারের জন্যও খাদ্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) সুরক্ষাতেও খাদ্যের একটি ভূমিকা আছে। খাদ্য আমাদের দেহকে সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং আমাদের পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকতে সক্ষম করে।

দেখা যাক, খাদ্যের এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনগুলির দায়িত্ব পূর্বে তালিকাভুক্ত পৌষ্টিক উপাদানগুলির ওপরে ন্যস্ত।

(ক) কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট দেহে শক্তির প্রধান উৎস। কার্বোহাইড্রেট সহজপ্রাপ্য এবং শক্তির সুলভতম উৎস। ফ্যাটও দেহে "আপৎকালীন শক্তিভাণ্ডার" রূপে কাজ করে। যেমন, উপবাস বা অনশনের জন্য যখন যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সঞ্চিত ফ্যাট ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটকে **শক্তিদায়ী খাদ্য** বলা হয়।

(খ) পেশি, ত্বক, রক্ত ও অস্থিগুলি গঠনের জন্য প্রোটিন কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে দেহকলাগুলির অবিরাম ক্ষয় হয়ে চলেছে, প্রোটিন সেগুলির সংস্কারে প্রযুক্ত হয়। অতএব আমাদের প্রতিদিনই প্রোটিন আহারের প্রয়োজন এবং প্রোটিন ব্যতীত বাঁচা সম্ভব নয়। যদি কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট দিয়ে দেহে শক্তির প্রয়োজন পূরণ না হয়,

তবে প্রোটিন শক্তির উৎসরূপেও কাজ করতে পারে। প্রোটিন সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও আমাদের সাহায্য করে। প্রোটিনকে বলা হয় **দেহগঠনকারী খাদ্য**।

(গ) খনিজ দ্রব্য ও ভিটামিনগুলি শক্তির উৎস নয়, কিন্তু কোশে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন আছে। এভাবে এগুলি খাদ্যকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে দেহকে সাহায্য করে। এগুলি আমাদের অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। ক্যালশিয়ামের মতো খনিজ দ্রব্যগুলি অস্থি ও দাঁতের মূল উপাদান। লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন নামে লাল রঞ্জকটির একটি উপাদান। নার্ভ বিভবের প্রবাহ এবং পেশির সংকোচন ও শৈথিল্যের জন্য খনিজ পদার্থগুলির গুরুত্ব আছে। ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যগুলিকে **রক্ষাকারী খাদ্য** বলা হয়।

(ঘ) রক্ত, পাচকরস প্রভৃতি দেহের যাবতীয় তরলের একটি উপাদান জল। দেহের ওজনের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগই জল। নানা বিপাক ক্রিয়ার জন্য জল অপরিহার্য। বস্তুত আমাদের দেহ কোন বস্তুকেই কাজে লাগাতে পারে না, যদি না প্রথমে তাকে জলে দ্রবণীয় আকারে পরিবর্তিত করা হয়। পরিপাকের দ্বারা খাদ্য দ্রবণীয় আকারে পরিবর্তিত হয়, তার ফলে সত্বর বিশোষিত হয় এবং দেহের যে স্থানে তার প্রয়োজন রক্তের দ্বারা সেখানে বাহিত হয়। ইউরিয়ার মতো বর্জ্য পদার্থগুলি রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে বৃক্কে যায় এবং সেখান থেকে সেগুলি রেচিত হয়। ঘর্মক্ষরণের মাধ্যমে জল দেহের উষ্মতা নিয়ন্ত্রণেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করে। জলবায়ু, কাজকর্ম ও গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতির ওপরে দেহে জলের দৈনিক প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে।

অনুশীলনী ২

নীচে প্রদত্ত শূন্যস্থানে নানাপ্রকার খাদ্যের উদাহরণ দিন :

দেহ গঠনকারী খাদ্য ....

শক্তিদায়ী খাদ্য ....

রক্ষাকারী খাদ্য ....

২১.৪ অপরিহার্য পৌষ্টিক উপাদাহসমূহ

আমাদের দেহ একটি প্রাণরাসায়নিক কারখানা যেখানে তার প্রয়োজনীয় বহু যৌগ প্রস্তুত করা যায়। অবশ্য এর সীমা আছে এবং আমাদের দেহ যা প্রস্তুত করতে পারে না, যথাযথ খাদ্য নির্বাচন করে তা সরবরাহ করতে হয়। এমন যৌগগুলিকে অপরিহার্য পৌষ্টিক উপাদান বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধিকাংশ প্রোটিনই বারো থেকে কুড়িটি নানা প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত; সেগুলির মধ্যে দশটি দেহ উৎপাদন করতে পারে না এবং খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এগুলিকে বলা হয় অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড। অবশিষ্টগুলি সেই অর্থে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড নয়, কেননা কোন প্রোটিন প্রধান খাদ্য থেকে দেহে সেগুলিকে প্রস্তুত করা যায়। অনুরূপভাবে অনেকগুলি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ এবং কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড দেহে তৈরি করা যায় না। তাই তাদের অবশ্যই খাদ্যের অন্তর্গত করতে হয়।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বনাম জান্তব প্রোটিন :

দানাশস্য, ডাল, বাদাম, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি নানা উৎস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রোটিনগুলির পুষ্টিগুণ ও পাচ্যতা সমান নয়। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে এগুলি বিভিন্ন পরিমাণে থাকে এবং উৎস অনুযায়ী

তাদের গুণ ও পাচ্যতায় পার্থক্য থাকে। জান্তব প্রোটিনে সব কটি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এবং এগুলিকে সম্পূর্ণ বা উচ্চগুণান্বিত প্রোটিন বলা হয়। এগুলির পাচ্যতাও অনেক বেশি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে এক বা একাধিক অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব আছে এবং এগুলিকে বলা হয় অসম্পূর্ণ প্রোটিন। এদের পাচ্যতা শতকরা প্রায় ষাট ভাগ। নানা উদ্ভিজ্জ থেকে লব্ধ প্রোটিনগুলি একত্রে একটি জান্তব প্রোটিনের মতোই উত্তম হতে পারে, কারণ একটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে যা নেই অন্যটির দ্বারা তার পরিপূরণ ঘটতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এককালীন আহারে যদি দানাশস্য ও ডাল থাকে, দানাশস্যে যে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি নেই ডালে সেগুলি পাওয়া যায় এবং ডালে যেগুলির অভাব দানাশস্যে তা থাকে। বিস্ময়ের কথা, বহু বছর ধরে আমরা ভারতীয়রা ডালরুটি অথবা ডালভাতের মিশ্রণ খেয়ে আসছি—সম্ভবত বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়াই।

মনে রাখবেন, নানাপ্রকার দানাশস্য, জোয়ার-বাজরা ও ডালের মিশ্রিত খাদ্য নিরামিষাশীদের সম্পূর্ণ পৌষ্টিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। সয়াবিন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সমৃদ্ধতম উৎস। অন্যান্য শিম্ব বা ডালজাতীয় শস্যের তুলনায় এতে দ্বিগুণ প্রোটিন আছে। মাংসের তুলনায় ডিম উচ্চগুণান্বিত প্রোটিনের এক অপেক্ষাকৃত সস্তা উৎস। ভারতে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ কেবল দানাশস্যই ক্রয়ে সক্ষম, যার অধিকাংশ ভাগই কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন খাদ্যগুলি মহার্ঘ্য যদিও সবজির দামও বেড়ে চলেছে। সারা বিশ্বে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উৎস থেকে প্রোটিন আহরণের প্রক্রিয়া ও প্রণালী আবিষ্কারের প্রয়াস চালাচ্ছেন। সাধারণভাবে খাওয়ার অযোগ্য সবুজ পাতা, অ্যাল্‌গি বা শৈবাল ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রোটিন নিষ্কাশনের পদ্ধতিগুলি গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রোটিনগুলি জটিল পদার্থ এবং বর্তমানে পরীক্ষাগারে এগুলিকে ভিটামিনের মতো উৎপাদন করা যায় না। ভবিষ্যতে এমন সময় আসতে পারে যখন তা সম্ভব হবে।

আমাদের একথাও জানা উচিত যে একদিন অতিরিক্ত প্রোটিন আহার করা উচিত নয়, কারণ এর মাত্র একটা অংশই দেহের গঠন ও সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্টাংশ দহনের মাধ্যমে শক্তি জোগাবে অথবা চর্বিতে পরিবর্তিত হবে। যেহেতু প্রোটিন দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে না, তাই তাদের অপচয় ঘটবে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য গড়ে একগ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। দেহে শক্তির চাহিদা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের দ্বারাই আরও ভালোভাবে পূরণ হয়।

ভিটামিন :

সম্ভবত কতকগুলি ভিটামিনের নামের সঙ্গে আপনারা পরিচিত। উদ্ভিজ্জ ও জান্তব খাদ্য থেকে এগুলি পাওয়া যেতে পারে। ভিটামিনগুলি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘকাল খাদ্যে এগুলির অভাবের পরিণামে নানা রোগ হয়। এই অবস্থা সংশোধনের জন্য কখনও কখনও ভিটামিনগুলি টনিক বা ঔষধ হিসাবে দিতে হয়। ভিটামিনগুলি নিজেরা শক্তির উৎস নয়, কিন্তু তারা কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। সুতরাং খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন থাকতে হবে। নানাপ্রকারের ভিটামিন আছে। বিশেষ একটি ভিটামিন অথবা দুই বা ততোধিক ভিটামিনের সমষ্টি স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং আমাদের দেহের কোন বিশেষ অঙ্গের কাজে সহায়তা করে। প্রতিটি ভিটামিনের একটি কাজ আছে এবং অন্য একটি প্রতিকল্প রূপে কাজে করতে পারে সারণি ২১.১-এ বিভিন্ন ভিটামিন, তাদের উৎস ও ক্রিয়াগুলির তালিকা রয়েছে। সুস্থ চক্ষু, মসৃণ ত্বক ও উজ্জ্বল কেশের জন্য প্রয়োজন ভিটামিন এ। ভিটামিন এ-র অভাবে আমাদের দেশে বহু শিশু অন্ধ হয়ে যায়। এটি সহজেই নিবারণ করা যায়, কারণ গাজর ও সবুজ শাকসবজির মতো যেসব খাদ্যে ভিটামিন এ থাকে, সেগুলি সহজপ্রাপ্য। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বি-বর্গীয় ভিটামিনগুলির বহু উপবর্গ আছে। এগুলির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া; কিন্তু উৎস মোটামুটি অভিন্ন। কখনও কখনও শিশুরা, এমনকি বয়স্করাও অরুচির অভিযোগ করেন। তাঁরা যেন আহারের জন্য

কখনও ক্ষুধিত হন না। এটি বি-বর্গীয় ভিটামিনের অভাবে ঘটে এবং এর পরিণামে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় ও বৃদ্ধির মন্দন ঘটে।

চিত্র ২১.১ : এক বছর বয়স্ক এল্‌মার ম্যাক্কলাম স্কার্ভি রোগে ভুগছিল এবং তার বাঁচার কোন আশা ছিল না। তার মা তাকে আপেলের খোসা খাইয়ে ফেলেছিলেন। তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে দেখে তিনি তাকে সবজি ও ফল খাওয়াতে থাকলেন। এভাবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি স্কার্ভি-নিবারক পথ্য উদ্ভাবন করলেন। কৌতূহলের কথা, এল্‌মার ম্যাক্‌কলাম বড় হয়ে ১৯১৩ সালে ভিটামিন এ আবিষ্কার করেছিলেন।

সারণি ২১.২ : ভিটামিনসমূহ, তাদের ক্রিয়া ও উৎস

ভিটামিন	ক্রিয়া	উৎস
ভিটামিন এ	স্তিমিত আলোকে আমাদের দেখতে সক্ষম করে। সুস্থ চক্ষু, মসৃণ ত্বক এবং উজ্জ্বল কেশের জন্য প্রয়োজন। স্বাভাবিক অস্থি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন।	মাখন, ঘি, দুধ, ডিমের কুসুম, তৈলাক্ত মাছ। গাঢ়বর্ণ শাকসবজি। ঘন হলুদ সবজি ও ফল।
ভিটামিন বি-বর্গ : বি$_{১}$, বি$_{২}$, বি$_{৩}$, বি$_{৪}$, বি$_{১২}$	নার্ভ, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয়। রক্তাল্পতা নিবারণে সাহায্য করে।	সম্পূর্ণ দানাশস্য। ডাল, অঙ্কুরিত ডাল, দুধ, ডিম, যকৃত, মস্তিষ্ক, বৃক্ক।
ভিটামিন সি	ক্ষতের দ্রুত নিরাময়ে সাহায্য করে। লৌহের বিশোষণ সুসাধ্য করে। দৈনিক উপযুক্ত পরিমাণে আহারে সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা গঠিত হয়।	আমলকী, পেয়ারা, পেঁপে। লেবুজাতীয় টক ফল। সবুজ শাকসবজি।
ভিটামিন ডি	ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস বিশোষণে সাহায্য করে। অস্থির যথাযথ নির্মাণে প্রয়োজন হয়।	ডিম, মাছের যকৃতের তেল, মুরগি। দুধ, মাখন, ঘি। দেহের সূর্যালোকে উদ্‌ঘাটন।
ভিটামিন ই	ভিটামিন এ-কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।	উদ্ভিজ্জ তেল। দানাশস্য, শস্যের ভ্রূণজাত তেল। বাদাম, শিম্ব।
ভিটামিন কে	রক্ত তঞ্চনের দ্বারা ক্ষতস্থানে রক্তপাত নিবারণ করে।	সবুজ শাকসবজি।

ভিটামিন সি টাটকা ফল ও সবজি বিশেষত লেবুজাতীয় টক ফল ও পেয়ারায় বর্তমান। আমাদের মুখ, নাক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির আবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্বাস্থ্যের জন্য এটি অপরিহার্য। সাধারণ সর্দির মতো সংক্রমণের বিরুদ্ধে

এটি প্রতিরোধশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি ডিম, দুধ, মাখন প্রভৃতিতে থাকে এবং অস্থির যথাযথ গঠনে সাহায্য করে। এর অভাবে অস্থি দুর্বল হয় অথবা দৈহিক অঙ্গাবিকৃতি দেখা দেয়, যেমন শিশুদের পায়ের অস্থি ধনুকের মতো বেঁকে যায়। এটিই একমাত্র ভিটামিন যা আমাদের দেহত্বকে উৎপাদন করতে পারে—সূর্যালোকের ক্রিয়ায়, যা ভারতে পর্যাপ্ত এবং যার, জন্য কোন ব্যয় নেই। ভিটামিন ডি-কে 'সূর্যালোকের ভিটামিন'ও বলে। চিত্র ২১.২-এ বিভিন্ন ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ খাদ্য দেখানো হয়েছে।

আমাদের জানা উচিত যে ভিটামিন বি এবং সি জলে দ্রবণীয়। সুতরাং দেহ তাদের ধরে রাখতে পারে না এবং আমাদের প্রাত্যহিক আহারে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্য ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয় নয়; এগুলির অতিরিক্ত অংশ দেহে সঞ্চিত থাকে। ভিটামিনগুলির অত্যধিক মাত্রাও অসুস্থতার কারণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পরেই শুধু এগুলিকে টনিক বা ঔষধ হিসাবে সেবন করা উচিত। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে যে যথেচ্ছ বি-বর্গীয় ভিটামিন এবং ভিটামিন সি সেবনের পরিণামে স্বাস্থ্যের ওপরে মাথাব্যথা, খিটখিটে ভাব, অনিদ্রা, বমনেচ্ছা প্রভৃতির মতো বহু প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঘটে।

কোন কোন অবস্থায় ভিটামনিগুলির সহজেই নষ্ট হওয়ার প্রবণতা আছে। সুতরাং রান্নার সময়ে তাদের ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা সবজি বা ফল কাটি বা ধুই, ভিটামিন সি এবং বি-বর্গীয় ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয় বলে ধুয়ে বেরিয়ে যায়। উচ্চ তাপে রান্না করলে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়।

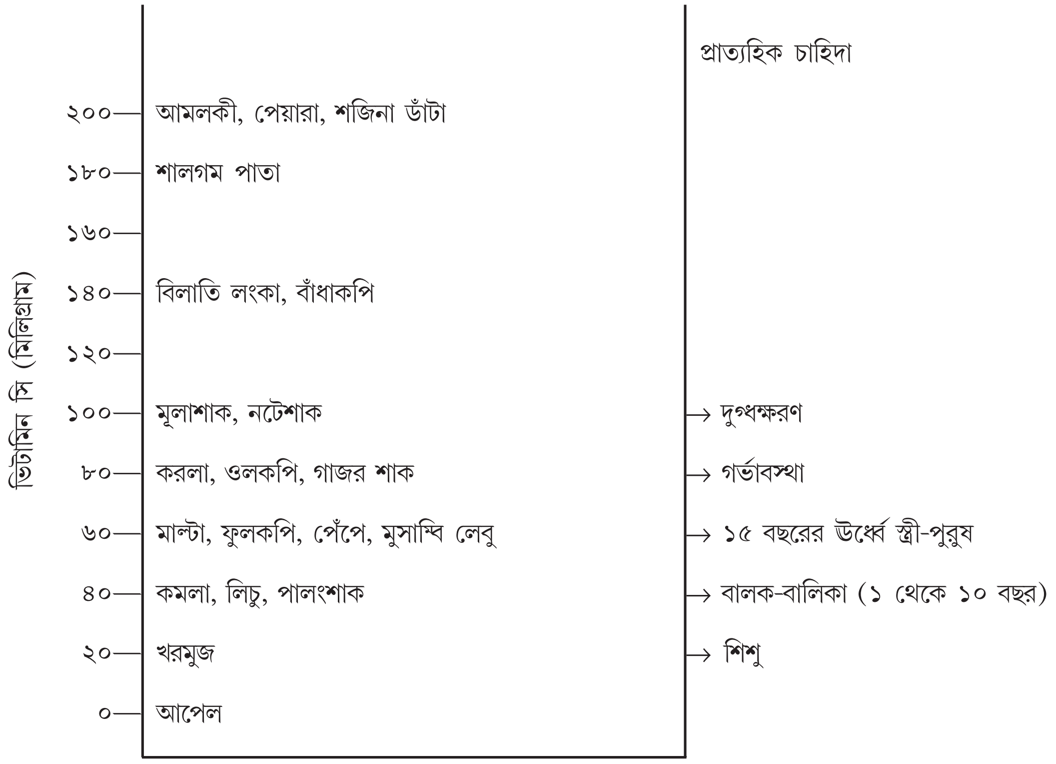

চিত্র ২১.২ : খাদ্যবস্তুর প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন সি-র পরিমাণ।

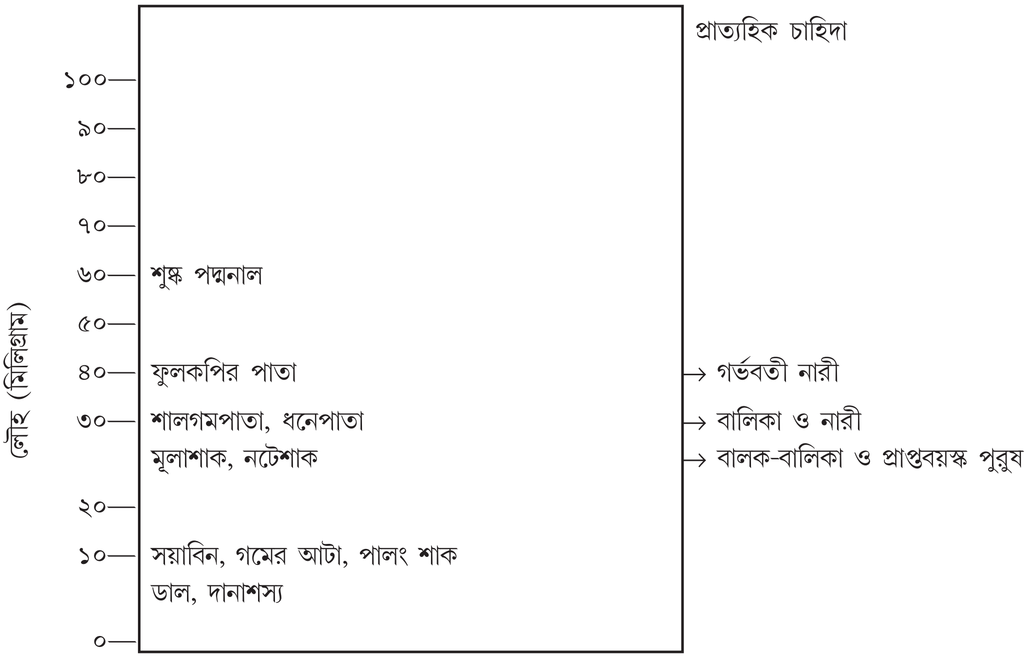

চিত্র ২১.৩ : খাদ্যবস্তুর প্রতি ১০০ গ্রামে লৌহের পরিমাণ
২০ পয়েন্ট স্কেলে মাত্রানুসারে সজ্জিত।

সুতরাং আমলকী, সবুজ লংকা, লেবু ও অন্যান্য লেবুজাতীয় টক ফল রান্নার বদলে কাঁচা খাওয়া উচিত। দুধ, দানাশস্য, সবজি প্রভৃতিতে বর্তমান ভিটামিন বি$_২$ দীর্ঘক্ষণ সূর্যালোকে উদ্ঘাটিত থাকলে নষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভিটামিনগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে ধরে রাখার জন্য রান্নার সময়ে নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) ধোয়া ও রান্নার জন্য যথাসম্ভব অল্প জল ব্যবহার করুন।

(খ) চাল, ডাল, সবজি প্রভৃতি ভেজানোর বা রান্নার জন্য ব্যবহৃত জল ফেলে দেবেন না। রান্নার জন্য ব্যবহার করুন অথবা অন্য কোন ভাবে গ্রহণ করুন।

(গ) কাটার আগেই সবজি ধোবেন, অন্যথায় ভিটামিনগুলি কাটা সবজি থেকে জলে বেরিয়ে আসবে এবং ধুয়ে বেরিয়ে যাবে।

(ঘ) কাটার অব্যবহিত পরেই সবজি রান্না করা উচিত।

(ঙ) যথাসম্ভব কম সময়ে রান্না করুন এবং রান্না-করা খাদ্য তৎক্ষণাৎ পরিবেশন করুন।

(চ) বেকিং সোডা ব্যবহার করবেন না, কারণ এটি ভিটামিন সি-কে নষ্ট করে দেয়।

খনিজ দ্রব্য :

আমাদের অস্থি ও দাঁতে প্রভূত পরিমাণে ক্যালশিয়াম আছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের অস্থিতে মোট প্রায় এক কিলোগ্রাম এবং একটি শিশুর অস্থিতে প্রায় ৩০ গ্রাম ক্যালশিয়াম থাকে। কাজেই শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক বেড়ে ওঠার সময়ে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম অস্থিগুলিতে যুক্ত হয়। সুতরাং চিকিৎসকেরা শিশু ও গর্ভবতী নারীদের

ক্যালশিয়ামের বড়ি সেবনের বিধান দেন। দেহে ক্যালশিয়াম সবসময়েই অন্য একটি খনিজ দ্রব্য ফসফরাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দুধ ও সবুজ শাকসবজি ক্যালশিয়ামের একটি অত্যুত্তম উৎস। পেশির যথাযথ কাজ এবং রক্ততঞ্চনের জন্যও ক্যালশিয়ামের প্রয়োজন।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য হল লৌহ, যার প্রয়োজন হয় রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রস্তুত করতে। হিমোগ্লোবিন রক্তকে লোহিত বর্ণ করে। দেহে এক কিলোগ্রাম ক্যালশিয়ামের তুলনায় লৌহের মোট পরিমাণ প্রায় ৩ গ্রাম। বাড়ন্ত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের লৌহের প্রয়োজন। ঋতুস্রাবের সময়ে নারীরা লৌহ হারান, তাই তাঁদের অতিরিক্ত লৌহের প্রয়োজন হয়। চিত্র ২১.৩-এ বিভিন্ন লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেহের সুস্থ ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রায় সতেরোটি ভিন্ন ভিন্ন খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজন। অবশ্য আমরা যে পরিমাণ খাদ্য আহার করি, তার তুলনায় এগুলির পরিমাণ নগণ্য। এজন্য এই খনিজ দ্রব্যগুলিকে 'অণুপৌষ্টিক উপাদান' (Micronutrient) বলে। এই খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কতকগুলি দেহের কোশ ও দেহরসগুলির উপকরণ এবং সেই সুবাদে কোশের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। আপনারা কি ফ্লুরাইড টুথপেস্টের কথা শুনেছেন? দন্তক্ষয় প্রতিরোধক মজবুত দাঁত গড়তে ফ্লুরিন অপরিহার্য। সেই কারণেই আজকাল ফ্লুরিনযুক্ত দাঁতের মাজন ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অতিরিক্ত ফ্লুরিন আবার ক্ষতিকর। অন্ধ্রপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কতকগুলি জেলার জলে অত্যধিক ফ্লুরিন আছে। এই জল পান করার ফলে দাঁত নিষ্প্রভ ও ছোপযুক্ত হয়ে যায় এবং এনামেল দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিবারের আহারে আমরা সাধারণ লভণ বা খাদ্যলবণ খাই। দেহের যথাযথ ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি অত্যাবশ্যক। খাদ্যলবণ হল সোডিয়ামের ক্লোরাইড। গ্রীবায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থির দ্বারা উৎপাদিত হরমোনটির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সামান্য পরিমাণে আয়োডিন। এর অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত হয়। এই অবস্থা গলগণ্ড নামে পরিচিত। এখন বাজারে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা আয়োডিন পেতে পারি।

অনুশীলনী ৩

(ক) শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(১) আমাদের দেহ যেগুলিকে সংশ্লেষণ করতে পারে না, সেগুলি হল .... ।

(২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে কতকগুলি .... অ্যামাইনো অ্যাসিডের আছে।

(৩) .... হল উদ্ভিজ্জ .... -এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎস।

(৪) ...., ..., ... এবং .... হল উচ্চগুণান্বিত প্রোটিন, কারণ এগুলিতে সব ক'টি আছে।

(৫) একদিন অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে .... তা এবং .... -এ পরিণত হয়।

(৬) দেহের শক্তির প্রয়োজনীয়তা .... -এর দ্বারা পূরণ করা উচিত।

(৭) ...., ... এবং .... -এর একটি মিশ্রিত খাদ্য মাংসের মতোই উত্তম প্রোটিন সরবরাহ করে।

(খ) নীচের সারণির প্রথম স্তম্ভে প্রদত্ত ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যগুলিকে দ্বিতীয় স্তম্ভে তালিকাবদ্ধ ক্রিয়াগুলির সঙ্গে মেলান :

ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য	ক্রিয়া
(ক) ভিটামিন বি	(১) সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করে।
(খ) ভিটামনি এ	(২) রক্তের হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন।
(গ) ভিটামিন ডি	(৩) এর অভাবে পা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে পারে।
(ঘ) ভিটামিন কে	(৪) বলিষ্ঠ অস্থি ও দাঁতের গঠনের জন্য প্রয়োজন।
(ঙ) ভিটামনি সি	(৫) সুস্থ চক্ষু, মসৃণ ত্বক ও উজ্জ্বল কেশ পেতে সাহায্য করে।
(চ) ক্যালশিয়াম	(৬) রক্তপাত নিবারণ করে।
(ছ) লৌহ	(৭) নার্ভ ও মস্তিষ্কের যথাযথ ক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
(জ) আয়োডিন	(৮) থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীত রোধ করে।

২১.৫ দেহযন্ত্রের ইন্ধন রূপে খাদ্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অভ্যন্তরীণ তথা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও বৃদ্ধির জন্য দেহে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অন্যদিক দিয়ে দেখলে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় ক্রিয়াকলাপের জন্যই দেহে শক্তির প্রয়োজন। এই অর্থে আমাদের দেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং দেহটিকে চালাতে যে ইন্ধনের প্রয়োজন তা হল খাদ্য। ইন্ধনের দহন বা জ্বলনের সঙ্গে তুলনীয় বিপাক (metabolism) নামে একটি পদ্ধতিতে দেহে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই 'দহনে' অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অন্তত একটি নিম্নতম পরিমাণে শক্তি না পেলে দেহ তার স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলি নির্বাহে অথবা বাহ্য কাজকর্ম সাধনে সক্ষম হয় না।

কিন্তু, যন্ত্রে ও মানবদেহের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হল, মানবদেহ সেই একই ইন্ধনে নির্মিত যা সে শক্তি উৎপাদনেও ব্যবহার করে। কোন যন্ত্র তার চালনার জন্য নিজেকেই ইন্ধন রূপে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেহ তা পারে। এভাবে উপবাসের সময়ে শক্তি পাওয়ার জন্য দেহ তার নিজস্ব চর্বি দহন করে এবং এর ফলে দেহের ওজন হ্রাস পায়। দেহের চালনার জন্য যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি শক্তি দেহকে সরবরাহ করলে তা চর্বির আকারে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য দেহে সঞ্চিত হয়।

দেহের শক্তির প্রয়োজনীয়তা 'ক্যালোরি' (calorie) অথবা কিলো ক্যালোরির (১০০০ ক্যালোরি) হিসাবে মাপা হয়, শেষোক্তটিকে সাধারণত বড়ো হাতের অক্ষরে Calories এভাবে লেখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চায়ের চামচের এক চামচ চিনি (৫ গ্রাম) দগ্ধ হলে ২০ ক্যালোরি (calories) অর্থাৎ ২০ কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে। নানা কাজ করতে কত ক্যালোরি ব্যবহৃত হয়, তা নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বয়স ও ওজনের শিশু, বালিকা, বালক ও প্রাপ্তবয়স্কের শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে কতটা খাদ্যের প্রয়োজন, তা জানতে আপনাদের কৌতূহল হবে। এর হিসাব করতে হলে আমাদের জানার প্রয়োজন হবে :

(ক) বিভিন্ন পৌষ্টিক উপাদানের শক্তিমূল্য এবং

(খ) যেসব বিষয় কোন ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন পৌষ্টিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত শক্তি নীচে দেওয়া হল—এগুলিকে পেট্রোলের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কার্বোহাইড্রেট	:	প্রতি	গ্রামে	৪.০	কিলো ক্যালোরি
প্রোটিন	:	"	"	৪.০	"
ফ্যাট	:	"	"	৯.০	"
পেট্রোল	:	"	"	১০.০	"

ভারতীয় খাদ্যগুলির শক্তি ও পৌষ্টিক মূল্য ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কয়েকটি সাধারণ খাদ্যবস্তুর শক্তিমূল্য ও প্রোটিনের পরিমাণের তালিকা আমরা সারণি ২১.৩-এ দিয়েছি।

সারণি ২১.৩

কিছু সাধারণ খাদ্যের শক্তি ও প্রোটিনের পরিমাণ

খাদ্যবস্তু	শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ ১০০ গ্রামে)	প্রোটিন (গ্রাম) (প্রতি ১০০ গ্রামে)	খাদ্যবস্তু	শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ ১০০ গ্রামে)	প্রোটিন (গ্রাম) (প্রতি ১০০ গ্রামে)
দানাশস্য	৩৪০	১০-১৩	চীনাবাদাম	৫৭০	২৫.৩
ডাল ও শিম্ব	৩৪৫	২০-২৫	নারিকেল (শুষ্ক)	৬৬০	৬.৮
সয়াবিন	৪৩০	৪৩	বাদাম	৬৫৫	২০.৮
দুধ—মোষের	১২০	৪.৩	কলা	১১৬	১.২
দুধ—গোরুর	৭০	৩.২	পেয়ারা	৫০	০.৯
দুধ—মাখনতোলা	৩০	২.৫	আম	৭৪	০.৬
পনির	২৬৪	১৮.৩	কমলা	৪৮	০.৭
চিজ	৩৪৮	২৪.১	পালং	২৬	২.০
মাখন	৭৩০	—	আলু	৯৫	১.৬
উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বি	৯০০	—	মাংস	২০০	১৮.৫
ডিম	১৭০	১৩.৩	মাছ	১০০	১৪.৯
চিনি	৩৯০	—			

চিত্র ২১.৪ : পুষ্টি সম্বন্ধে একটি মুখ্য পরীক্ষা। আঁতোয়ান লাভয়সিয়ে ও পিয়ের দ্য লাপ্লাস ১৭৮৩ সালে দেখিয়েছিলেন যে অনেকটা আগুনের মতই দেহ খাদ্যকে জ্বালায়। ওপের প্রদর্শিত পরীক্ষাটিতে তাঁরা গিনিপিগের দ্বারা উৎপন্ন তাপ (বিগলিত বরফের পরিমাণ রূপে) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মেপেছিলেন এবং এদের অনুপাতটি কাঠকয়লার দহনের দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ অনুপাতের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখতে পেয়েছিলেন।

এবারে দেখা যাক, ব্যক্তির দৈনিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা কী দিয়ে নির্ধারিত হয়। কোন ব্যক্তির শক্তির আবশ্যকতা প্রধানত নির্ভর করে এগুলির ওপরে :

(ক) দেহের অভ্যন্তরীণ বা মৌল পদ্ধতি যাকে মৌল বিপাকহারও (বেসাল মেটাবলিক রেট, BMR) বলা হয় এবং

(খ) কায়িক ক্রিয়াকলাপ।

অভ্যন্তরীণ কাজের বা মৌল বিপাকের জন্যই অধিকাংশ শক্তি ব্যয় হয়। এটি দেহপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, লিঙ্গ, উষ্ণতা, হরমোনের মাত্রা প্রভৃতির মতো নানা বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির এবং বিভিন্ন অবস্থায় মৌল বিপাকহার এরকম :

দীর্ঘ শীর্ণ ব্যক্তি > খর্ব শীর্ণ ব্যক্তি

পেশিবহুল ব্যক্তি > খর্ব স্থূল ব্যক্তি

শিশু > কিশোর

পুরুষ > নারী

জাগ্রত > নিদ্রিত

তরুণ > বৃদ্ধ

জ্বরের সময়ে > স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে

শীতল আবহাওয়ায় > উষ্ণ আবহাওয়ায়

হালকা, মাঝারি বা ভারী, কী ধরনের কাজ কোন ব্যক্তি করে, তার ওপরে কায়িক ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে। সাধারণত মৌল বিপাকহারের তুলনায় কায়িক পরিশ্রমে শক্তির প্রয়োজন কম—অবশ্য পাথরভাঙা, দৌড়ানো প্রভৃতি ভারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে কঠিন কায়িক শ্রমের পরে আমরা খুব ক্ষুধার্ত বোধ করি এবং আলস্যে বসে থাকার সময়ের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্য আহার করি।

নীচের সারণিটিতে হালকা, মাঝারি, ভারী ও কষ্টসাধ্য শ্রমের কাজ এবং এগুলিতে শক্তি ব্যয়ের হিসাব (ঘণ্টা প্রতি কিলো ক্যালোরিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ২১.৪ : বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের জন্য শক্তির আনুমানিক প্রয়োজনীয়তা

হালকা কাজ ঘণ্টা ১৫০ কিলো ক্যালোরি	মাঝারি কাজ ঘণ্টা ১৫০-২৫০ কিলো ক্যালোরি	ভারী কাজ ঘণ্টা ২৫০-৩৫০ কিলো ক্যালোরি	কষ্টসাধ্য কাজ ঘণ্টা ৩৫০ কিলো ক্যালোরি
পড়া লেখা টাইপ করা বাসন ধোয়া ইস্ত্রি করা বসে থাকা পরিবেশন করা কথা বলা	মোছামুছি করা মেঝে ঘষা কাপড় কাচা পালিশ করা বাগান করা ছুতারের কাজ হাঁটা	সাইকেল চালানো খেলাধুলা কাঠচেরাই	টেনিস, ফুটবল ও হকি খেলা, দৌড়ানো কঠিন শ্রম দ্রুত সাইকেল চালানো দ্রুত সাঁতার কাটা

একজন মাঝারি পরিশ্রমী ব্যক্তির গড় মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই দিনে ২০০০ কিলো ক্যালোরি ধরা হয়।

২১.৬ সুষম খাদ্য

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা খাদ্যের গুণ ও পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। একটি খাদ্যতালিকায় দুটিই সুষম অবস্থায় থাকা উচিত। একটি সুষম খাদ্য-তালিকা হল বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের এমন একটি মিশ্রণ যা কোন ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে এবং তাকে সুস্থ রাখার জন্য যথাযথ প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও অনুপাতে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে। একটি খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন খাদ্যবস্তু থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির শতকরা হিসাব চিত্র ২১.৫-এ দেওয়া হল। সারণি ২১.৫ থেকে বিভিন্ন বয়োগোষ্ঠীর জন্য সুষম খাদ্যের উপকরণগুলি পাওয়া যাবে।

সারণি ২১.৫ : বিভিন্ন বয়োগোষ্ঠীর জন্য সুষম খাদ্য-তালিকা

খাদ্যবস্তু	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (গ্রামে)								
	প্রাপ্তবয়স্ক (মাঝারির কাজ)		অতিরিক্ত পরিমাণ		প্রাক্-বিদ্যালয় বালক-বালিকা			বালিকা	বালক
	পুরুষ	নারী	গর্ভবতী	স্তন্যদায়ী	১-৩	৪-৬	১০-১২	১৩-১৮	১৩-১৮
মিশ্র দানাশস্য	৪৭৫	৩৫০	৫০	৭০০	১৫০	২০০	৩২০	৩৫০	৪৩০-৪৫০
ডাল ও শিম্ব	৮০	৭০		১০	৫০	৬০	৭০	৭০	৭০
সবুজ শাকসবজি	১২৫	১২৫	২৫	২৫	৫০	৭৫	১০০	১৫০	১০০
অন্যান্য সবজি	৭৫	৭৫			৩০	৫০	৭৫	৭৫	৭৫
মূল ও কন্দ	১০০	৭৫						৭৫	১০০

খাদ্যবস্তু	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (গ্রামে)								
	প্রাপ্তবয়স্ক (মাঝারির কাজ)		প্রাক্-বিদ্যালয় অতিরিক্ত পরিমাণ		বালক-বালিকা			বালিকা	বালক
	পুরুষ	নারী	গর্ভবতী	স্তন্যদায়ী	১-৩	৪-৬	১০-১২	১৩-১৮	১৩-১৮
ফল	৩০	৩০			৫০	৫০	৫০	৩০	৩০
দুধ	২০০	২০০	১২৫	১২৫	১২৫	৩০০	২৫০	২৫০	২৫০
ঘি-তেল ও চবি	৪০	৩৫		১৫	২০	২৫	৩৫	৩৫	৪৫
চিনি ও গুড়	৪০	৩০	১০	২০	৩০	৪০	৫০	৩০	৪০
মোট ক্যালোরি	২৮০০	২২০০	২২০-৩০০	২২০-৭০০	১২০০	১৫০০	২১০০	২২০০	২৫০০-৩০০০

মেধ বৃদ্ধি :

সাধারণত মোটা লোকেরা ভাবেন, ধাতুগত অথবা বংশগত কারণে তাঁরা মোটা। এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে। কিন্তু আপনারা কি কখনও কোন মোটা মজুর, কুলি, খেলোয়াড় বা পর্বতারোহী দেখেছেন? যদিও তাঁরা মোটা লোকদের চেয়ে অনেক বেশি আহার করেন, তবু তাঁদের ওজন বাড়ে না কেন? কারণ তাঁরা কায়িক কাজকর্মে ক্যালোরি ব্যবহার করে ফেলেন। যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি আহার করলে সেই অতিরিক্ত ক্যালোরি দেহে চর্বির আকারে জমা হয় এবং ক্রমে ওজনাধিক্য ঘটে। সঠিক ওজন এবং কাজকর্মের অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

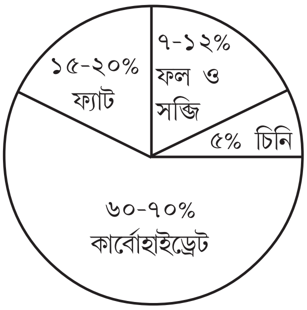

চিত্র ২১.৫ : একটি সুষম খাদ্যতালিকায় পৌষ্টিক প্রয়োজনানুসারে খাদ্যবস্তুগুলির মধ্যে ক্যালোরির বিভাজন।

চিত্র ২১.৬

চিত্র ২১.৭ : দেখ, মা! আমি আমার আহারের সাম্য রাখছি।

চিত্র ২১.৮ : অতিরিক্ত শক্তি আহার

জ্বর ও সংক্রমণের সময়ে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা :

জ্বরের সময়ে দেহকলার প্রোটিন ভেঙে পড়ে এবং দেহ জল ও লবণ হারায়। প্রতি ডিগ্রি উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌল বিপাকহারও বৃদ্ধি পায়। এমন পরিস্থিতিতে কী প্রকার খাদ্য বাঞ্ছনীয়?

মৌল বিপাকহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দেহকলার প্রোটিনের ভাঙন ঘটায় প্রোটিন ও ক্যালোরিতে সমৃদ্ধ খাদ্য বাঞ্ছনীয়। রোগীকে দুধ, ডিম, কাস্টার্ড, পুডিং, ফলের রস প্রভৃতির মতো সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া উচিত। শক্তির তাৎক্ষণিক চাহিদা গ্লুকোজ ও চিনির দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে।

জ্বরের সময়ে মাখন, ঘি ও উদ্ভিজ্জ তেলের মতো ফ্যাট বর্জন করা উচিত। কিন্তু একবার জ্বর সেরে গেলে এগুলিকে খাদ্যের অন্তর্গত করা উচিত, কারণ এগুলি শক্তির সমৃদ্ধ উৎস।

খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে আপনারা এখন নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত হয়েছেন। এবারে একটু বিরতি দিয়ে আপনারা নিজেদের পছন্দমতো কিছু খেয়ে নিন এবং তারপরে নীচের অনুশীলনীটি উত্তর করতে চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী ৪

(ক) বন্ধনীর মধ্যে লেখা শব্দগুলি থেকে ভুল শব্দগুলি কেটে দিন।

(১) ২০ গ্রাম ফ্যাট (২০ গ্রাম/৪৫ গ্রাম/৭০ গ্রাম) কার্বোহাইড্রেটের সমান শক্তি সরবরাহ করে।

(২) শিশুদের (অল্প শক্তি/অধিক শক্তি) এবং (কম প্রোটিন/বেশি প্রোটিন)-যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন।

(৩) একজন বৃদ্ধের চেয়ে একজন তরুণের (বেশি/কম) শক্তির প্রয়োজন হয়।

(৪) একজন লোকের মোটা হওয়ার কারণ (বংশগত/ধাতু/অত্যধিক ক্যালোরি আহার/মৌল বিপাকহারের আধিক্য)।

(খ) একবারের আহারে নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তুগুলি আছে। সারণি ২১.৩-এ প্রদত্ত উপাত্ত ব্যবহার করে এর শক্তিমূল্য হিসাব করুন।

দুটি হাতে-গড়া রুটি (প্রতিটি ২৫ গ্রাম)

এক প্লেট ভাত (৫০ গ্রাম)

দুবারের মাপে ডাল (২৫ গ্রাম)

একবারের মাপে পালং শাক (৫০ গ্রাম)

একবারের মাপে আলুর তরকারি (৯০ গ্রাম)

একটি আম (১৫০ গ্রাম)

এক টেবিল চামচ ফ্যাট (১০ গ্রাম)

২১.৭ খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

আপনার পরিবারবর্গ বা বন্ধুবান্ধবের নিকট থেকে আপনি এমন ধারণা গ্রহণ করে থাকতে পারেন যে খাদ্যের কোন কোন মিশ্রণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। যেমন, দুধ ও মাছ অথবা দুধ ও মূলা একত্রে খাওয়া বিপজ্জনক, কারণ এর ফলে শ্বেতি নামক চর্মরোগ হয় অর্থাৎ ত্বকে সাদা ছাপ পড়ে। দই খাওয়ার অব্যবহিত পরে অথবা ফলের সঙ্গে দুধ পান করা অনুচিত, কারণ তাতে পাকস্থলীতে দুধ ছানা হয়ে যায়। বস্তুত এমন সব বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পাকস্থলীতে দুধের কী হয়, তা জানেন কি? আমাদের পাকস্থলীতে যে পাচকরস থাকে, তা দুধকে পরিপাকের আগে ছানায় পরিণত করে।

কিছু লোক আবার কতকগুলি রোগ নিরাময়ের জন্য খাদ্যের বিশেষ বিশেষ মিশ্রণ খাওয়ার সুপারিশ করেন। এসব পরামর্শ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের নিকট থেকে এসে থাকতে পারে, কিন্তু এগুলিকে কার্যকর করা নিরাপদ না হতে পারে, কারণ ওই পথ্যে কতকগুলি অপরিহার্য পৌষ্টিক উপাদানের অভাব থাকতে পারে। এমন সবসময়ে চিকিৎসকের বিধান অনুযায়ী পথ্যই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

২১.৮ খাদ্যঘটিত অ্যালার্জি

খাদ্যঘটিত অ্যালার্জি খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার থেকে স্বতন্ত্র। কোন কোন খাদ্য কিছু লোকের দেহের বিজাতীয় প্রতিক্রিয়া ঘটায় বলে মনে হয়। সম্ভবত আপনি এমন লোক দেখে থাকবেন, ডিম খেলে প্রতিবারই যার ত্বকে চুলকানি দেখা দেয়। খাদ্যের কোন কোন দ্রব্য কতকগুলি লোকের 'অ্যালার্জি' ঘটাতে পারে। কোন ব্যক্তি একটি বস্তু সম্বন্ধে স্পর্শকাতর (sensitive) হলে যে গোলযোগ উৎপন্ন হয়, তারই বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয় অ্যালার্জি। কোন কোন ব্যক্তির পরাগরেণুতে অ্যালার্জি, ত্বকের সংস্পর্শে কিছু বস্তু এলে অন্য কারও তার প্রতি অ্যালার্জি। ঔষধের প্রতি অ্যালার্জিও সাধারণ ঘটনা। বস্তুত পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়ার আগে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে নেন, রোগীর তার প্রতি অ্যালার্জি আছে কিনা। যেসব খাদ্য অ্যালার্জি উৎপন্ন করে, সেগুলি হল মাছ, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। যে বস্তুগুলিতে অ্যালার্জি হয়, সেগুলি প্রকৃতিতে সাধারণত প্রোটিন।

খাদ্যঘটিত অ্যালার্জি ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা একজিমা, হাঁপানি, বারে বারে হাঁচি, একপেশে মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন, বমি, উদরাময় প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পায়।

২১.৯ খাদ্যে ভেজাল

আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে কখনও কখনও খাদ্য এবং ঔষধেও এমন অন্যান্য জিনিস মিশিয়ে ভেজাল অবস্থায় বিক্রয় করা হয়, যেগুলি খাদ্যও নয়, ওষধও নয়। যেমন, বিশুদ্ধ ঘি-কে ডালডা দিয়ে ভেজাল করা যেতে পারে অথবা রান্নার তেলের সঙ্গে সস্তা তেল বা খনিজ তেল মেশানো হতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে এগুলিকে সুবাহিত করাও হয়। ডালে কাঁকর মিশিয়ে বিক্রয় করা যায় এবং আটায় খড়িগুঁড়ো থাকতে পারে। গুঁড়ো মসলা, চা ও কফিতেও অনুরূপভাবে ভেজাল দেওয়া হয়। সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ হল দুধে জল মিশিয়ে ভেজাল দেওয়া—কখনও নোংরা জল! এগুলি সবই ব্যবসায়ীরা অধিকতর মুনাফা লাভের জন্য করে থাকে। লোভের বশে তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে এই কাজগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরিষার তেলে শেয়াল কাঁটার তেলের ভেজাল পক্ষাঘাত ঘটায়। খেসারি ডাল ল্যাথিরিজম্ ঘটায়, যে পঙ্গুত্বদায়ক রোগের বৈশিষ্ট্য হল পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত। ছোলার ডালে এই খেসারির ডাল মেশানো হয়। হলুদে প্রায়ই মেটানিল ইয়েলো নামে একটি বিষাক্ত বস্তু ভেজাল দেওয়া হয়, যা ক্যানসার ঘটাতে পারে।

খাদ্য সম্বন্ধে এজেন্সিগুলিও উৎপাদিত খাদ্য সম্বন্ধে মিথ্যা দাবি করে মানুষের বিভ্রান্তি ঘটায়। এমন প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরারও প্রয়োজন। এমন কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য কী করা যায়? সরকারের উচিত খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বিরুদ্ধে কঠোর আইন বলবৎ করা এবং দোষীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ শাস্তি দেওয়া। উপভোক্তারাও উপভোক্তা কল্যাণ সমিতি গঠন করতে পারেন এবং তার মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ প্রকাশ করতে এবং এমন কাজকর্মের বিরুদ্ধে জনমতের চাপ সৃষ্টি করতেও পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সমিতিগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা বাজারে বিভিন্ন পণ্যের ওপরে কড়া নজর রাখে।

২১.১০ অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য

২১.৬ পরিচ্ছেদে আমরা সুষম খাদ্য সম্বন্ধে জেনেছি। এবারে আমরা অপ্রতুল পুষ্টির ফলে উৎপন্ন স্বাস্থ্যসমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দেব।

অপুষ্টি শব্দদুটির সঙ্গে আপনারা কি পরিচিত? অপুষ্টির অর্থ হয় যথেষ্ট খাদ্যের অভাব না হয় খাদ্যে পৌষ্টিক উপাদানগুলির অসাম্য এবং তার ফলে স্বাস্থ্যহানি। ভারত এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য বিকাশশীল রাষ্ট্রে প্রোটিন-ক্যালোরির অভাব ও তজ্জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব আছে।

ভারতে অপুষ্টির কারণগুলি কী?

কতকগুলি কারণ হল :

(১) দারিদ্র্য

(২) বিশাল জনসংখ্যা

(৩) খাদ্যের অপ্রতুল উৎপাদন ও অসম বণ্টনব্যবস্থা।

আপনারা কি এই তালিকায় আরও কিছু যোগ করতে পারেন?

বলতে গেলে অপুষ্টিতে শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা এবং ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসেরও অবদান আছে।

আপনারা জানেন, এই গ্রন্থে জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য অসমানভাবে বিস্তৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রুশদেশ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রাচুর্যের দেশগুলিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশগুলির অপেক্ষা জনসংখ্যা কম এবং জীবনযাত্রার মান উন্নততর। শেষোক্ত দেশগুলিতে বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বাস করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নতর। বিশ্বের নিম্নপুষ্টিমানের মানুষদের আনুমানিক তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয় উপমহাদেসে বাস করে।

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। হিসাব থেকে অনুমান যে এই জনসংখ্যা বর্তমানে বেড়ে একশো কোটি অতিক্রম করে গেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা খাদ্যের মোট চাহিদা বাড়ায়। যোজনা আয়োগ হিসাব করেছেন যে ১৯৭৭-৭৮ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার আটচল্লিশ শতাংশ এবং নাগরিক জনসংখ্যার একচল্লিশ শতাংশ দরিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, অর্থাৎ তারা যথাযথ ক্যালোরিমূল্যের সুষম খাদ্য পেতে সক্ষম ছিল না। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশে পুষ্টির অপ্রতুলতা আছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নীচের জনসংখ্যা প্রায় ঊনচল্লিশ শতাংশে নেমেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই নারী, পুরুষ ও শিশু নিয়ে এমন ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা একেবারে তিরিশ কোটিতে পৌঁছেছে। আমাদের খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু খাদ্যের প্রকৃত প্রাপ্তি নির্ভর করে ক্রয়ক্ষমতার ওপরে; এর অর্থ হল, যথাযথ আহার ক্রয়ের মতো অর্থ লোকের থাকা উচিত, যার আবার মানে হল অধিকতর কর্মসংস্থান ও উন্নততর বেতন। এটি এক পর্বতপ্রমাণ সমস্যা এবং এর জন্য প্রয়োজন দেশের প্রভূত অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

সামাজিক স্তরে আমাদের খাদ্য অপচয় করা অনুচিত। প্রায়ই দেখি, ধনী-দরিদ্র যে-কোনো লোকের বিশাল উৎসব সমাবেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ফেলে দেওয়া হয়। প্রোটিন বা ক্যালোরির আকারে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য আহার করাও আমাদের পরিহার করা উচিত।

ভারতে অপুষ্টির সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যাক। খাদ্যের অপ্রতুলতা পুষ্টির অভাব ঘটায় এবং আহারে এক বা একাধিক পৌষ্টিক উপাদানের পরিমাণ হ্রাস করে। এর পলে অস্বাস্থ্য, অধিকতর রোগপ্রবণতা এবং আয়ুক্ষয় ঘটে থাকে। অস্বাস্থ্য ও রোগের চিকিৎসায় ব্যয়িত অর্থ সম্ভবত পুষ্টির উন্নতিসাধন করে রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারত।

প্রোটিন-ক্যালোরির অপুষ্টিজনিত রোগ :

বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলি বর্তমানে প্রোটিন-ক্যালোরির অপুষ্টিজনিত রোগগুলির সম্মুখীন হয়েছে। সর্বাধিক কবলিত গোষ্ঠীতে আছে দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণির ছোটো শিশু ও বালক-বালিকা—আমাদের জনসংখ্যার এরা একটি বড়ো অংশ। প্রোটিন ও প্রোটিন-ক্যালোরির অভাবজনিত দুটি কঠিন রোগ হল যথাক্রমে কোয়াশিয়র্‌কর্‌ ও ম্যারাসমস্‌। প্রতি বছরে এ দুটি রোগে লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয় এবং আরও লক্ষ লক্ষ শিশু শোচনীয় জীবন কাটায়। এই রোগগুলি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির মন্দন ঘটায় এবং বিভিন্ন সংক্রমণের বিরুদ্ধে তার স্বাভাবিক অনাক্রম্যতাকে (immunity) দুর্বল করে। চরম ক্ষেত্রগুলিতে শিশুরা মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ হয়, কখনও সুপরিণত হয় না এবং সেকারণে পরিবার ও জাতির পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কোয়াশিয়র্‌কর্‌ :

১৯৩৫ সালে এই রোগটি প্রথম আফ্রিকার শিশুদের মধ্যে ধরা পড়ে এবং আফ্রিকার একটি আঞ্চলিক ভাষায় এমন দুটি শব্দ থেকে এর নামকরণ হয় যেগুলির অর্থ হল প্রথম ও দ্বিতীয়, অর্থাৎ যথাসময়ের পূর্বেই দ্বিতীয় সন্তানের দ্বারা মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রথম সন্তান যে রোগে আক্রান্ত হয়।

মাতৃস্তন্য ছাড়ার সময়ে শিশুদের ওজন কমে কেন?

মাতৃস্তন্য ছাড়ার পরে দৈহিক ওজনের অনুপাতে প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় শিশুর দ্বিগুণেরও অধিক প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। মায়ের পুষ্টির মান যেমনই হোক না কেন, শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত স্তনদুগ্ধ গুণে ও পরিমাণে যথেষ্ট পুষ্টি সরবরাহ করে এবং এটি সংক্রমণ থেকে মুক্ত। যথাযথ বৃদ্ধির জন্য ছয়মাস বয়সের পরে শিশুদের পরিপূরক খাদ্য লাগে, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে তা পাওয়া যায় না :

(১) দ্বিতীয় শিশুটি জন্মে থাকলে বর্ধিত আর্থিক ভার।

(২) পুরুষেরা অন্নসংস্থান করেন এই ধারণায় সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য অজ্ঞতাবশত সাধারণভাবে তাঁদেরই দেওয়া হয়; যা অবশিষ্ট থাকে, শিশু ও মহিলারা সেটিই আহার করেন।

(৩) শিশুরা স্তনদুগ্ধ পছন্দ করে, স্বাদ সম্বন্ধে তারা খুঁতখুঁত এবং খাদ্যে নতুন বস্তু অন্তর্ভুক্ত করলে তারা তা খেতে অস্বীকার করেন।

(৪) যেহেতু অধিকাংশ ভারতীয় কেবল নিরামিষ খাদ্যেরই ব্যবস্থা করতে পারে, তাই প্রভূত পরিমাণে খাদ্য আহার না করলে শিশুকে যথেষ্ট প্রোটিন দেওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন।

খাদ্যে শক্তির ও প্রোটিন আহারের স্বল্পতার ফলে শিশু ক্রমশ ক্ষুধা হারিয়ে ফেলে এবং মাতৃদুগ্ধ ছাড়ার সময়ে প্রায়ই উদরাময়ে আক্রান্ত হয়। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে দাঁত ওঠার জন্যই উদরাময় হয়। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বস্তুত দাঁত ওঠার সময়ে উদরাময় হয় সংক্রমণের জন্য। মাড়িতে অনুভূতির জন্য তারা কঠিন জিনিস চিবোতে চায় এবং মেঝের ওপরে পড়ে থাকা যে-কোনো জিনিসই তুলে মুখে দেয়। এভাবে ধুলোময়লা থেকে অথবা অধৌত সবজি, ফল ইত্যাদি চিবানোর ফলে তারা সংক্রামিত হয়। এই ঘটনা মাকে প্রায়ই ভুল পথে চালিত করে এবং তিনি পথ্যকে মুখ্যত কার্বোহাইড্রেট-প্রধান মণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখেন। ফলে শিশু একান্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

চিত্র ২১.৯ : ম্যারাস্‌মস্ : ক্যালোরি ও প্রোটিনের অভাবে পেশির গুরুতর ক্ষয় এবং ত্বকের নীচে চর্বির অবলুপ্তি। শিশুকে জীবন্ত কঙ্কালের মত দেখায়।

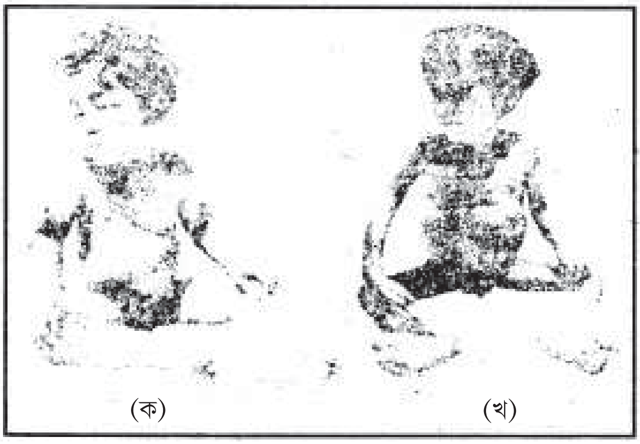

চিত্র ২১.১০ : কোয়াশিয়র্‌কর্ : (ক) প্রোটিনের গুরুতর অভাবের বৈশিষ্ট্য রূপে জালার মতো উদর ও শোথ দেখা দেয়। (খ) অধিক পরিমাণে প্রোটিন খাওয়ালে শোথ দূর হয় কিন্তু অন্তর্নিহিত অপুষ্টি প্রকট হয়ে ওঠে।

ম্যারাস্‌মস্ :

খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালোরি উভয়েরই গুরুতর অভাবে এই রোগ হয়। প্রাক্-বিদ্যালয় (১ থেকে ৫ বছর) শিশুদের ওপরে সমীক্ষাগুলিতে দেখা যায়, নিম্নবিত্ত বর্গের শিশুদের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরি

পায় না। কাজেই এমন শিশুরা ম্যারাস্‌মসের শিকার হয়। বৃদ্ধির মন্দন এবং পেশি ও ত্বকের নীচে চর্বির ক্ষয়ের আকারে এটি প্রকট হয়।

লৌহ ও ভিটামিন এ-র অভাবে যথাক্রমে রক্তাল্পতা ও চোখের ক্ষত উৎপন্ন হয়। প্রধানত নিম্নবিত্ত বর্গগুলি মধ্যে অপরাপর ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের অভাবজনিত অন্যান্য রোগও প্রবল। মানুষের কাছে কোন কোন খাদ্য সহজলভ্য করে রোগগুলির মধ্যে কতকগুলিকে নিরাময় করা যায়। ২১.৯ থেকে ২১.১৩ চিত্রগুলিতে রোগগুলির মধ্যে কয়েকটি অভাবজনিত লক্ষণগুলি দেখানো হয়েছে।

চিত্র ২১.১১ : **রিকেট্‌স্‌** : ভিটামিন ডি-এর অভাবে বালক-বালিকার রিকেট্‌স্‌ হয়। দুর্বল হয়ে যাওয়া অস্থিগুলি পাশের দিকে বেঁকে যায়। প্রথম জীবনে অস্থিগুলির এসব গঠন বিকৃতি সারা জীবন থেকে যায়।

চিত্র ২১.১২ : **পেলাগ্রা** : ভিটামিন বি$_{৩}$-এর অভাবে পেলাগ্রা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ত্বকের বিশেষ ধরনের পুরুত্ব ও দাগপড়া।

চিত্র ২১.১৩ : **গলগণ্ড** : আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ঘটায়। রাজস্থান ও হিমালয় অঞ্চলে রোগটি প্রায়ই হয়ে থাকে।

উপসংহারে তাই আমরা বলতে পারি, অপুষ্টি সমস্যাকে দমন করতে হলে আমাদের বিশাল জনসংখ্যার শক্তি বা ক্যালোরির মৌল প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য আমাদের দেশে উৎপাদন ও বণ্টন করা আবশ্যক। একবার এই প্রয়োজন পূরিত হলে খাদ্যের গুণের উৎকর্ষের জন্য তাতে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য সম্পূরণের উপায় নির্ণয় করা যায়।

২১.১১ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি যে প্রধানত খাদ্যের পৌষ্টিক গুণ ব্যক্তির স্বাস্থ্য নির্ধারণ করে। জীবনের বিভিন্ন দশায় আমাদের কী ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন, সে বিষয়ে আপনাদের তথ্য সরবরাহ করেছি। খাদ্যের অপ্রতুলতা ও অসম বণ্টনের ফলে আমাদের জনগণের অধিকাংশের শক্তির চাহিদা পূরণ হয় না। আমাদের দেশে অপুষ্টির সমস্যা রয়েছে এবং গুরুতর অভাবজনিত রোগগুলি প্রবল। কাজেই আপনারা শিখেছেন :

- খাদ্যে ছয় শ্রেণির পৌষ্টিক বর্তমান : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও জল।

- যে খাদ্য আমরা আহার করি, তার একটি বিশাল অংশ আমাদের শক্তি জোগায়। আমাদের দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই শক্তি ব্যবহৃত হয়। আমাদের ভুক্ত খাদ্যের একটি ক্ষুদ্র অথচ অপরিহার্য অংশ হল ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য। এই অংশটি আমাদের দেহের ক্রিয়া-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে এবং সংক্রমণ থেকে আমাদের দেহের সুরক্ষায় সাহায্য করে।
- যেসব খাদ্যবস্তুতে একই প্রকারের পৌষ্টিক উপাদান বর্তমান, সেগুলিকে একটি খাদ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেহে তারা যে ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে, তদনুযায়ী আবার পৌষ্টিক উপাদানগুলিকে শক্তিদায়ী খাদ্য (অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট), দেহগঠনকারী খাদ্য (অর্থাৎ প্রোটিন) এবং রক্ষাকারী খাদ্য (অর্থাৎ ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য), এভাবেও শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়।
- খাদ্যের শক্তিমূল ক্যালোরিতে প্রকাশ করা হয়। ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা বয়স, লিঙ্গ, কাজের প্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতির ওপরে নির্ভর করে।
- ভেজাল খাদ্য এবং কখনও কখনও সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তা ছাড়া কিছু লোকের কোন কোন প্রোটিন খাদ্যে অ্যালার্জি থাকতে পারে।
- প্রোটিন-ক্যালোরির অপুষ্টিজনিত কোয়াশিয়র্‌কর্‌ ও ম্যারাস্‌মসের মতো রোগগুলিতে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশু ভোগে।

২১.১২ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১. নীচে তালিকাবদ্ধ খাদ্যবস্তুগুলির পৌষ্টিক উপাদানের নাম লিখুন :

খাদ্যবস্তু	পৌষ্টিক উপাদান
(ক) ছোলা ভাজা	
(খ) চীনাবাদাম	
(গ) বিস্কুট	
(ঘ) ডিমসিদ্ধ	
(ঙ) পাউরুটির পকোড়া	
(চ) কমলালেবু	
(ছ) ক্যাম্‌পাকোলা	
(জ) আলুভাজা	

২. গড় প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলির লোকেদের জন্য আপনি কী বা কোন কোন প্রকারের অতিরিক্ত খাদ্য সুপারিশ করবেন?

লোকেদের শ্রেণি	খাদ্যের প্রকৃতি
(ক) খেলোয়াড়	দেহগঠনকারী খাদ্য, শক্তিশালী খাদ্য
(খ) মজুর	....
(গ) গর্ভবতী মা	....
(ঘ) শিশু	....
(ঙ) বালক-বালিকা	....

৩. বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত একই ওজনের লোকেদের শক্তির চাহিদা উর্ধ্বগামীক্রমে সাজান। সাইকেল চালনা, কুলির কাজ, কাপড় কাচা, টাইপ করা।

৪. আমরা প্রথম স্তম্ভে কয়েকটি রোগের তালিকা দিয়েছি, প্রাসঙ্গিক অভাবগুলি দ্বিতীয় স্তম্ভে লিখুন।

রোগ	অভাব
(ক) রাত্র্যান্ধতা	
(খ) গলগণ্ড	
(গ) কোয়াশিয়র্কর্	
(ঘ) ম্যারাস্মস্	
(ঙ) রিকেট্স্	
(চ) রক্তাল্পতা	

২১.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী

২. দেহগঠনকারী খাদ্য—দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, মাংস, মাছ, ডাল, সয়াবিন প্রভৃতি।
শক্তিদায়ী খাদ্য—দানাশস্য, জোয়ার-বাজরা, তেল-ঘি, চিনি, মধু, গুড়, আলু।
রক্ষাকারী খাদ্য—সবুজ শাকসবজি, ঘনহলুদ সবজি, ফল ইত্যাদি।

৩. (ক) (১) অপরিহার্য পৌষ্টিক উপাদান (২) অপরিহার্য, অভাব (৩) সয়াবিন, প্রোটিন (৪) দুধ, মাছ, ডিম এবং মাংস, অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (৫) শক্তি, ফ্যাট (৬) কার্বোহাইড্রেট (৭) দানাশস্য, জোয়ার-বাজরা, ডাল।
(খ) (ক) ৭ (খ) ৫ (গ) ৩ (ঘ) ৬ (ঙ) ১ (চ) ৪ (ছ) ২ (জ) ৮

৪. (ক) (১) ৪৫ গ্রাম (২) অধিক শক্তি, বেশি প্রোটিন (৩) বেশি (৪) অত্যধিক ক্যালোরি আহার।
(খ) ৮১২ কিলোক্যালোরি।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১. (ক) কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন (খ) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন (গ) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট (ঘ) প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন (ঙ) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট (চ) ভিটামিন সি (ছ) কার্বোহাইড্রেট (জ) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট।

২. (ক) শক্তিদায়ী খাদ্য (খ) দেহগঠনকারী খাদ্য, রক্ষাকারী খাদ্য, ক্যালশিয়াম ও লৌহ (গ) দেহগঠনকারী খাদ্য, ক্যালসিয়াম (ঘ) দেহগঠনকারী খাদ্য, শক্তিদায়ী খাদ্য, ক্যালশিয়াম।

৩. টাইপ করা < কাপড় কাচা < সাইকেল চালনা < কুলির কাজ।

৪. (ক) ভিটামিন এ (খ) আয়োডিন (গ) প্রোটিন (ঘ) প্রোটিন-ক্যালোরি (ঙ) ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি (চ) লৌহ।

একক ২২ □ স্বাস্থ্য ও রোগ

গঠন

২২.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

২২.২ সুস্বাস্থ্য কী?

২২.৩ রোগ

২২.৩.১ রোগের প্রকারভেদ

২২.৪ সংক্রামক রোগ

২২.৪.১ জীবাণুর আবিষ্কার

২২.৪.২ জীবাণু সর্বত্র বর্তমান

২২.৪.৩ জীবাণু কীভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে?

২২.৪.৪ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের সংগ্রাম

২২.৫ রোগের বিস্তার বা সংক্রমণ

২২.৬ রোগের প্রতিষেধ

২২.৬.১ প্রাচীনকালে রোগ-প্রতিষেধ

২২.৬.২ প্রতিষেধক চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

২২.৬.৩ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

২২.৭ ভারতে স্বাস্থ্য-পরিসেবা

২২.৮ সারাংশ

২২.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

২২.১০ উত্তরমালা

২২.১ প্রস্তাবনা

খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী এককটিতে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষায় সুষম খাদ্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনারা আরও জেনেছেন যে অপুষ্টির কারণে আমাদের অধিকাংশ জনগণ বহু অভাবজনিত রোগে ভোগেন।

বর্তমান এককে আমরা আলোচনা করব, কীভাবে নির্মল পানীয় জলের অভাব, বাসস্থানের অনুপযোগী অবস্থা, পরিবেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার (sanitation) দৈন্য, স্বাস্থ্যশিক্ষার অভাব প্রভৃতির ফলে রোগ হয়। এই বিষয়গুলি কেবল ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যকে নয়, অধিকন্তু সমগ্র জনসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করতে পারে। মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে জটিল মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফলে রোগ হয়। ওপরন্তু যেসব দৈহিক ও মানসিক পীড়ন (stress) আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভূত প্রভাবিত করে, সেগুলিও আমাদের জীবনের পরিবেশের দ্বারাই নিরূপিত হয়।

যথোপযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ-প্রতিষেদ করা যায় এবং রোগের প্রতিষেধ (prevention) তার চিকিৎসার চেয়ে অনেক কম ব্যয়সাধ্য—বিশেষত যখন এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িত থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যশিক্ষার বিনিশ্চায়ক গুরুত্ব আছে।

সংক্রামক রোগগুলির কারণ এবং কীভাবে তারা সঞ্চারিত হয়, সে বিষয়ে এই এককটির প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব। কারণগুলি এখন আর কোন রহস্য নয়। সংক্রামক রোগ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবগুলির কারণে ঘটে থাকে। সেগুলির আবিষ্কার, দেহে প্রবেশের পদ্ধতি এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্যে তাদের দ্রুত বিস্তারের উপায় সম্বন্ধে আপনারা জানবেন। আপনারা আরও শিখবেন যে এগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের দেহের একটি বিশদ সুরক্ষাতন্ত্র আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই রোগগুলির প্রতিষেধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি আমরা আলোচনা করব।

সবশেষে ভারতে স্বাস্থ্য-পরিসেবার রীতির সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবেন। আমাদের সমাজের জন্য স্বনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তনে আমরা কেন ব্যর্থ হয়েছি, সেবিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে আপনারা সমর্থ হবেন :

- সুস্বাস্থ্য কী, তা বুঝতে,
- সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের মধ্যে প্রভেদ করতে,
- রোগের কারণ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস ও বদ্ধমূল সংস্কারগুলি যে প্রায় ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিক, তা উপলব্ধি করতে,
- রোগদায়ক জীবগুলির আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে,
- কীভাবে রোগদায়ক জীবগুলি আমাদের দেহকে আক্রমণ করে এবং একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে, তা বুঝতে,
- রোগদায়ক জীবগুলির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য আমাদের দেহের যে সুরক্ষাতন্ত্র আছে, সে সম্বন্ধে শিখতে,
- সংক্রামক রোগ-প্রতিষেধের জন্য কেন বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিষ্কার খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস এবং পরিবেশীয় স্বাস্থ্যবিধানের (sanitation) প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করতে,
- গ্রামীণ ভারতে স্বাস্থ্যসেবার ত্রুটিগুলির কারণ আলোচনা করতে।

২২.২ সুস্বাস্থ্য কী?

দীর্ঘ জীবন বাঁচতে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা আছে। দীর্ঘকাল বাঁচা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভালোভাবে বাঁচা তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য আমাদের জীবনের মহত্তম সম্পদ, তাই আমাদের সকলকে অবশ্যই তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞা দিয়েছে : "সম্পূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার অবস্থা—কেবল রোগ বা দুর্বলতার অভাব নয়।" কাজেই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক, স্বাস্থ্যের এই তিনটি উপাদান আছে। তিনটি দিক দিয়েই যে ব্যক্তি সক্ষম, সে সুস্বাস্থ্যের অবস্থায় রয়েছে এমন বলা হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে একটি অনুরূপ সংজ্ঞা আছে। বিশদ করে বলতে পারি, এটি এমন এক অবস্থা যাতে কোন ব্যক্তি যে-কোনো সামাজিক ও ভৌত পরিবেশে তার সকল বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভীয় ও দৈহিক সম্পদকে ব্যবহার করতে সক্ষম। আমরা আরও বলতে পারি যে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির উচিত তার শারীরিক ও মানসিক সম্পদগুলিকে সর্বাধিক সম্ভব কাজে লাগানো, তা সেগুলি যত বিরাট বা ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

সর্বপ্রথম কথা হল, স্বাস্থ্যের সঙ্গে দেহের সকল অঙ্গের যথাযথ কাজকর্ম জড়িত, কারণ অসুস্থ শরীর সর্বদাই তার নিজের মানসিক পীড়ন সৃষ্টি করবে। মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের পরস্পর সম্পর্ক আছে। আপনার সম্ভবত অভিজ্ঞতা আছে যে বিচলিত বা বিষণ্ণ হলে আপনার দেহ জড়তাগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরেও কোন ব্যক্তির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কী ভাবে জানি যে আমরা মানসিকভাবে সুস্থ?

মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) তিনি অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত,

(খ) তিনি অন্যদের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে চলেন এবং সন্তোষজনক ও স্থায়ী সম্পর্কে গড়তে পারেন,

(গ) তাঁর নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ আছে এবং তিনি দায়িত্ব নিতে পারেন,

(ঘ) তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী সাফল্যে তিনি সন্তোষ ও সুখ পেতে পারেন।

এই এককটিতে ভালো স্বাস্থ্য রাখার সূত্রগুলি লিখে ফেলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তার পরিবর্তে, পরিবেশীয় বিষয়গুলি কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এবং রোগবিস্তারে সহায়তা করে, সে বিষয়েই আমরা মনোনিবেশ করব। রোগ বলতে আমরা কী বুঝি, তার আলোচনার আগে নীচের অনুশীলনীটির উত্তরের প্রয়াস করা যাক।

অনুশীলনী ১

যথাযথ শব্দ দিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) একটি .... ব্যক্তির দেহের সকল অঙ্গই .... ভাবে কাজ করে।

(খ) যে সামাজিক ও ভৌত পরিবেশে সে বাস করে, তার মধ্যে একটি স্বাস্থ্যবান লোক তার .... ও দৈহিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগাতে পারে।

২২.৩ রোগ

আমরা সবাই কোন না কোন সময়ে জ্বর, ব্যথাবেদনা, বমনেচ্ছা, বমি, উদরাময়, ফ্লু, সর্দি, সাধারণ দৌর্বল্য ইত্যাদিতে ভুগেছি। আমাদের দেহরূপী যন্ত্রের কোন অংশের ব্যর্থতা, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত কোন প্রবণতা বা ক্রিয়াবৈকল্য অথবা বার্ধক্য বা কোন সংক্রমণের জন্য সমস্যার মতো কতকগুলি কারণে অসুস্থতার উৎপত্তি হয়। আগের এককগুলিতে শিখেছেন যে পুষ্টির কোন অপ্রতুলতা বা অভাব থেকেও রোগের উদ্ভব হতে পারে।

ক্যানসার, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর রোগের নামের সঙ্গে আপনারা পরিচিত থাকতে পারেন। মারাত্মক ব্যাধিগুলিতে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন হল এড্‌স্ (AIDS), যে রোগে দেহ ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করার সকল স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে ফেলে।

আমরা বলতে পারি, রোগ হল সুস্থ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি। দেহের কোন কলা (tissue) বা অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন বা ক্রিয়ায় যে-কোনো পরিবর্তনের অর্থ হতে পারে রোগ। কোন ব্যক্তি রোগে ভুগছেন কিনা, তা নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকদের নানা পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আছে। এগুলি হল :

(ক) দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা, হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি শোনা অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলন পর্যবেক্ষণের মতো দৈহিক পরীক্ষা,

(খ) দেহের কলা ও রসগুলি নিয়ে প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষা, যথা—মূত্রে শর্করা বা রক্তে অত্যধিক ফ্যাট আছে কিনা, তার পরীক্ষা,

(গ) দেহরস এবং/অথবা রেচিত দ্রব্যের (excreta) আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা—সুপরিচিত উদাহরণ হল রক্ত ও মলের পরীক্ষা,

(ঘ) অস্থির ভগ্নাবস্থা নির্ণয় অথবা ফুসফুসের অবস্থা পরীক্ষার জন্য এক্স-রশ্মির (X-ray) মতো জীবভৌত (biophysical) পদ্ধতির ব্যবহার,

(ঙ) দেহমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের অবস্থান নিরূপণে শল্যবিদ্যা ও অন্যান্য পদ্ধতি।

২২.৩.১ রোগের প্রকারভেদ

ওপরে ইঙ্গিত করেছি, কতকগুলি রোগ আছে যেগুলি নিয়ে কোন লোক জন্মাতে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, জন্মের সময়েই শিশুর হৃৎপিণ্ডে ত্রুটি থাকতে পারে। আবার কতকগুলি রোগ হয় মা-বাবা অথবা তাঁদের মাতাপিতার সেই রোগটি থাকার দরুন; যেমন—হিমোফিলিয়া, যে রোগে সামান্য কাটা থেকে তীব্র রক্তপাতের প্রবণতা থাকে। এসব রোগকে 'জন্মগত' (congenital) রোগ বলে। প্রশিক্ষণবিহীন পরিসেবকদের হাতে পড়ে শিশুদের জন্মের সময়ে কতকগুলি দৈহিক বিকলতা ঘটে থাকে। তা ছাড়া এমন সব রোগও আছে যেগুলিকে মোটামুটি এভাবে ভাগ করা যায় :

- সঞ্চারণক্ষম (communicable) বা সংক্রামক, অর্থাৎ যে রোগগুলি নানাভাবে একজন থেকে অন্যজনে বাহিত হয়, এবং
- অসংক্রামক।

সংক্রামক রোগগুলি জীবাণু ও কৃমির (worm) দ্বারা উৎপন্ন হয়; কলেরা, পানবসন্ত (chicken pox), যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হল এর উদাহরণ।

অসংক্রামক রোগগুলি বাইরের সংক্রমণের জন্য হয় না এবং সেজন্য একজন থেকে অন্যজনে ছড়াতে পারে না; যথা—অ্যানিমিয়া, ডায়াবিটিস, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি। সারণি ২২.১-এ কতকগুলি সাধারণ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২২.১ : সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ

সংক্রামক রোগ	**অসংক্রামক রোগ**
সাধারণ সর্দিকাশি	ডায়াবিটিস
ম্যালেরিয়া	ক্যানসার
কলেরা	হাঁপানি
যক্ষ্মা	আরথ্রাইটিস
চিকেন পক্স্	হিস্টিরিয়া
প্লেগ	কোয়াশিয়র্কর্
চোখ ওঠা (conjunctivitis)	ম্যারাস্মস্
হাম	স্কার্ভি
মাম্প্স্	মেদবাহুল্য
পোলিও	হিমোফিলিয়া
ট্র্যাকোমা	
কুষ্ঠ	
উদরাময়	
কৃমি	
এড্স্	

এই এককটিতে আমরা কেবল সংক্রামক রোগ নিয়েই আলোচনা করব। এগুলির নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষেধ (prevention) সর্বদাই জনসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের প্রধান সমস্যা হয়ে রয়েছে। প্রতিষেধ না করলে এগুলি কখনও কখনও বিশাল অঞ্চল জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা বলি, ‘মহামারি’ হয়েছে। কীভাবে এগুলি ছড়ায়, তা জনা থাকায় এই রোগগুলির অধিকাংশকে প্রতিষেধ করা যায়। এই ব্যাধিগুলির প্রতিষেধে বহু সামাজিক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রয়োজন হয়, যথা—(ক) নির্মল পানীয় জলের সরবরাহ, (খ) ফলপ্রসূভাবে ময়লা নিষ্কাশন, (গ) উপযুক্ত আবাসন, (ঘ) বিশুদ্ধ খাদ্য, (ঙ) দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (চ) যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা, (ছ) ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি। জনসম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্যক্তিগত তথা সমবেত প্রয়াসের ওপরে এই ব্যবস্থাগুলির সাফল্য বিরাটভাবে নির্ভর করে। প্রায় দেড়শো

বছর আগে এই রোগগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের মতো দেশ ও অঞ্চলেও অত্যন্ত তীব্র ছিল। কিন্তু এখন তারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। অবশ্য যতদিন বিশ্বের যে-কোনো অংশে সংক্রামক রোগগুলির অস্তিত্ব আছে, সেখান থেকে সেগুলি রোগমুক্ত দেশেও পৌঁছাতে পারে। এজন্যই ভূমণ্ডল থেকে এগুলিকে নির্মূল করার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যগ্রতা রয়েছে।

এককের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা সংক্রামক ব্যাধিগুলি এবং তাদের বিস্তারের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আপনাদের প্রাথমিক ধারণা দেব। সংক্রামক রোগের কারণ হিসাবে জীবাণুর আবিষ্কার দিয়ে আমরা শুরু করব এবং কীভাবে তারা আমাদের দেহকে আক্রমণ করে, কীভাবেই বা আমাদের দেহ তাদের সঙ্গে যুক্ত করে, সে বিষয়ে শিখব। এই জ্ঞান থেকে এরকম রোগগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য আবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রতিষেধক (preventive) ব্যবস্থা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

অনুশীলনী ২

(ক) নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা, প্রদত্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে সত্যের ক্ষেত্রে 'স' এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে 'মি' লিখে তার ইঙ্গিত করুন।

(১) জন্ম থেকে বিদ্যমান রোগগুলিকে সংক্রামক রোগ বলে। ☐

(২) সংক্রামক রোগগুলি দ্রুত একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায়। ☐

(৩) রোগ না থাকা ভালো স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। ☐

(ক) আপনার পরিচিত পাঁচটি রোগের নাম লিখুন। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ হিসাবে সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করুন।

সংক্রামক ....

অসংক্রামক ....

২২.৪ সংক্রামক রোগ

উপমক্ষিকা (flea) এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্ষরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কুখ্যাত বিউবোনিক প্লেগ নামে রক্তের একটি মারক রোগের সম্বন্ধে আপনারা কেউ কেউ শুনে থাকতে পারেন। ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশে মহামারি আকারে এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ১৮৯৬ সালে ভারতে বড়ো আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এটি পনেরো বছর স্থায়ী হয়। রোগটি বহু গ্রাম ও শহরে বিস্তারলাভ করে এবং আশি লক্ষেরও বেশি লোকের মৃত্যু ঘটায়। মনে হয়, এরকম রোগ প্রাচীনকালে প্রায়ই হত। বর্ধিত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মানুষের তজ্জনিত যাতায়াত এগুলিকে সারা বিশ্বে নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। অনুরূপভাবে, বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও কলেরার মতো রোগগুলি সহজেই একজন থেকে অন্যজনে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব এবং অন্য অনেক ব্যাধিরও বিস্তারের কারণ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জানা ছিল না। এগুলির কারণ রহস্যাবৃত থাকায় এরকম রোগগুলি তখন পর্যন্ত লোককে আতঙ্কে অভিভূত করে দিত। অজ্ঞতাহেতু এই রোগগুলি ঘটানোর জন্য দৈত্যদানব ও দুষ্ট আত্মাদের দোষারোপ করা হত। ভারতে বিশ্বাস করা হত, এই রোগগুলি

রুষ্ট দেবতাদের দেওয়া শাস্তি। প্রত্যেক ব্যাধির জন্য একটি নতুন দেবীর সৃষ্টি করে তাঁকে এর জন্য দায়ী করা হত। যেমন, 'শীতলামাতা' বসন্তরোগ ঘটানো বলে মনে করা হয়। এই রোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য লোকে তাঁকে ভজনা করত। এখানে উল্লেখ করলে চিত্তাকর্ষক হবে যে একটি সুপরিকল্পিত বিশ্বব্যাপী টিকাদান কর্মসূচির ফলে এই গ্রহ থেকে বসন্তরোগ নির্মূল হয়েছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাবও আর ঘটে না।

"Ring-a-ring of roses
A pocket full of posies
Achoo! Achoo!
We all fall down"

ওপরের কবিতাটি শিশুরা খেলার সময়ে প্রায়ই গেয়ে থাকে—তিন শতাব্দী আগে অন্যদের রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য যে শহরবাসীরা নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইংল্যান্ডে এয়্যাম গ্রামের বাইরে এক স্মারক প্রার্থনা সমাবেশে গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। এই লোকগুলি প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগের বিস্তার বন্ধ করতে তাঁরা তাঁদের গ্রামের ভিতরে নিজেদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

এখানে "ring-a-ring of roses" (গোলাপের অঙ্গুরি) প্লেগরোগীর দেহে গোলাপাকৃতি ছাপগুলিকে বোঝাচ্ছে। "posies" হল দুষ্ট আত্মাকে বিতাড়নের জন্য ব্যবহৃত ছোটো ছোটো ফুল। আর "Achoo" মানে হাঁচি, যা রোগের সঙ্গী হয়ে আসত। শেষ ছত্রটির অর্থ, তারা সবাই মারা গেছে।

আপনাদের নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে পরিবারে কেউ যদি সর্দিকাশিতে ভুগতে থাকেন, আপনিও প্রায়ই তাতে আক্রান্ত হন। কেন, তা জানেন কী? কারণ, এই রোগগুলির কারণ হল 'জীবাণু' যা একজন থেকে অন্যজনে যেতে পারে। 'জীবাণু'-র অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব। তারা এত ছোটো যে আমরা তাদের খালি চোখে দেখতে পাই না। কতকগুলিকে দেখা যায় সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যে, কিন্তু অন্যেরা আরও ক্ষুদ্রতর বলে খুব বিশেষ ধরনের অণুবীক্ষণের নীচেই শুধু তাদের দেখা যায়। কতকগুলি সংক্রামক রোগ কৃমির (worm) জন্য ঘটে থাকে। এগুলি কীভাবে একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায়, আমরা তা-ও আলোচনা করব।

২২.৪.১ জীবাণুর আবিষ্কার

জীবাণুর আবিষ্কার এবং তারা যে সংক্রামক রোগের কারণ, সেই তথ্য বিজ্ঞানের মহৎ অগ্রগতিগুলির অন্যতম; এই আবিষ্কার নানা রোগ সম্বন্ধে বুঝতে এবং সেগুলিকে প্রতিষেধ ও নির্মূল করতে আমাদের সাহায্য করেছে। এর আগে কেউ অনুমান করেনি যে এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলি মানুষের জীবনে সর্বনাশ সৃষ্টি করতে পারে।

ওলন্দাজ অ্যান্টোনী ভ্যান লেভানহুক (চিত্র ২২.১) লেন্স নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রায় তিনশো বছর আগে ব্যাকটেরিয়া দেখেছিলেন। কৌতূহলবশত তিনি অগভীর হ্রদের জল, বৃষ্টিবারি, মানুষের মল এবং নিজের দাঁত থেকে চেঁছে নেওয়া বস্তু পরীক্ষা করে সেগুলিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের নাম দিয়েছিলেন animalcule বা অণুপ্রাণী। তারা লাট্টুর মতো ঘুরছিল কিংবা ডোবায় ছোটো মাছের মতো জলের ভিতর দিয়ে ছুটছিল। তিনি হতভম্ভ হয়ে পড়লেন এবং এদের উৎস ও ভূমিকা নিয়ে চিন্তামগ্ন হলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। ইংলন্ডের রানিও এলেন

এই অণুপ্রাণীগুলিকে দেখতে। ভ্যান লেভানহুকের অন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল, গরম কফি পানের অব্যবহিত পরে দাঁত থেকে চেঁচে নেওয়া বস্তুতে ছিল কেবল মৃত অণুপ্রাণী। তাঁর দৃষ্ট বিষয়গুলি অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আরও অনুসন্ধান করতে পারেননি, কারণ তিনি ছিলেন বড়ো সন্দেহপ্রবণ ও গোপন স্বভাবের লোক এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেই লেন্স তৈরি করতে শেখাননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্য একশ্রেণির জীবাণুও দেখা গেল; কিন্তু বিজ্ঞানীরা এগুলিকে প্রকৃতির নিছক কৌতুক বলে ধরে নিলেন, কারণ রোগের জন্য জীবাণুগুলিকে দোষারোপ করলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও বদ্ধমূল সংস্কারের ওপরে ভিত্তি করা শতাব্দী-প্রাচীন প্রথার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়।

চিত্র ২২.১ : অ্যান্টোনী ভ্যান লেভানহুক (Antonic Van Leeuwenhoek) (১৬৩৩-১৭২৩) লেন্সের সাহায্যে প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখতে পেয়ে লুকানো জীবাণুজগতের দ্বার খুলে দিলেন। পেশাদার বিজ্ঞানী না হলেও আলোকবিদ্যায় লিউয়েনহোয়েকের তীক্ষ্ণ আগ্রহ এবং তাঁর শ্রম তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

চিত্র ২২.২ : কীর্তিমান জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কখ্ (১৮৪৩-১৯১০) প্রথম প্রমাণ করেন যে প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াই রোগের কারণ। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে একটি বিশেষ রোগের জন্য একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া দায়ী।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর দেখালেন, যেখানে রোগের প্রকোপ রয়েছে সেখানকার বায়ু জীবাণুতে পূর্ণ, অথচ বায়ু যেখানে নির্মল সেখানে সাধারণত রোগ নেই। জীব যে আপনা-আপনি উদ্ভূত হয় না, তা দেখানোর জন্য পাস্তুর কর্তৃক সম্পাদিত পরীক্ষাটি সম্বন্ধে আপনার একক ১২-তে পড়েছেন। তিনি আরও প্রমাণ করেছিলেন যে, রোগের কারণ রোগজীবাণু। কয়েক বছর পরে জার্মানিতে রবার্ট কখ্ (চিত্র ২২.২) দেখালেন যে একটি বিশেষ প্রকারের ব্যাকটেরিয়া অ্যান্থ্রাক্সের জন্য, অন্য একটি যক্ষ্মার জন্য এবং তৃতীয় একটি প্লেগের জন্য দায়ী। এই চমকপ্রদ কাজটি বহু বিজ্ঞানীকে নানা রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াগুলিকে শনাক্ত ও পর্যালোচনা করতে প্রণোদিত করল। দেখা গেল, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকের দ্বারা বাহিত প্লাজমোডিয়াম নামে এককোশী প্রাণীটি (protozoa) ম্যালেরিয়ার কারণ। তাঁদের আবিষ্কারগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই রোগগুলির সম্ভাব্য নিরাময়ের পথে নিয়ে গেল। এভাবে রোগের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। ভেবে দেখার মূল্য আছে যে লেভানহুকের প্রথম আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল বলে তাকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে তার অনুসরণে কাজ করলে হয়ত লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো যেত।

ভাইরাস অন্য একশ্রেণির জীবাণু। সাধারণ কাশি, সর্দি এবং যে ভাইর‍্যাল জ্বর আজকাল বহু লোককে আক্রমণ করে, এগুলি ভাইরাসের কারণেই হয়ে থাকে। তারা ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর, সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত রহস্যই রয়ে গিয়েছিল। নিম্নশক্তির অণুবীক্ষণ দিয়ে ভাইরাসকে দেখা যায় না; অধিকতর শক্তিশালী অণুবীক্ষণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই শুধু তাদের দেখা গেল। ভাইরাসগুলি বিচিত্র বস্তু, কারণ তারা রাসায়নিক অণুর মতো আচরণ করে এবং পোষক (host) প্রাণীর জীবিত কোশের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। শর্করা বা লবণের মতো তাদের কেলাসিত করা যায়। কিন্তু পোষক কোশে প্রবেশ করে তারা জীবের মতো আচরণ করে এবং ব্যাকটেরিয়ার মতো বংশবৃদ্ধি করে জ্বর বা অন্যান্য রোগ ঘটায়।

শিল্পবিপ্লবের সময়ে এডউইন চাডউইক (১৮০০-১৮৯০) রোগ ও মন্দ স্বাস্থ্যব্যবস্থার (sanitary condition) মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে বহু রোগ জীবনযাপনের অবস্থাগুলির ওপরে নির্ভর করে—সমাজে মানুষ যে এসব রোগে ভোগে, তার কারণ এই নয় যে তারা পাপ করেছে এবং শাস্তি পাচ্ছে।

স্বাস্থ্যবিধানে (sanitation) আদি প্রবক্তা এডউইন চাডউইক ইংল্যান্ডে আইনজীবী ছিলেন। তিনি 1842 সালে শ্রমিক শ্রেণির স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন।

জীবাণুকে আমরা চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করি : (ক) ব্যাকটেরিয়া, (খ) ভাইরাস, (গ) এককোশী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া, (ঘ) ছত্রাক বা ফাংগাস। অণুবীক্ষণের তলায় বিভিন্ন জীবাণুর গঠন কেমন দেখায়, চিত্র ২২.৩-এ তা দেখানো হয়েছে। কোন রোগীর রক্ত, থুতু বা মল পরীক্ষা করে সেগুলিতে বিদ্যমান জীবাণুকে শনাক্ত করতে পারলে রোগীটির রোগনির্ণয় বা নিদান (diagnosis) করা যায় এবং তার পরে চিকিৎসা করা যায়। আমরা সারণি ২২.২-এ নানা প্রকারের জীবাণু ও কৃমি (worm) ঘটিত কয়েকটি সাধারণ রোগের তালিকা দিয়েছি।

চিত্র ২২.৩ : বিভিন্ন রোগদায়ক জীবাণু ও কৃমির প্রকারভেদ

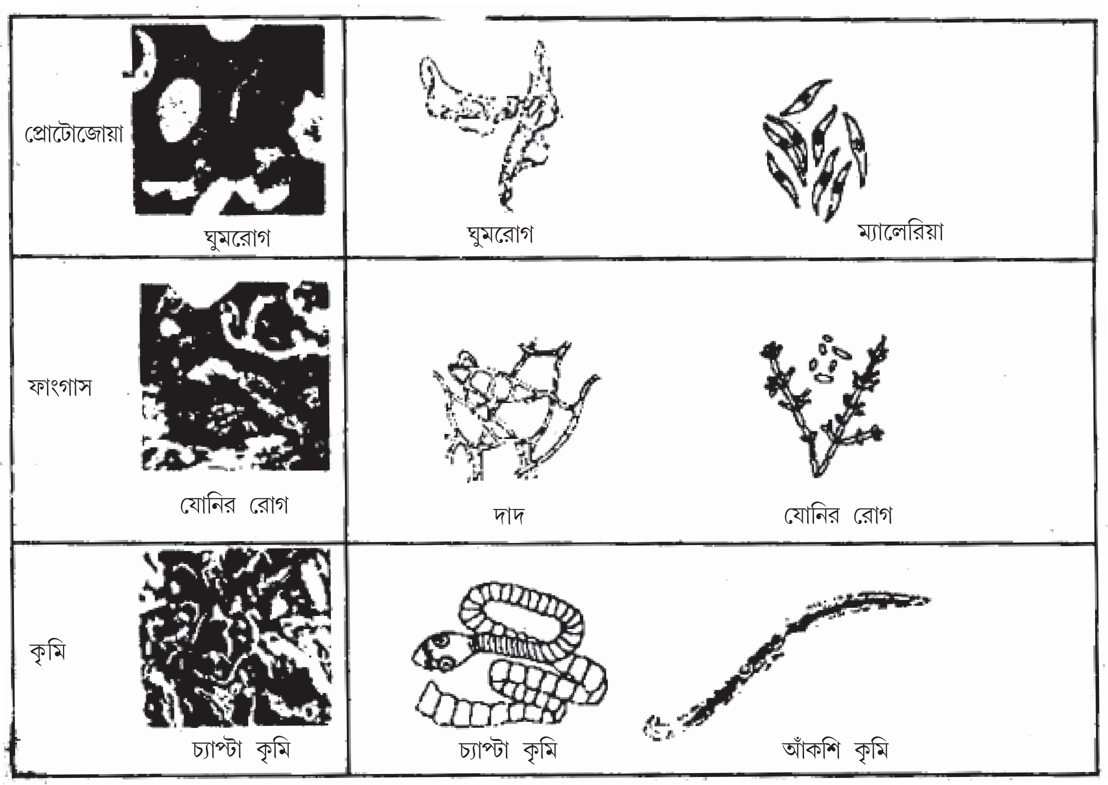

চিত্র ২২.৩ : বিভিন্ন রোগদায়ক জীবাণু ও কৃমির প্রকারভেদ

সারণি ২২.২ : জীবাণুজনিত সংক্রামক রোগ

ব্যাকটেরিয়া	**ভাইরাস**	**প্রোটোজোয়া**	**ফাংগাস**	**কৃমি**
কলেরা	চিকেন পক্‌স্	ম্যালেরিয়া	চর্মরোগ	ফিতাকৃমি
চোখওঠা	সাধারণ সর্দি	অ্যামিবিক আমাশয়	দাদ	আঁকশিকৃমি
ব্যাসিলারি আমাশয়	ইনফ্লুয়েঞ্জা			সূচকৃমি
হুপিং কাশি	হাম	স্লিপিং সিক্‌নেস্		(প্রধানত পাচনতন্ত্রের রোগ)
গনোরিয়া	মাম্‌প্‌স্			গিনিকৃমি
কুষ্ঠ	পোলিও			ফাইলেরিয়া
প্লেগ	জলাতঙ্ক			
সিফিলিস				
ট্র্যাকোমা				
যক্ষ্মা				
টাইফয়েড				

এখানে আমরা কৃমিঘটিত রোগগুলিও তালিকায় রেখেছি। কৃমি প্রধানত দূষিত জল বা খাদ্যের মাধ্যমে এবং কখনও কখনও ত্বক ভেদ করে মানবদেহে প্রবেশ করে। তারা অন্ত্রে বাস করে এবং যেসব ডিম পাড়ে সেগুলি মলে বেরিয়ে আসে। অস্বাস্থ্যকর অবস্থা মানুষকে কৃমিঘটিত রোগের আক্রমণের সম্মুখীন করে। এই কৃমিগুলি ওজন কমায়, পেটব্যথা জন্মায় এবং কখনও কখনও আমাশয় উৎপন্ন করে। দেহে প্রবেশের পরে এরা যকৃৎ বা ফুসফুসের মতো অন্যান্য দেহাঙ্গে ভেদ করে ঢোকে। আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী কৃমিজনিত রোগে ভোগেন। জনৈক শিশুরোগবিশেষজ্ঞ বলেন, তাঁর রোগীদের প্রায় আশি শতাংশের কৃমি আছে।

অনুশীলনী ৩

নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা, প্রদত্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে সত্যের ক্ষেত্রে ‘স’ এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে ‘মি’ লিখে তার ইঙ্গিত দিন।

(ক) পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন বাড়িতে বাস করলে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবে না। ☐

(খ) ভাগ্যের জন্যই লোকের রোগ হয়। ☐

(গ) জীবাণুর কারণেই সংক্রামক রোগ হয়। ☐

(ঘ) গরম কফি পান করার পরে ভ্যান লেভানহুক তাঁর দাঁত থেকে চাঁছা বস্তুতে জীবিত জীবাণু দেখেছিলেন। ☐

২২.৪.২ জীবাণু সর্বত্র বর্তমান

আপনাদের জানা উচিত যে অদৃশ্য জীবাণুগুলি সর্বত্র আছে, কারণ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের চারপাশে তারা রয়েছে—আমাদের শ্বাস নেওয়ার বায়ুতে, মৃত্তিকায়, পান বা স্নানের জন্য ব্যবহৃত জলে এবং আমরা যেসব বস্তুর সংস্পর্শে আসি, সেগুলির সবকটির ওপরে। জেনে বিস্মিত হবেন যে বহু লক্ষ কোটি জীবাণু আমাদের দেহত্বকের ওপরে এবং মুখ ও আন্ত্রিক নালিতে বাস করে। মানুষের শুষ্ক মলের এক-তৃতীয়াংশই ব্যাকটেরিয়া। অবশ্য এই জীবাণুগুলির মধ্যে মাত্র কতকগুলির জন্যই রোগ হয়। অন্য অনেকগুলি আছে যারা হিতকর; জীবমণ্ডলের (biosphere) পক্ষে তাদের ক্রিয়াকলাপের মুখ্য গুরুত্ব আছে। তারা না থাকলে পৃথিবীতে জীবনের বিনাশ ঘটবে। এদের অস্তিত্বের কথা জানার বহু আগে থেকেই দই ও সুরা তৈরি করা অথবা কেক ও রুটি বেক করার মতো কাজে আমরা তাদের ক্রিয়াকর্মের সুযোগ নিয়ে এসেছি। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা আবর্জনার শটন (decomposition) ঘটিয়ে তারা সেগুলিকে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো নির্দোষ অথচ অপরিহার্য রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করে। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জৈব কারখানার মতোও তাদের ব্যবহার করা যায়। বস্তুত ছত্রাক বা ফাংগাসের একটি কৃষ্টি (culture) থেকে প্রসিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। কয়েক প্রকার ব্যাকটেরিয়া মানুষের অন্ত্রে বাস করে এবং এগুলি থেকে ভিটামিন বি$_{১২}$ এবং ভিটামিন কে পাওয়া যায়। কাজেই কতকগুলি জীবাণু হানিকর হলেও অন্যগুলি মানবজাতির প্রভূত সেবা করে। জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার কিয়দংশ মানুষকে রোগ ও মৃত্যু থেকে বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি আবার কতকগুলি দেশ এই জ্ঞানকে ধ্বংস ও যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করেছে। আপনারা ‘জীবাণু যুদ্ধ’ (germ warfare) কথাটি শুনে থাকবেন। এই দেশগুলি এমন সব মারাত্মক জীবাণু সংগ্রহ করেছে, যেগুলিকে বায়ু বা জলকে দূষিত করা, এমনকি শস্য ও বন ধ্বংস করার জন্য বৈরিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। স্পষ্টত এরকম যুদ্ধবিগ্রহ কেবল সৈন্যদের নয়, জনসাধারণকেও হত্যা করে এবং সেকারণেই আন্তর্জাতিক ভাবে নিষিদ্ধ।

২২.৪.৩ জীবাণু কীভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে?

আপনারা শিখেছেন, জীবাণুগুলি ফলত সর্বত্র বর্তমান এবং আমাদের দেহ এজন্য নিরন্তর তাদের সংস্পর্শে আসছে। আমাদের মুখ, নাক, মূত্র ও প্রজননের পথগুলির মতো স্বাভাবিক দ্বারগুলি দিয়ে তারা আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে (চিত্র ২২.৪)। এরকম ঘটতে পারে যদি আমরা কলুষিত বায়ুতে শ্বাস নিই, দূষিত জল পান করি অথবা সংক্রামিত বা বিকৃত খাদ্য আহার করি। জীবাণুবাহী আঙুল বা নখ দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলে, ভালোমতো ধোয়া হয়নি এমন গ্লাস বা পেয়ালা থেকে পান করলে, অথবা ময়লা ও ব্যবহৃত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলেও জীবাণু আমাদের ঠোঁটে পৌঁছায়। করমর্দনের সময়ে, অথবা অন্যভাবে কারো দেহ স্পর্শ করার সময়ে সংস্পর্শহেতু অন্য লোক থেকে আমরা সংক্রামিত হতে পারি। যৌনক্রিয়ার সময়ে মূত্র ও প্রজননের পথগুলি দিয়ে জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে।

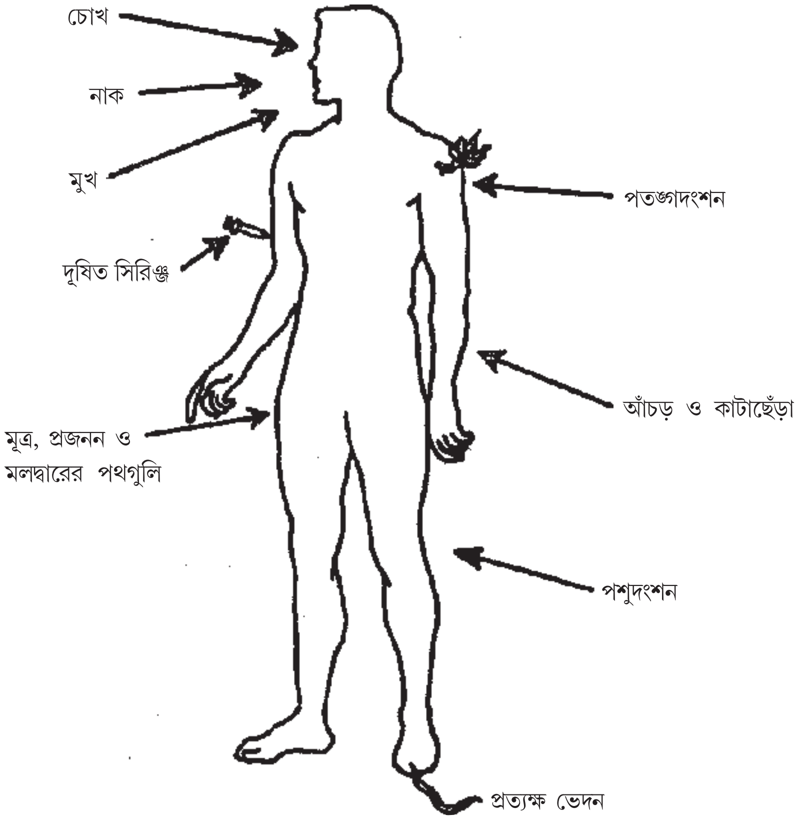

চিত্র ২২.৪ : রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুগুলি কীভাবে দেহে প্রবেশ করে।

সংক্রামিত বায়ু ও ধূলি থেকে আমাদের চোখে জীবাণু আসতে পারে। এই স্বাভাবিক দ্বারগুলির প্রত্যেকটি একটি নলে নিয়ে যায় এবং সেটি অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছায়। এভাবে জীবাণুগুলি আমাদের দেহমধ্যে গিয়ে আমাদের অঙ্গগুলিকে সংক্রামিত করে। নলগুলির বিবরগাত্র কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) দিয়ে আচ্ছাদিত; যখন কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো, তখনই শুধু এই ঝিল্লিটি ভেদন (penetration) প্রতিরোধ

করতে পারে। সাধারণ সর্দিতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিটি নিজেই আক্রান্ত হয় এবং জীবাণু তারই ওপরে বসে বংশবৃদ্ধি করে।

জীবাণুগুলি অদৃশ্য আক্রমণকারী; তাদের প্রবেশ রোধ করা সহজ নয়। তাদের প্রবেশের প্রধান ভৌত প্রতিবন্ধক হল আমাদের ত্বক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বহুসংখ্যক জীবাণু আমাদের ত্বকের ওপরে বাস করে এবং তাদের অধিকাংশই নির্দোষ। কতকগুলি জীবাণু অবশ্য ফোঁড়া ও ব্রণ উৎপাদন করে, কেশমূল আক্রমণ করে এবং স্থানীয় সংক্রমণ গড়ে তোলে। নিয়ন্ত্রণ না করলে এরকম সংক্রমণ ত্বকের তলায় আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আঘাতের ফলে ত্বক কেটে বা ছড়ে গেলে ব্যাকটেরিয়া ত্বকের তলায় চলে যায় এবং ক্ষতটি বিষিয়ে বা সেপটিক হয়ে যায়।

পতঙ্গও বহু রোগজীবাণুর বাহক। রক্তশোষক পতঙ্গগুলি দংশনের দ্বারা ত্বকে ছিদ্র করে এবং সেভাবে দেহের ভিতরে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়। যথা, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশক ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়; ফাইলেরিয়ার কৃমিও একপ্রকার মশকের দ্বারা বাহিত হয়। অনুরূপভাবে প্লেগ এবং স্লিপিং সিক্‌নেস্‌ও যথাক্রমে উপমক্ষিকা (flea) ও সেৎসে (tsetse) নামে মাছির দংশনে উৎপন্ন হয়। আঁকশিকৃমির (hookworm) মতো বহু কৃমি ত্বক ভেদ করে রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে পারে। সূচকৃমির (pinworm) ডিম দূষিত আঙুল অথবা সংক্রামিত খাদ্য বা জলের মাধ্যমে মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। আপনারা জানেন, পাগলা কুকুরের দংশন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রাণনাশক, কারণ কুকুরটি জলাতঙ্ক (rabies) রোগের জীবাণু বহন করে। সূচিপ্রয়োগ বা ইনজেকশনের জন্য ব্যবহৃত দূষিত ও সংক্রামিত সিরিঞ্জও রোগের কারণ হতে পারে।

এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলি কীভাবে সর্বপ্রকার রোগ ঘটাতে পারে, তা ভেবে আপনাদের আশ্চর্য লাগতে পারে। এদের প্রধান কৌশল হল, আমাদের দেহে এরা অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ব্যাকটেরিয়া প্রতি কুড়ি মিনিটে বিভাজনের দ্বারা প্রজনন করতে পারে। কয়েক দিন একটিমাত্র ব্যাকটেরিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করতে পারে এবং এর ফলে সংক্রমণস্থলে লক্ষ লক্ষ কোশকে সংক্রামিত করে।

ভাইরাস শুধুমাত্র জীবিত কোশের ভিতরেই প্রজনন করতে পারে। দেহকোশে প্রবেশের পরে ভাইরাস তার নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করে এবং নিজের অনুলিপি নির্মাণের জন্য কোশটিকে নির্দেশ দেয়। এভাবে উৎপন্ন বহুসংখ্যক ভাইরাস দেহে মুক্ত হয়ে অন্যান্য কোশকেও মেরে ফেলে।

> **ম্যালেরিয়া**
>
> আয়ুর্বেদীয় যুগের চরক ও সুশ্রুত রোগটির সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছিলেন এবং একে মশকদংশনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদে ম্যালেরিয়ার ওপরে গবেষণারত রোনাল্‌ড্ রস নিশ্চিত প্রমাণ দেন যে মশকই ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। ১৮৯৮ সালে রস কলকাতায় পাখির ম্যালেরিয়ার ওপর গবেষণা করেন এবং মশা যে পাখির মধ্যেও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায় তা দেখাতে সক্ষম হন।

অনুশীলনী ৪

(ক) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা, প্রদত্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে সত্যের ক্ষেত্রে 'স' এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে 'মি' লিখে তার ইঙ্গিত দিন।

(১) ভাইরাস জীবিত কোশের বাইরে প্রজনন করতে পারে।

(২) ব্যাকটেরিয়া বিভাজনের দ্বারা প্রজনন করে।

(৩) সকল ব্যাকটেরিয়াই হানিকর।

(৪) আমাদের ত্বকের ওপরে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাস করে।

(৫) ম্যালেরিয়া একটি প্রোটোজোয়ার জন্য হয়।

(৬) কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে আমাদের সাহায্য করে।

(খ) শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(১) জীবাণুর প্রবেশের প্রধান ভৌত প্রতিবন্ধক হল আমাদের ....

(২) যখন কোন ব্যক্তি .... থাকে, তখনই শুধু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি জীবাণুর ভেদন প্রতিরোধ করতে পারে।

(৩) জীবাণুগুলি ...., ... ও ....-এর মাধ্যমে আমাদের মুখে পৌঁছাতে পারে।

২২.৪.৪ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের সংগ্রাম

আপনারা শিখেছেন যে বহু প্রকারের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে। তাহলে আপনাদের নিশ্চয়ই এই ভেবে আশ্চর্য লাগছে যে আমরা আরও ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ি না কেন! অনেক লোক জীবাণুর সংস্পর্শে আসে, কিন্তু মাত্র কয়েকজনই অসুস্থ হয়। এর অর্থ কি এই, যে কতকগুলি লোক সংক্রমণের অধিকতর প্রতিরোধ করতে পারে?

প্রথমত, আমাদের দেহের ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলি জীবাণুদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের পৃষ্ঠে সুরক্ষাদায়ক আবরণ দেওয়ার জন্য ত্বকে অবস্থিত গ্রন্থিগুলি তৈলাক্ত বস্তু উৎপাদন করে। ত্বক দিয়ে কয়েকটি বর্জ্য পদার্থ ও জীবাণুকে নিষ্কাশন করতে ঘর্ম আমাদের সাহায্য করে। ঘর্মে লাইসোজাইম নামে পরিচিত একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থও থাকে, যা জীবাণুর বিনাশ ঘটায়। অশ্রু, লালা, নাসিকার ক্ষরণ এবং কলারসেও লাইসোজাইম পাওয়া যায়। যেসব বহু রকমের জীবাণু আমাদের পাকস্থলীতে এসে পড়ে, সেগুলি তীব্র অম্লধর্মী পাকস্থলীরসের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

যে জীবাণুগুলি আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে, আমাদের অঙ্গগুলিতে পৌঁছে যায় অথবা পাকস্থলীতে বেঁচে যায়, বংশবৃদ্ধির জন্য তারা আমাদের দেহ থেকে পুষ্টিগ্রহণ করে। তারা তারপরে আমাদের দেহকোশগুলিকে ধ্বংস করতে শুরু করে এবং বিষাক্ত বা অধিবিষ-জাতীয় (toxic) বস্তুও ক্ষরণ করে। তাদের ক্রিয়াকলাপ রোধ না করলে তারা আমাদের অসুস্থ বোধ করার মতো যথেষ্ট টক্সিন বা অধিবিষ উৎপন্ন করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আমাদের দেহের কাছে পরাস্ত হয়। আপনারা জানলে বিস্মিত হবেন যে আমাদের দেহে কোন দেশের সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় একটি বিশদ সুরক্ষাতন্ত্র আছে। এই সুরক্ষাতন্ত্রকে 'ইমিউন সিস্টেম' বা অনাক্রমণতন্ত্র বলে এবং চিত্র ২২.৫-এ যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে এটি সারাদেহে ছড়িয়ে থাকে। সুরক্ষা বাহিনীটি শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) নামে বিশেষ কোশগুলির আকারে বর্তমান; এই কোশগুলি রক্তের সঙ্গে সারা শরীরে সংবাহিত হয়। শ্বেত রক্তকণিকাগুলি নানা ধরনের এবং তারা আক্রমণকারীর সঙ্গে নানা উপায়ে যুদ্ধ করে। বহু প্রকার সংক্রমণের সময়ে তাদের মোট সংখ্যার স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধির সূচনা হয়—সংক্রমণের তীব্রতার ওপরে নির্ভর করে সংখ্যা দুই, তিন বা চারগুণ হয়ে যেতে পারে। এজন্য অণুবীক্ষণের নীচে একবিন্দু রক্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা চিকিৎসকেরা রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা নির্ণয় করেন।

জীবাণুরা আমাদের দেহকে আক্রমণ করলে বিশেষ ধরনের শ্বেতকণিকাগুলি সংক্রামিত স্থানে চলে আসে এবং আক্রমণকারী জীবাণুগুলিকে গ্রাস করে তাদের বিনাশ ঘটায়। এই কোশগুলিকে আগ্রাসী কোশ (engulfing cell) বলা হয় (চিত্র ২২.৬ ক)। মজার কথা, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে অন্য ধরনের শ্বেতকণিকাকে মৃত জীবাণু ও নিহত শ্বেতকণিকাগুলির অপসারণের জন্য ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সংক্রমণস্থলে সাধারণত যে পুঁজ থাকে, তাতে থাকে বহুসংখ্যক মৃত কোশ ও জীবাণু। অন্য এক ধরনের শ্বেতকণিকা 'অ্যান্টিবডি' নামে একপ্রকার রাসায়নিক আয়ুধ উৎপাদন করে—অ্যান্টিবডি বিষ বা অধিবিষ-জাতীয় (toxic) বস্তুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য তাদের আক্রমণ করে (চিত্র ২২.৬ খ)। এ ছাড়া এই অ্যান্টিবডিগুলি আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করে দেয়, যাতে আগ্রাসী কোশগুলি তাকে সহজেই চিনতে পারে (চিত্র ২২.৬ গ)।

আরও এক ধরনের শ্বেতকণিকা ঘাতক কোশ (killer cell) হিসাবে কাজ করে এবং আক্রমণকারী বা সংক্রামিত দেহকোশকে সোজাসুজি বিনষ্ট করে। প্রথমবার একটি বিশেষ আক্রমণকারীর সম্মুখীন হয়েছে, এমন কিছু শ্বেতকণিকাকে 'প্রশিক্ষিত কোশ' হিসাবে সঞ্চয় করে রাখা হয় এবং এগুলি পরবর্তী আক্রমণের সময়ে ফলপ্রদভাবে কাজ করতে পারে। রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের সম্পূর্ণ সুরক্ষা পদ্ধতিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি বিপদসংকেতের উৎপত্তি ঘটায়।

প্রায়শই দেহ সংক্রমণটি সম্বন্ধে ফলপ্রদ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয় এবং জ্বর বা প্রদাহের মতো সকল লক্ষণই আপনা-আপনি হ্রাস পায়। কিন্তু অন্যান্য সময়ে দেহের সুরক্ষা পদ্ধতির সম্পূরণে ঔষধ ব্যবহার করতেই হয়। বহু গবেষণার পরে বিভিন্ন প্রকার সংক্রমণের কয়েকটিকে দমন করতে পারে এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অসুস্থতা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সর্বোত্তম। অনেক সময়ে লোকে যখন চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যায়, তার আগেই আক্রমণকারী জীবাণুগুলি দেহতন্ত্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে।

চিত্র ২২.৫ : ইমিউন সিস্টেম। শ্বেত রক্তকণিকাগুলি থাইমাস ও অস্থিমজ্জা, উভয় স্থানেই বিকাশলাভ করে। নবজাত শ্বেতকণিকাগুলি রক্তে গিয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

(ক) গ্রাস করা
(engulfing)

(খ) টক্সিনকে
নিষ্ক্রিয় করা

(গ) জীবাণুকে
চিহ্নিত করা

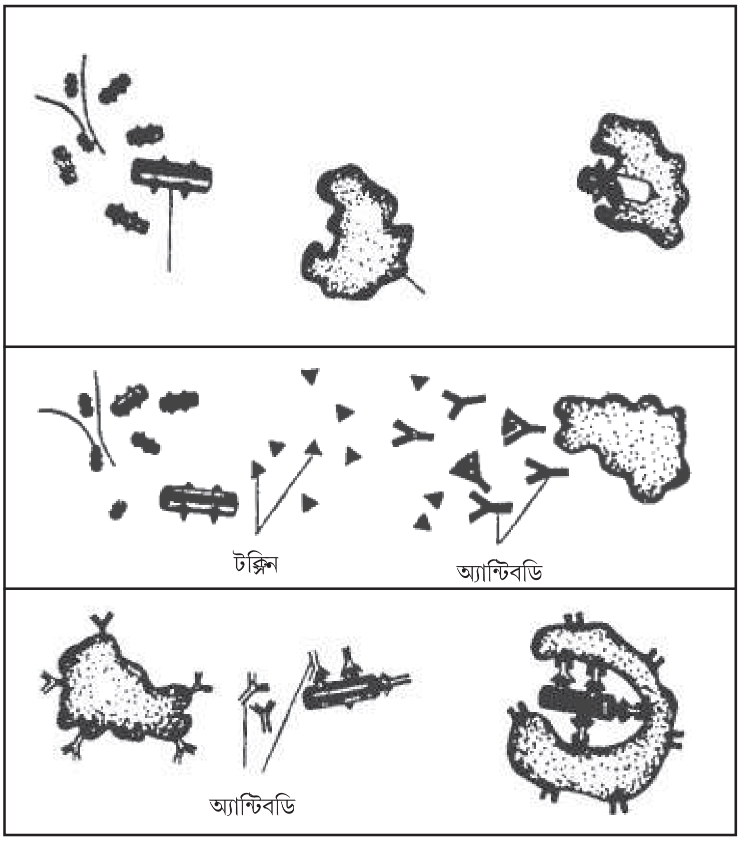

চিত্র ২২.৬ : যেভাবে শ্বেত রক্তকণিকাগুলি জীবাণুদের নাশ করে, তার বিভিন্ন পদ্ধতি।

টিকাদান :

এবার দেখা যাক, টিকাদান কীভাবে আমাদের রোগ থেকে রক্ষা করে।

আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, শ্বেত রক্তকণিকাগুলি যেসব অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে, সেগুলি আক্রমণকারীদের দ্বারা উৎপাদিত টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এই শ্বেতকণিকাগুলি নানা ধরনের এবং প্রতিটি ধরনে এমন লক্ষ লক্ষ কোশ আছে যারা একটি বিশেষ বিজাতীয় আক্রমণকারীকে চিনতে এবং তার সঙ্গে লড়তে পারে। কোন এক-শ্রেণির শ্বেতকণিকা একবার কোন বিশেষ ধরনের আক্রমণকারীর সংস্পর্শে এলে সে সম্বন্ধে তার স্মৃতির বিকাশ ঘটে এবং এভাবে সে ভবিষ্যৎ আক্রমণকে প্রতিহত করতে প্রশিক্ষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেহ ওই সংক্রমণটির পক্ষে অন্যক্রম্য (immune) হয়ে যায়। এই পদ্ধতিটিকে অনাক্রম্যতাসৃজন (immunisation) বলে।

> সর্বপ্রথম এডওয়ার্ড জেনার ১৭৯৬ সালে বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কার করেন। তিনি এই টিকা তাঁর নিজের পুত্রের ওপরে পরীক্ষা করেছিলেন।

সংক্রামক বস্তুগুলির প্রকৃত আক্রমণের দ্বারা এভাবে নানাপ্রকার যোদ্ধা কোশ উৎপন্ন হওয়ার ফলে আমাদের দেহে নিয়মিতভাবে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা (natural immunity) বিকাশ পায়। কৃত্রিম অনাক্রম্যতাসৃজন একটি চতুর কৌশল। এটি করা হয় টিকাদানের মাধ্যমে অর্থাৎ দেহে কৃত্রিমভাবে দুর্বল

সংক্রমণ ঘটিয়ে, যাতে সুরক্ষা পদ্ধতি উদ্দীপিত হয়ে ওই বিশেষ সংক্রমণের সঙ্গে লড়বার জন্য প্রশিক্ষিত শ্বেতকণিকা উৎপাদন করে।

অনুশীলনী ৫

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) শ্বেতকণিকা আক্রমণকারীদের নাশ করে, হয় ....-র দ্বারা না হয় .... নামে পরিচিত কিছু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে যেগুলি আক্রমণকারীদের দ্বারা উৎপাদিত ....-কে নিষ্ক্রিয় করে।

(খ) তান্ত্রিক বা হাতুড়ের দ্বারা চিকিৎসিত বহু রোগই বাস্তবে আমাদের নিজেদের ....-এর দ্বারা প্রশমিত বা নিরাময় হয়।

(গ) শ্বেত রক্তকণিকাগুলি রক্তে .... রূপে থাকে এবং সারাদেহে .... হয়।

(ঘ) আক্রমণকারী .... হলে রোগী স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

(ঙ) জীবাণুকে .... করতে ঔষধ দেহকে সাহায্য করে।

(চ) টিকাদান হল আগে থেকে .... আক্রমণকারীর একটি নমুনা দিয়ে আমাদের ....-কে .... দেওয়ার একটি উপায়।

(প্রশিক্ষণ, দেহ, পরাস্ত, প্রহরী, গ্রাস করা, অ্যান্টিবডি, টক্সিন, দুর্বল, সংবাহিত, সুরক্ষাতন্ত্র, বিনাশ।)

২২.৫ রোগের বিস্তার বা সংক্রমণ

আমরা শিখেছি যে নানাপ্রকার জীবাণু ও কতকগুলি কৃমির জন্য সংক্রামক রোগগুলি হয়ে থাকে। এবারে তবে দেখা যাক কীভাবে এগুলি একজন থেকে অন্যজনে যায়। এগুলির যাওয়ার নানা পদ্ধতি আছে, যেমন—বায়ু, জল, খাদ্য, স্পর্শ, পতঙ্গ ও অন্যান্য বাহকের মাধ্যমে।

বায়ুবাহিত রোগ :

যেসব ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস বায়ুতে বাহিত হয়, তাদের জন্য কতকগুলি রোগ হয়ে থাকে। সংক্রামিত ব্যক্তি হাঁচলে বা কাশলে তার ফোঁটাগুলি দৃশ্যত ছিটিয়ে পড়ে। তরল রসের এই ক্ষুদ্র ফোঁটাগুলিতে যে জীবাণুগুলি থাকে তারা দীর্ঘকাল বাতাসে ভাসমান থাকতে পারে। অন্য একজন কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর পক্ষে সম্ভাবনা থাকে এই জীবাণুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শ্বাসের সঙ্গে নিয়ে নেওয়ার এবং তাদের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার (চিত্র ২২.৭ দেখুন)। একজন অসুস্থ ব্যক্তি এভাবে অন্য বহু ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারেন। সাধারণ সর্দির ভাইরাস এই পদ্ধতিতেই ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন উপায়ে বিস্তারলাভ করে, এমন রোগগুলি সারণি ২২.৩-এ দেওয়া হয়েছে। তালিকা অনুসারে কুষ্ঠও অনুরূপভাবে ছড়ায়; কিন্তু শুধুমাত্র দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির খুব কাছাকাছি থাকলেই এটি ছড়ায় এবং এর লক্ষণগুলি বিকাশলাভ করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। স্যাঁতসেঁতে বন্ধ জায়গায় এই রোগগুলি সহজেই বিস্তারলাভ করে।

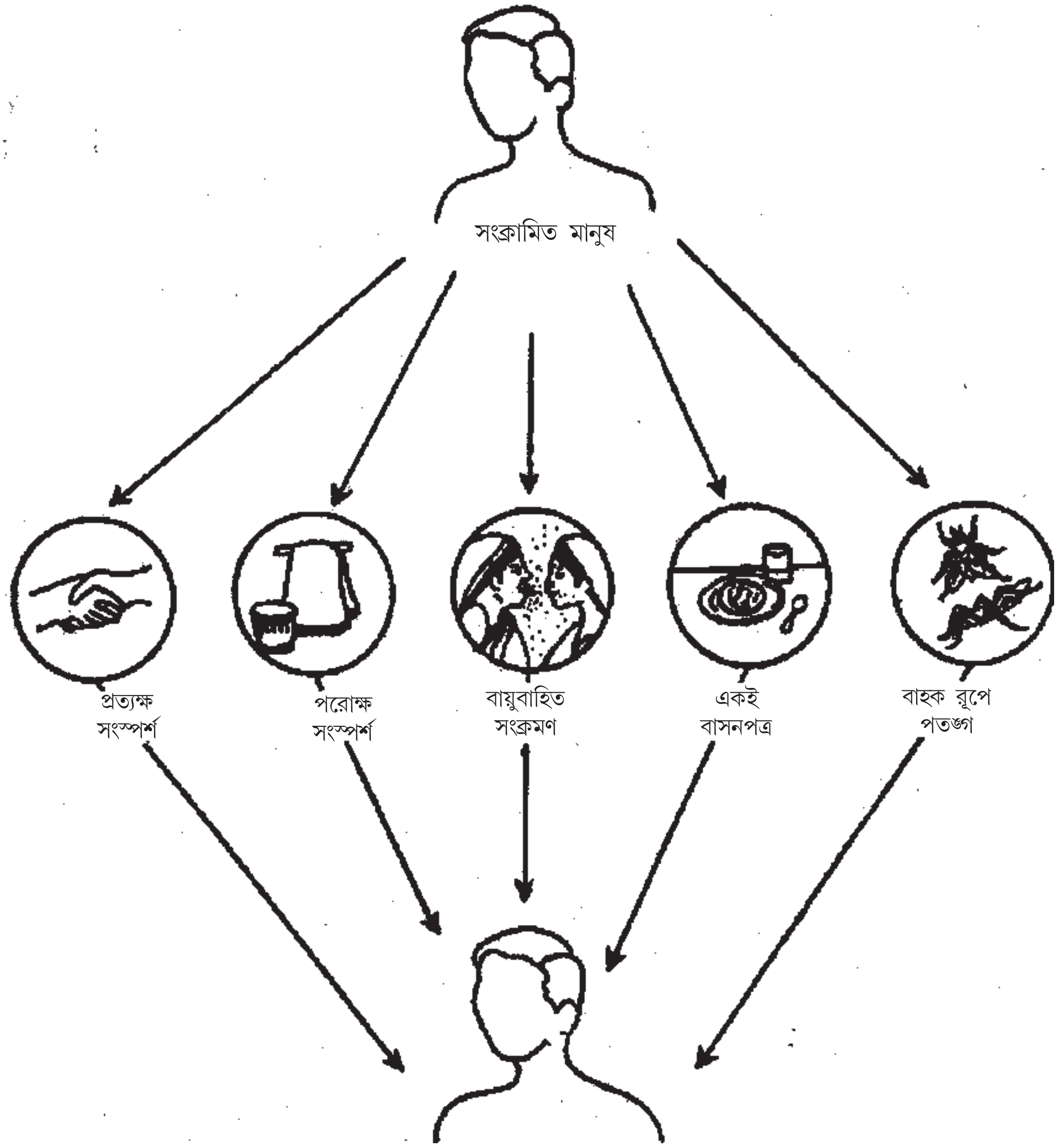

চিত্র ২২.৭ : রোগবিস্তারের পথগুলি।

জলবাহিত রোগ :

কলেরা ও টাইফয়েডের মতো রোগ তথা উদরাময় ও আমাশয় জলের মাধ্যমে ছড়ায়। এই রোগগুলির জীবাণুরা সংক্রামিক ব্যক্তির অন্ত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং মলে নির্গত হয় (চিত্র ২২.৮)। কৃমিগুলির ডিমও মলে নিঃসৃত হয় (চিত্র ২২.৯)।

চিত্র ২২.৮ : জলের উৎসমধ্যে লোকজনের মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ বা শুধুমাত্র ধোয়াধুয়ির ফলেও এই জল পানের পক্ষে নিরাপদ থাকে না।

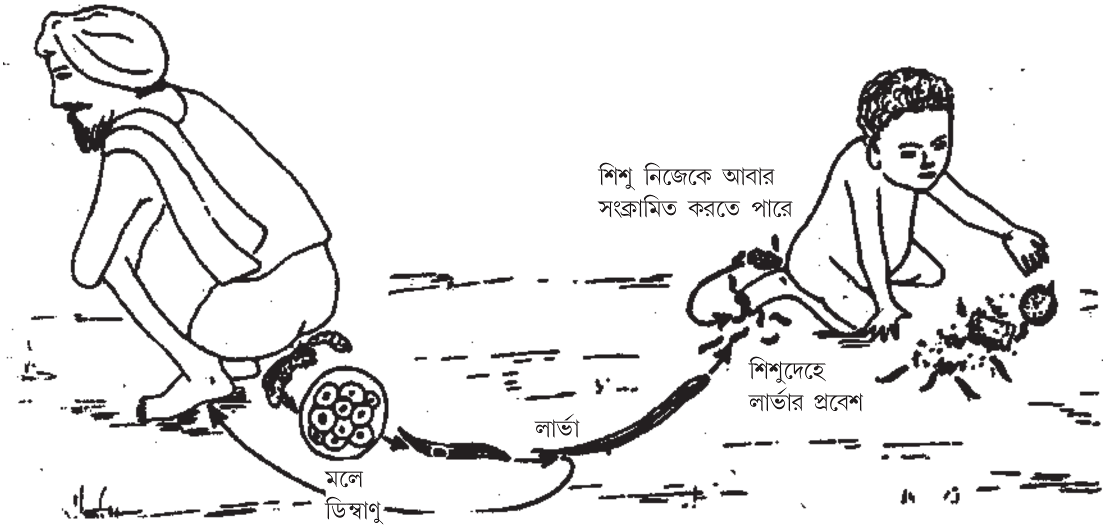

চিত্র ২২.৯ : আঁকশিকৃমি বা হুক্ওয়র্মের বিস্তার।

আমাদের অধিকাংশ গ্রামে দুর্ভাগ্যক্রমে যেমন করা হয়, তেমনভাবে খোলা মাঠে সংক্রামিত মলমূত্র ত্যাগ করলে জীবাণু বা ডিমগুলি পুকুর বা নদীর মতো স্থানীয় জলসরবরাহের উৎসে বাহিত হতে পারে। এরকম জলে স্নান করা

বা বাসনপত্র ধোয়া অথবা এই জল পান করায় অন্য লোকেদের সংক্রমণ ঘটতে পারে। কখনও কখনও বস্তি এলাকায় পায়খানাগুলি হাত-পাম্পের খুব কাছেই থাকে এবং তার ফলে পানীয় জল রোগের উৎস হয়ে ওঠে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যেসব লোক এমন এলাকায় থাকতে বাধ্য হন অথবা যাঁরা মাঠকে পায়খানা হিসাবে ব্যবহারের জীবনধারা বংশানুক্রমে পেয়েছেন, জলবাহিত রোগগুলিতে তাঁরাই সর্বাধিক ভোগেন।

এই রোগগুলির বিস্তারের অপর কারণটি হল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সংক্রামিত লোকেদের অবহেলা। যদি মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগের পরে সংক্রামিত ব্যক্তি সাবধানে হাত ধুয়ে না ফেলেন, তবে হাতে কিছু জীবাণু বা কৃমির ডিম বাহিত হতে পারে যা খাদ্য, বাসনপত্র বা আসবাবপত্রের মতো অন্যান্য জিনিসে স্থানান্তরিত হবে। সুস্থ লোক এই জিনিসগুলিকে স্পর্শ করলে জীবাণু তাঁর দেহে পৌঁছে যাবে (চিত্র ২২.৭)।

> হস্তচালিত নলকূপের সংক্রামিত জলের জন্য ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে কলেরা মহামারি হয়েছিল। নলকূপগুলি যথেষ্ট গভীর না হওয়ায় চারিপাশের উৎস থেকে সংক্রামিত জল সেগুলির মধ্যে চুইয়ে এসেছিল।

খাদ্যবাহিত রোগ :

রাঁধুনীর মতো যাঁরা খাদ্য নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা যদি কোন সংক্রমণে ভোগেন এবং মলত্যাগের পরে হাতধোয়ার ব্যাপারে সাবধান না হন, তবে জীবাণু বা কৃমির ডিম খাদ্যে পৌঁছাবে এবং লোকে সংক্রামিত হবে। টাইফয়েড, ব্যাসিলারি আমাশয় এবং পেটের অন্যান্য সংক্রমণ এভাবে ছড়ায়। মাছিরা মলমূত্র বা আবর্জনার ওপরে বসে যেসব জীবাণু তুলে নেয়, খাদ্যে বসে সর্বদাই তারা সেগুলিকে তার ওপরে নিক্ষেপ করে। সার হিসাবে ব্যবহৃত মলের দ্বারা সবজি এবং ফলও দূষিত হয়ে যায়। মাছিবসার অবস্থায়, এমনকি বাতাসে উন্মুক্ত থাকলেও খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া আসতে পারে এবং সহজেই এর মধ্যে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এরকম খাদ্য পচে যায় এবং রোগের শক্তিশালী উৎস হতে পারে। এতজ্জনিত রোগটির তীব্রতম আকারকে 'খাদ্যের বিষক্রিয়া' (food poisoning) বলা হয়। সাধারণত তপ্ত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাদের দ্বারা উৎপাদিত টক্সিনগুলি তাপে নষ্ট হয় না।

পতঙ্গ বা অন্য বাহকদের দ্বারা বিস্তারিত রোগ :

আমরা জানি, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। ডেঙ্গুজ্বর এবং ফাইলেরিয়াও মশকের দংশনে হয়ে থাকে। এই পতঙ্গগুলি রক্ত শোষণ করে এবং তার কিয়দংশকে আবার দেহমধ্যে সূচিপ্রয়োগে (injection) প্রবেশ করায়। কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শোষণের সময়ে মশকেরা জীবাণুগুলি পায় এবং অন্যদের দংশন বা তাদের ত্বক ভেদ করার সময়ে তাদের এই জীবাণু দিয়ে সংক্রামিত করে। মাছিও আন্ত্রিক রোগগুলির জীবাণুদের বাহক। অনুরূপভাবে অনেক উপমক্ষিকাও (fleas) রোগ ছড়ায়। ইঁদুর বহু রোগের ভাণ্ডার। তাদের জন্য অসংখ্যবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। উকুন, পোকামাকড়, আরশোলা প্রভৃতিও বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে। গিনি কৃমি বা গিনি ওয়র্ম রোগ ভারতে বেশ সাধারণভাবেই দেখা যায়। প্রায় এক মিটার দীর্ঘ পূর্ণবয়স্ক কৃমিটি পাকস্থলী থেকে পায়ে অভিপ্রয়াণ (migration) করে এসে লার্ভা উৎপাদন করে এবং চিত্র ২২.১০-এ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনভাবে সেগুলিকে জলে ছেড়ে দেয়। এই জল অতঃপর সংক্রামক হয়ে পড়ে।

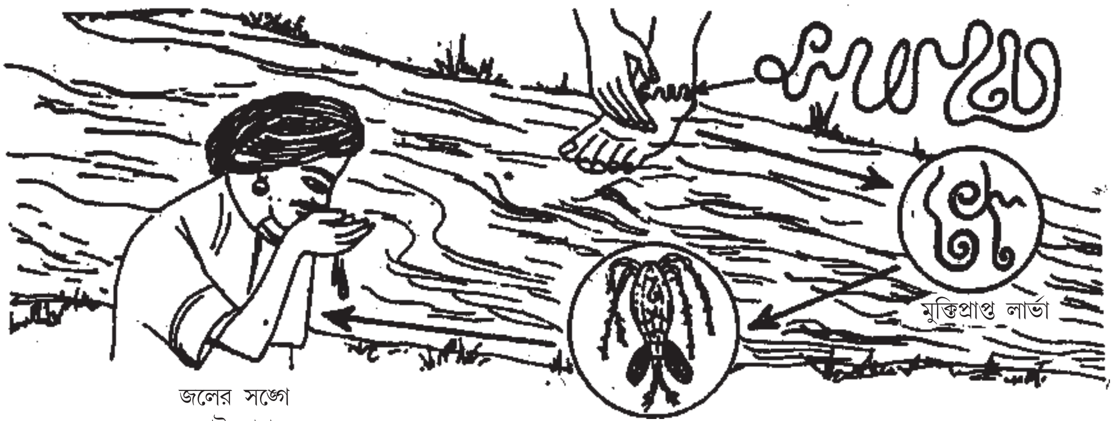

চিত্র ২২.৩ : গিনিকৃমির সংক্রমণ।

সারণি ২২.৩ : কতকগুলি সাধারণ রোগের বিস্তারের পদ্ধতি

বায়ুবাহিত সংক্রমণ	**জল**	**খাদ্য**	**স্পর্শ**
শ্বসনতন্ত্রের নানা রোগ	পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংক্রমণ	টাইফয়েড	সিফিলিস
সাধারণ সর্দি	ব্যাকটেরিয়াঘটিত কলেরা	ব্যাসিলারি আমাশয়	গনোরিয়া
হাম	টাইফয়েড	ফিতাকৃমি	
হুপিং কাশি	আমাশয়		
কুষ্ঠ	উদরাময়		
সেরিব্রোস্পাইন্যাল			
মেনিন্‌জাইটিস্‌			
চিকেন পক্‌স্‌	অ্যামিবিক আমাশয়		
	গোলকৃমি-ঘটিত আমাশয়		
	গিনিকৃমি		

অনুশীলনী ৬

নিম্নলিখিত রোগগুলি বিস্তারের পদ্ধতি লিখুন :

রোগ	বিস্তারের পদ্ধতি
(ক) চিকেন পক্স্	
(খ) কলেরা	
(গ) যক্ষ্মা	
(ঘ) কুষ্ঠ	
(ঙ) গিনিকৃমি	
(চ) হাম	
(ছ) সাধারণ সর্দিকাশি	
(জ) ম্যালেরিয়া	

২২.৬ রোগের প্রতিষেধ

আমরা যখন জানি যে সংক্রামক রোগগুলি জীবাণুর জন্য হয়ে থাকে, তাদের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এবং যথাযথ চিকিৎসায় রোগগুলির প্রতিষেধ (prevention) করা এখন সম্ভব হওয়া উচিত।

২২.৬.১ প্রাচীনকালে রোগ-প্রতিষেধ

প্রাচীন ভারতে অবলম্বিত যেসবব আচরণ সংক্রমণকে কমাতে পারত, তাদের কয়েকটির বিশ্লেষণ করে এই পরিচ্ছেদটি শুরু করা যাক। এগুলির দৃষ্টান্তে হল, ভোজনের আগে ও পরে হাতধোয়া, প্রত্যহ স্নান করা, বাসকক্ষে পাদুকা না আনা, খাদ্য রন্ধনের জায়গায় বিশেষত অস্নাত লোকদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া। কয়েকটি আচরণ রোগপ্রতিষেধে সাহায্য করে দীর্ঘকাল যাবৎ এই পর্যবেক্ষণ থেকেই এই আচরণগুলি নিশ্চয় বিবর্তিত হয়ে থাকবে। প্রসবের অব্যবহিত পরে মাতা নবজাতককে আলাদা করে রাখা ছিল একটি সুপ্রচলিত প্রথা; সেটিও মাতা ও শিশুর সংক্রমণ প্রতিষেধে সাহায্য করত। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার এই সূত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি মনুর বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মহেন-জো-দারো ও হরপ্পার খননকার্যে একটি আবৃত জলনির্গম প্রণালী এবং জলসরবরাহের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। বাড়ির নর্দমাগুলি সমস্ত ময়লা জল রাস্তার পয়ঃপ্রণালীতে নিয়ে গিয়ে ফেলত। উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থারও (sanitation) আয়োজন ছিল। অনুরূপভাবে, মিশর, গ্রিস ও চিনের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতেও চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। মিশরীয়দের জন-স্নানাগার এবং ভূগর্ভস্থ জলনির্গম প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। মশারির ব্যবহার এবং ইঁদুরের সঙ্গে প্লেগের সম্পর্ক তাদের জানা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর খ্যাততম গ্রিক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেস স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জলবায়ু, জল, পরিধেয়, আহার ও পানের তাৎপর্য পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রকৃতই আগ্রহী মানুষ। প্রাচীন ভারতীয় ও চৈনিক স্বাস্থ্যপরিসেবা ব্যবস্থায় অনাক্রম্যতাসৃজন বা ইমিউনাইজেশন সম্বন্ধেও জানা ছিল। বসন্তরোগ প্রতিষেধের জন্য জীবন্ত বসন্ত রোগজীবাণুর টিকাদানও তাদের জানা ছিল।

২২.৬.২ প্রতিষেধক চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

এখন দেখা যাক, প্রতিষেধক চিকিৎসার (preventive medicine) প্রচলিত ধারণাটির কীভাবে উদ্ভব হল। কাহিনিটির শুরু মাত্র দেড়শো বছর আগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা জাপানে ভ্রমণের পরে ফিরে লোকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মোহিত হয়ে যায় এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা-ঘটিত অগ্রগতিগুলি বিবৃত করে। অন্য যে একটি দিক সম্বন্ধে তারা প্রায়ই মন্তব্য করে, সেটি হল ওদেশের শহরগুলিতে পালিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আপনি কি বিশ্বাস করেবন যে, কোন লোক গৃহের বাইরে বা রাস্তায় অথবা দূরগামী রাজপথেও যদি আবর্জনা ফেলে, তাকে প্রচুর জরিমানা দিতে হয়? এই দেশগুলি আজ যেমন, আগেও কি তেমনি পরিষ্কার ছিল? না, বস্তুত প্রায় দেড়শো বছর আগে শিল্পবিপ্লবের পরে পশ্চিমি দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণির মানুষেরা অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় বাস করত। বাড়ির সামনে আবর্জনার স্তূপ, পয়ঃপ্রণালীর অভাব, মাছিতে ভরা কসাইখানা—সবই ছিল ভারতীয় শহরগুলির পুরানো জনবহুল এলাকাগুলিতে এবং আমাদের অধিকাংশ গ্রামে আজ যা দেখতে পাই, তারই অনুরূপ।

তখন পর্যন্ত পশ্চিমি লোকেরা জানতেন না, তাঁদের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল নোংরা ময়লা। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময়ে রোগ এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার (sanitation) মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক দেখানো হয়েছিল। সেসময়ে তিরিশটি পর্যন্ত পরিবার একটিমাত্র পায়খানা ব্যবহারের ভাগীদার ছিল। কলেরার মতো মহামারি রোগগুলির প্রায়ই প্রাদুর্ভাব ঘটত। দেখা গিয়েছিল, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির লোকেদের চেয়ে শ্রমিকরা অনেক বেশি রোগে ভুগতেন। এসব দেখার ফলে রাষ্ট্রকর্তৃক জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণের ধারণাটি আবির্ভূত হল এবং রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য আইনগুলি প্রণীত হয়ে পুলিশের দ্বারা বলবৎ হল। ১৮৩২ সালে ইংল্যান্ডে কলেরার একটি বৃহৎ মহামারি ঘটল। তখন শ্রমিকশ্রেণির স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিস্থিতি অনুসন্ধান করা হল। এ থেকে এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হল যে, পচা জান্তব পদার্থের সঙ্গে যে দুর্গন্ধ গ্যাস থাকে, সেগুলি থেকেই কলেরা ও অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হয়। রোগের সংক্রমণে জলের একটি ভূমিকা থাকার কথাও জানা গেল।

১৮৪৮ সালে ইংল্যান্ড তার জনস্বাস্থ্য আইন প্রণয়ন করল—এতে জনগণের স্বাস্থ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণিত হল এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা (sanitation) সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্ট হল। ১৮৭৫ সালের জনস্বাস্থ্য আইনে নির্মল পরিবেশ ও বিশুদ্ধ জলের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি বর্ণিত হল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা তার অনুসরণ করল। নির্মল জল, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও বাসগৃহের নিশ্চয়তা দিতে এবং আবর্জনা বা মল বহনের মতো আপত্তিজনক পেশাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হল।

এভাবে বহু রোগের বিস্তার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হল। পচা পদার্থ ও আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলার এবং বায়ুকে জীবাণুগুলি দূষিত করে তাদের প্রজননক্ষেত্রগুলি অপসারণ করার কাজ হাতে নেওয়া হল। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি শহরাঞ্চলে মহামারির ফলপ্রদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। এই পরিবেশীয় ব্যবস্থাগুলি একদিকে যেমন জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাচ্ছিল, ব্যক্তি বা জনসম্প্রদায়ের রোগ-প্রতিষেধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টাও চলছিল।

> ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে আবর্জনাকে মানুষের বৃহত্তম শত্রু বলে স্বীকার করা হয়েছিল। তার ফলে ‘স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্বন্ধীয় মহাজাগরণ’ নামে আবর্জনাবিরোধী সংগ্রাম শুরু হল।

এসময় নাগাদ বিভিন্ন রোগদায়ক জীবাণুও শনাক্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আপনারা তাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে শিখেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা রোগ-প্রতিষেধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশীয় নিয়ন্ত্রণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অনুশীলনী ৭

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন।

(ক) প্রাচীন ভারতে লোকে রোগ-প্রতিষেধের জন্য কীভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল, তার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।

....

....

(খ) শিল্পবিপ্লবের সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাবের দুটি কারণ দিন।

....

....

(গ) আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলায় রোগ কেন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল?

....

....

২২.৬.৩ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও গণস্বাস্থ্যের মূলে যে পরিবেশীয় উপাদানগুলি আছে সেগুলি হল আবাসন, জলসরবরাহ, দূষণমুক্ত বায়ু এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা। আরও একটি উপাদান হল অনাবৃত খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ। কোথায় আমরা বাস করি, কীরকম জল পান করি এবং গৃহে, কর্মস্থলে অথবা জনস্থানে কেমন পরিবেশ সহ্য করে নিতে হয়, আমাদের দেশে সীমিত আর্থিক সংগতির জন্য এজাতীয় বিষয়ে আমাদের অনেকেরই খুব বাছবিচার করলে চলে না। এগুলি অনেক সময়েই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের উপযোগী নয়। এর ওপরে, স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যব্যবস্থাসম্মত অভ্যাস সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের যথাযথ জ্ঞান নেই এবং অনেক অস্বাস্থ্যকর সামাজিক বিধিনিষেধও আছে। এসবের কারণ হল দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা, বিশেষ করে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যশিক্ষার অভাব। গড় ভারতীয়ের স্বাস্থ্যের মান খুব নীচু। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ির চারিপাশে, পথের ওপরে বা জনস্থানে আবর্জনার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার উৎসাহ আমাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। এই বিষয়ে সামাজিক কাজকর্মের অভাব আছে।

আবাসন :

আবাসন স্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আপনারা হয়তো সচেতন যে ভারতে জনগণের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আবাসনের অবস্থা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মান পর্যন্ত পৌঁছায় না। গ্রামগুলিতে কোন পায়খানা নেই বললেই চলে এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্য গ্রামগুলি অপরিষ্কার, জীবাণুসংক্রামিত জমা-জলে বেষ্টিত। লোক যত শহরে চলে যেতে থাকে, আবাসন সমস্যা ততই তীব্র হয়ে ওঠে এবং লোকেদের একটি বিশাল অংশ বস্তিতে অথবা কোন আশ্রয় ছাড়াই পথের ওপরে বাস করে। আবাসনের দৈন্য সোজাসুজি রোগের কারণ নয়, কিন্তু সংক্রমণ ও কুস্বাস্থ্যের বিস্তারে এর অবদান আছে। বাসগৃহ সূর্যালোকিত এবং উত্তম

বায়ুচলনযুক্ত হওয়া উচিত, যাতে সম্পূর্ণ জায়গাটি দিয়ে নির্মল বায়ুর মৃদুমন্দ চলাচলের নিশ্চয়তা থাকে। যথাযথ বায়ুচলন জীবাণুর গাঢ়তাকে নিরাপদ মাত্রায় কমিয়ে আনে। ফুসফুসের সংক্রমণ, ডিপ্‌থেরিয়া, হুপিং কাশি ও যক্ষ্মার মতো সংক্রামক রোগগুলি প্রায়ই আবাসনের দৈন্যের অনুষঙ্গী। বন্ধ কক্ষে জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ে। স্যাঁতসেঁতে ভাব ও আর্দ্রতাও এই রোগগুলির বিস্তার সাহায্য করে। বাসগৃহকে বড়ো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, আরশোলা, পিপীলিকা, মাছি ও মশার মতো উপদ্রব থেকে মুক্ত রাখা উচিত, কারণ তারা অনিষ্টকর জীবাণুগুলির বাহক।

জল :

আমরা সবাই জানি, উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ পানীয় জল অপরিহার্য। আমাদের দেশে বহু রোগের কারণ নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের অভাব। দুর্ভাগ্যবশত গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার শতকরা মাত্র আঠারো ভাগ মোটামুটিভাবে নিরাপদ পানীয় জল পেয়ে থাকেন। আমাদের গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের জল অর্থাৎ নদনদী, জলাধার, হ্রদ, পুষ্করিণী ও ডোবার জলের ওপরে। এগুলি সাধারণত বৃষ্টি থেকে তাদের জল পায়। বৃষ্টিবারি প্রকৃতিতে নির্মলতম জল হলেও আবহমণ্ডল দিয়ে আসার বা ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহের সময়ে দূষিত হয়ে যায়। ধুলা, ঝুলকালি, গ্যাস এবং জীবাণুর দ্বারা তার দূষণ ঘটে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের জলে এই দূষণগুলির সব কটি থাকে এবং তার ওপরে থাকে মানুষের স্নান, কাপড়চোপড় ও বাসনপত্র ধোয়া অথবা মলত্যাগের পরে শৌচক্রিয়ার মতো কাজকর্মের ফলে অতিরিক্ত কিছু দূষণ। ভূপৃষ্ঠের জলের চেয়ে কূপ, নলকূপ, ঝর্ণা বা হাতপাম্প থেকে নেওয়া জল সাধারণত ভালো হয়, কারণ এই জল ভূমির মধ্য দিয়েই পরিস্রুত হয় এবং দূষণমুক্ত থাকে, অবশ্য যদি হাতপাম্পটি অগভীর না হয় অথবা সংক্রমণের কোন উৎসের খুব কাছে না থাকে।

দূষিত জলের মাধ্যমে যে রোগগুলি ছড়ায়, তাদের নাম আপনারা ইতিপূর্বে শিখেছেন। জলসরবরাহের গুণাগুণের সঙ্গে রোগের হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে, ভারতের কয়েকটি রাজ্যে জলসরবরাহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগের হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

পানীয় জলকে অবশ্যই রোগদায়ক বস্তু এবং হানিকর রাসায়নিক দ্রব্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে। মল, নর্দমার জল, শিল্পের বর্জ্য পদার্থ, সার, কীটনাশক এবং তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অপসারণে অবহেলার দ্বারা মানুষের ক্রিয়াকলাপ জল সরবরাহকে দূষিত করে। শহরাঞ্চলে আমাদের জনসংখ্যার মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা সত্তর ভাগ খোলা মাঠে মলত্যাগ করে এবং এর ফলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের বিস্তার ঘটে বিরাট বিপদের সৃষ্টি হয়। জনস্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন হল মানুষের মলমূত্রের যথাযথ অপসারণ। নিজগৃহে পরিস্রাবণ ও ফোটানোর দ্বারা পানীয় জলকে নিরাপদ করা যায়। পরিস্রাবণ অধিকাংশ ভাসমান অপবস্তুকে অপসারণ করে। ফোটালে রোগদায়ক জীবাণুগুলি বিনষ্ট হয়।

বায়ু :

জীবনের জন্য বায়ু অপরিহার্য। কাজেই বায়ুর দূষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুদূষণের বৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী (chronic) ব্রংকাইটিস ও ফুসফুসের ক্যানসারের অনুসঙ্গ আছে। ভারতে ধুলা ও ধোঁয়ার দ্বারাই সর্বাধিক ক্ষেত্রে বায়ুর দূষণ ঘটে। সন্ধ্যাবেলায় আপনারা দেখতে পাবেন, ধুলা ও ধোঁয়ার মেঘে ছোটো ছোটো ভারতীয় গ্রামগুলি সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে দৃষ্টির অগোচরে গেছে। দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বাইয়ের মতো মহানগরিগুলিতে স্কুটার, মোটরগাড়ি ও ট্রাকের পরিত্যক্ত গ্যাসে বায়ু দূষিত হয়। জেনে বিস্মিত হবেন, দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো

একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তার চিমনি থেকে প্রত্যহ প্রায় আট টন ছাই উদ্‌গার করে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠান, মোটরগাড়ি বা ছিটানো কীটনাশক থেকে বিষাক্ত বস্তুগুলির পরিবেশে নিষ্ক্রমণ নিবারণের দ্বারা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যান্ত্রিক উপায়, অতিবেগুনি (ultraviolet) বিকিরণ, রাসায়নিক বাষ্প, অথবা কক্ষে প্রবেশকারী বায়ুর জন্য বিশেষ ফিলটার বা পরিস্রাবকের দ্বারা বায়ুকে সংক্রমণমুক্ত করা যায়।

বাসস্থানে ও কর্মস্থলে বায়ুচলন (ventilation) দূষিত বায়ুর প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে। উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অন্তর্বাহী বায়ুর গুণও বায়ুচলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এটি সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ দান করে। আমরা জানি যে সবুজ উদ্ভিদ বায়ুকে নির্মল করে। বড়ো শহরে সবুজের বেষ্টনী বাড়ানো উচিত, কারণ এগুলি পরিবেশের নিজেকে শোধনের শক্তি বর্ধিত করে। বাড়ির চারিদিকে সবুজ গাছ লাগানোর অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

বিকিরণ :

উচ্চমাত্রায় বিকিরণ মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরদুটিতে প্রথম যে দুটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল, তাদের ধ্বংসলীলার সম্বন্ধে জানেন কী? সেগুলি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল এবং আরও অনেককে ভীষণভাবে আহত করেছিল। তীব্র বিকিরণে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলাফল মানবদেহে জ্বলন বা ক্যানসারের আকারে আবির্ভূত হতে বহু বছর নিয়েছিল। যেসব মায়েরা তীব্র মাত্রার বিকিরণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রসূত শিশুদের দেহে দুই দশক পরে ফলাফল দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল।

বিকিরণ মানুষের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে, পার্থিব ও আবহমণ্ডলীয় পরিবেশ থেকে এবং দেহকলায় লেশমাত্র পরিমাণে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম, স্ট্রন্সিয়াম ও কার্বন থেকেও আমরা সর্বক্ষণ কিছু তেজস্ক্রিয়া পাই। কুড়ি কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায় মহাজাগতিক বিকিরণ অনেক বেশি শক্তিশালী। যদিও আমরা আমাদের দেহের ওপরে এই নৈসর্গিক বিকিরণের কোন তাৎক্ষণিক কুফল দেখতে পাই না, কেউ নিশ্চিত হতে পারে না যে এগুলির দীর্ঘকালীন ফলাফল নেই।

তা ছাড়া আধুনিক যুগে বিকিরণের মানবসৃষ্ট উৎসগুলিও আছে, যেগুলি আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। রোগনিদানের জন্য চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা সংক্রান্ত এক্‌স্-রে রোগী, চিকিৎসক ও কর্মীদের ওপরে কুফল বিস্তার করে। টেলিভিশন সেট, তেজস্ক্রিয় ডায়ালের হাতঘড়ি এবং দীপ্তিমান চিহ্ন দেওয়ার উপকরণ মানুষের পরিবেশে অল্প পরিমাণে বিকিরণ যোগ করে; অন্যদিকে ঠিকমতো অপসারিত না হলে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের আবর্জনা মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে বিরাট ঝুঁকি হয়ে ওঠে। পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা বড়ো বিকিরণজনিত বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

এক্‌স্-রে, গামা রশ্মি এবং অ্যাল্‌ফা ও বিটা কণা দেহকলা ভেদ করে এবং সেগুলিকে আহত করে। বিকিরণের মোট যে মাত্রায় দেহ উদ্‌ঘাটিত হয়, তার সঙ্গে ক্ষতির ব্যাপ্তির সম্পর্ক আছে। উচ্চতর মাত্রায় তৎক্ষণাৎ এবং মারাত্মক কুফল ঘটে। রক্তকোশগুলির ওপরে কুফল পড়ে এবং পেশি শিথিল হয়ে যায়। বিকিরণজনিত তীব্র অসুস্থতা সুবিবৃত রোগ। কিছুটা নিম্নতর মাত্রায় বিলম্বিত ফলাফল দেখা যায়। এগুলির ফলে কতকগুলি কোশ সাধারণ অবস্থার চেয়ে দ্রুততর বিভাজিত হয়। এ থেকে লিউকিমিয়া বা অন্যান্য মারক টিউমারের মতো নানাপ্রকার ক্যানসারের সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিকিরণে উদ্‌ঘাটিত ব্যক্তির জীবনকালের মধ্যে কতকগুলি ক্ষতি বুঝতে পারা যায় না; সেগুলি আগামী প্রজন্মগুলিতে পরিস্ফুট হয়।

অন্যান্য কারণ :

আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করার মতো অন্য কতকগুলি পরিবেশীয় উপাদানও আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

উচ্চতা : অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিতির ফলে তীব্র উচ্চতাজনিত রোগ (mountain sickness) দেখা দেয়; এর লক্ষণগুলি হল মাথাব্যথা, অনিদ্রা, শ্বাসকষ্ট, বমনেচ্ছা, বমি হওয়া এবং দৃষ্টিশক্তির অবনতি। অধিক উচ্চতায় ফুসফুসের তীব্র শোথ (acute pulmonary oedema) একটি গুরুতর অবস্থা এবং চার হাজার মিটারের ওপরে দেখা যায়। এতে রোগীর কাশি, অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, মানসিক বিভ্রম, মায়া (hallucination), এমনকি আচ্ছন্নতাও (coma) ঘটে থাকে।

আমরা জানি যে দিনের মধ্যে বিভিন্ন ঋতুতে এবং নানা স্থানে উষ্ণতার পার্থক্য ঘটে। এটি উচ্চতার ওপরে নির্ভর করে। বায়ুপ্রবাহের দিক এবং সমুদ্রের নৈকট্যও একে প্রভাবিত করে। যাই হোক, দেহের দ্বারা লব্ধ তাপ দেহ থেকে হারানো তাপের সঙ্গে পরিমাণে সমান হওয়া উচিত। অত্যুচ্চ বা অতিনিম্ন উষ্ণতা কেবল অস্বাচ্ছন্দ্যই ঘটায় না, অধিকন্তু মানুষ তাপপীড়নের (heat stress) ফলে বহু অসুস্থতায় ভোগে। মানবদেহে তাপের কয়েকটি ফলাফল হল তাপজনিত অবসন্নতা, তাপজনিত আক্ষেপ (cramp), তাপপ্রসূত তীব্র জ্বর বা তাপাঘাত (heat stroke)। পক্ষান্তরে তীব্র শৈত্যে উদ্‌ঘাটনের ফলে তুষারক্ষেত (frost bite) হতে পারে। দেহকে দ্রুত শীতল অর্থাৎ হিমায়িত করলে দেহের রোগজীবাণু প্রতিরোধের শক্তি হ্রাস পায়। এজন্যই শীতল বাতাসে বসে থাকলে লোকের সর্দি হয়।

অত্যধিক শব্দ কেবল বিরক্তি ও মানসিক পীড়নই ঘটায় না, অধিকন্তু এর ফলে বধিরতা, বাক্‌বন্ধতা (interference with speech) এবং প্রতিকূল শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনও উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী ৮

(ক) আবাসনের দৈন্যের ফলে যে রোগগুলি ছড়ায়, তাদের তালিকা দিন।

....

....

(খ) খোলা মাঠে মলত্যাগের ফলে কীভাবে কলেরা ছড়ায়?

....

....

(গ) আমাদের স্বাস্থ্যের ওপরে বিকিরণের কয়েকটি ফলাফল সম্বন্ধে লিখুন।

....

....

২২.৭ ভারতে স্বাস্থ্যপরিসেবা

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলির দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা বহু পরিমাণে নির্ধারিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রীতিপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সিন্ধু উপত্যকার যুগে পরিবেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার (sanitation) মান খুবই উন্নত ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগের মহেন-জো-দারো শহরে জনস্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সুযোগ-সুবিধা ছিল। প্রায় সব গৃহস্থপরিবারের স্নানাগার, শৌচাগার,

পায়খানা ও সযত্ননির্মিত কূপ ছিল। তাঁদের স্বাস্থ্যসমস্যার প্রকৃতি অনুমান করা কঠিন হলেও সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে স্বাস্থ্য-পরিসেবার প্রতিষেধক দিকগুলির বিষয়ে তাঁদের বিরাট আগ্রহ ও গুরুত্বদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আপনারা একক ৩-এ শিখেছেন, বৈদিক যুগে চিকিৎসাবিদ্যা "জাদু-ধর্মীয়" দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুক্তিবাদী পদ্ধতিতে উত্তরণের তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সেযুগের লোকে বুঝেছিলেন যে দৈহিক পদার্থ ও পরিবেশীয় পদার্থের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া (interaction) দেহের অসুস্থতা বা সুস্বাস্থ্য নির্ধারণ করে।

এ ছিল অবিকল সেরকম যা আমরা বর্তমান কালে রোগ সম্বন্ধে বুঝি, অর্থাৎ মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ফলে রোগ হয়। অতএব দেখছেন যে পরিবেশের ওপরে অর্থাৎ রোগপ্রতিষেধের দিকটির ওপরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভারতের স্বর্ণযুগে স্বাস্থ্যের প্রতিষেধক (preventive) দিক সম্বন্ধে এই রীতি অব্যাহত ছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞানের অবনতির যুগে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিরও বৃদ্ধি রহিত হয়েছিল। এর ওপরে ঔপনিবেশিক যুগে জীবনধারায় সম্পূর্ণ ছেদ ঘটেছিল। বহু শতাব্দী ধরে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যে রীতিনীতি আমরা বিকশিত করেছিলাম, সেগুলি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। চিকিৎসাকে এখন অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজেই আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটিই সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হল। তা ছাড়া ঔপনিবেশিক শোষণ দারিদ্র্যকে বাড়িয়েছিল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর পরিবেশীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে রোগ প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে চিকিৎসার যে পাশ্চাত্য পদ্ধতি বিবর্তিত হয়েছিল, আমাদের দেশবাসীরা তা থেকেও বঞ্চিত ছিল, কারণ তার ব্যবহার ঘটেছিল কেবল স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান ও শহরবাসী মানুষের প্রয়োজনে। ভারতীয় বাজারে শুধুমাত্র তাদের পণ্যই বিক্রয়ের জন্য পশ্চিমি ঔষধ উৎপাদকদের প্রয়াস ভারতীয় পদ্ধতির চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনাস্থার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতার সময়ে সারা দেশে রোগ ও অপুষ্টির প্রকোপ ছিল। কাজেই জনগণের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে এবং দেশে স্বাস্থ্যসেবার প্রসারে কতকগুলি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সরকার নানা নীতি, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং সময়সূচি রচনা করলেন। অবশ্য দুই দশক পরে এসব কর্মসূচির বিশ্লেষণে দেখা গেল, অতি অল্পই ফললাভ ঘটেছে। ১৯৮৩ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, দেশের জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যচিত্র এখনও গুরুতর ও জরুরি চিন্তার কারণ। জনসংখ্যা, নারী ও শিশুর মৃত্যুহার, অপুষ্টি, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠের মতো সংক্রামক রোগ, অভাবজনিত রোগ, নিরাপদ পানীয় জল, পরিবেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানে আমরা অসমর্থ হয়েছি।

তদুপরি একথাও উপলব্ধি করা হল যে, এসব কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছে একারণে যে আমরা রোগের প্রতিষেধের চেয়ে রোগের নিরাময়ে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলাম। অন্যকথায়, আমাদের স্বাস্থ্য সেবাগুলির জন্য পশ্চিমি মডেলের ভিত্তিতে আমরা একটি 'নিরাময়মুখী দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রহণ করেছিলাম।

আমাদের অধিকাংশ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বৈশিষ্ট্যে এখনও প্রধানত নিরাময়মুখী রয়ে গেছে এবং স্বাস্থ্য-পরিসেবার প্রতিষেধক ও উন্নয়নমূলক দিককে অবহেলা করা হয়েছে। আমাদের গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনুপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। উন্নত উপকরণে সুসজ্জিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলি প্রধানত আমাদের সমাজের শহরবাসী উচ্চশ্রেণিরই সেবা করছে। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে আমাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮.৫ কোটি, যার মধ্যে ১৬ কোটি (শতকরা ২৩ ভাগ) শহরাঞ্চলে এবং ৫২.৫ কোটি (শতকরা ৭৭ ভাগ) গ্রামাঞ্চলে বাস করত। কিন্তু সারণি ২২.৪ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নাগরিক ও গ্রামীণ ভারতে হাসপাতাল

ও ঔষধালয়ের সংখ্যা এবং তাদের শয্যাসামর্থ্য সেই অনুপাত থেকে অনেক পৃথক। এসব উপাত্ত থেকে আমরা হিসাব করতে পারি যে হাসপাতালগুলির শতকরা ৭৯ ভাগ এবং শয্যাগুলির শতকরা ৮৬ ভাগ শহরঞ্চলে অবস্থিত। স্বাস্থ্যসেবায় লোকবলের পরিসংখ্যানে চিকিৎসক ও উপ-চিকিৎসক (paramedical) কর্মীর সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৫ সালে দেশে ৩,০৬,৯৬৬ জন চিকিৎসক, ৯,৫৯৬ জন দন্তচিকিৎসক এবং ১,৯৭,৭৩৫ জন পরিসেবিকা নথিভুক্ত ছিলেন।

সংখ্যার বিরাট বৃদ্ধি সত্ত্বেও চিকিৎসকেরা এখনও শহরভিত্তিক রয়ে গেছেন এবং যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রয়োজন সর্বাধিক, তাঁরা চিকিৎসকদের ব্যাপারে বঞ্চিত রয়েছেন, অধিকাংশ গ্রামে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ অথবা বুনিয়াদি স্বাস্থ্যব্যবস্থাও নেই (সারণি ২২.৫)।

সারণি ২২.৪ : গ্রাম ও শহরাঞ্চলে চিকিৎসা পরিসেবার পরিসংখ্যান (১৯৮৭)

সংখ্যা	মোট	শহরাঞ্চলীয়	গ্রামীণ
হাসপাতাল	৭৭৬৪	৬১৩১	১৬৩৩
হাসপাতালে শয্যা	৫৫৫২৪৬	৪৭৮৯১০	৭৬৩৫৪
ঔষধালয়	২৫৮৭৯	১২১১০	১৩৭৬১
ঔষধালয়ে শয্যা	৩৯৪৮৩	১১০৬০	২৮৪২৩

"ভারতে বিজ্ঞানের অপরিহার্য ভূমিকা হল অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং সামাজিক রূপান্তর আনয়নের শক্তিশালী যন্ত্ররূপে কাজ করা, যাতে লক্ষ লক্ষ লোক দীর্ঘতর ও সুখী জীবন যাপন করতে পারে।"

—জওহরলাল নেহরু, বিজ্ঞান কংগ্রেস, ১৯৪৭

সারণি ২২.৫ : ভারতের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জলসরবরাহ এবং পরিবেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা

শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার সেবিত অংশ

	শহরাঞ্চলীয়	গ্রামীণ
জলসরবরাহ	৮২	৩৩
পয়ঃপ্রণালীতন্ত্র	২৭	—
শৌচাগার	উপাত্ত পাওয়া যায়নি	২

স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিকাশপ্রাপ্ত সুসমন্বিত গ্রামীণ স্বাস্থসেবা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার প্রাতিষ্ঠানিক মেরুদণ্ডস্বরূপ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভূমিকা হল জনসংখ্যার ক্ষুদ্রতম এককটিতে স্বাস্থ্যসেবাকে পৌঁছে দেওয়া। পরিসেবিকা, ধাত্রী, স্বাস্থ্যপরিদর্শক প্রভৃতির মতো আনুষঙ্গিক উপ-চিকিৎসক (paramedical) কর্মীসহ ১৯,৬৪০ জন চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ১৪,১৪৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৯৮,৯৮৭টি উপকেন্দ্র আছে। সারা দেশে বিস্তৃত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির এই বিশাল জালিকা 'অ্যালমা আটা ঘোষণা'য় বিবেচিত "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" বাস্তবায়িত করার চাবিকাঠি। সারণি ২২.৬-এ মৃত্যুহার নির্দেশকগুলির ভিত্তিতে নাগরিক ও গ্রামীণ ভারতে স্বাস্থ্যের মান দেখানো হয়েছে। এই ফলাফলগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ক্রিয়ার অপ্রতুলতার প্রতিফলন।

সারণি ২২.৬ : নাগরিক ও গ্রামীণ ভারতে স্বাস্থ্যের মানের পরিসংখ্যান

	জনসংখ্যার প্রতি হাজারে বার্ষিক হার		
	মোট	শহরাঞ্চলীয়	গ্রামীণ
জন্মহার	৩৩.৭	২৩.৩	৩৫.৩
মৃত্যুহার	১১.৯	৭.৯	১৩.০
শিশুমৃত্যুহার	১০৬	৬০	১২২

"২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) এটির সূচনা করেন এবং ১৯৭৮ সালের সালে তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার অ্যাল্মা আটায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিকগ সম্মেলনে এটি পুনর্ঘোষিত হয়। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের এরকম সংজ্ঞা দেওয়া হয় : "স্বাস্থ্যের এমন একটি মান যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রদ জীবনযাপনে সমর্থ করবে"।

গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর জনসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তির ও পরিবারের যে অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি মোটের ওপর তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তার পরিবর্তে "নিরাময় কেন্দ্র" অর্থাৎ হাসপাতাল ও ঔষধালয়গুলির ওপরে নির্ভরতা বৃদ্ধির বিষয়ে এগুলির প্রবণতা থেকেছে। আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলির এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম এমন যে বইপত্র, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, এমনকি চিন্তাধারার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলির ওপরে আমরা বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল।

জনসম্প্রদায়কে তার নিজস্ব স্বাস্থ্যসমস্যাগুলির সমাধানে জড়িত করার জন্য সম্প্রতি একটি "বহুবিদ্যানির্ভর (multidisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছিল। এর জন্য জীবচিকিৎসাবিদ্যার (biomedical) ও সমাজবিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য বহু সমাজবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পাশ্চাত্য কর্মধারা "আধুনিক, উত্তম ও অভিপ্রেত" এবং সেগুলিকে গ্রহণ করা উচিত।

বস্তুত গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে ব্যাপকতর সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আশু প্রয়োজন আছে। কীভাবে লোকে তাদের স্বাস্থ্যসমস্যাগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করে, তা জানা প্রয়োজন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের কাছে এই সমস্যাগুলির অর্থ কী? স্বাস্থ্যসেবাগুলির কর্মসূচি ও সম্পাদন এমন হওয়া উচিত যে জনসম্প্রদায়টির প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে সেগুলির মিল হয়। শহর বা গ্রাম যেখানেই বাস করুক, সকল নাগরিকের চিকিৎসাবিষয়ক প্রয়োজন পূরণে পাশ্চাত্য, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সকলকে নিয়ে সুসংবদ্ধ দল গঠন করা উচিত। এভাবে বিশেষত গ্রামীণ ভারতের স্বাস্থ্যসেবার জন্য আমাদের নিজস্ব মডেল বিবর্তন ও ব্যবহার করতে হবে। মডেলটি এমন হওয়া উচিত যে সেটি জনসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বনির্ভরতায় উৎসাহ দেয়। মানুষের সংগতির মধ্যে জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং যথাযথ পুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

অনুশীলনী ৯

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা? প্রদত্ত প্রকোষ্ঠে সত্যের ক্ষেত্রে 'স' এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে 'মি' লিখে তার ইঙ্গিত দিন।

(ক) সিন্ধু উপত্যকার যুগে যেমন ছিল, ভারতের বর্তমান জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার মাত্রা তার বিপরীত। ☐

(খ) আধুনিক ঔষধের সুলভতার জন্য ঔপনিবেশিক যুগে জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। ☐

(গ) আমাদের গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রয়োজনের জন্য "নিরাময়মুখী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি" অনুপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। ☐

(ঘ) আমাদের গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথির মতো চিকিৎসার পুরাতন প্রথাগত পদ্ধতিগুলি তুলে দেওয়া প্রয়োজন। ☐

(ঙ) স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলিতে গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সাফল্য নির্ভর করে। ☐

২২.৮ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি, কীভাবে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিকাশ রোগের রহস্য উদ্‌ঘাটনে এবং লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষায় সহায়তা করেছে। আপনারা শিখেছেন যে,

- বিভিন্ন প্রকার জীবাণুই সংক্রামক রোগগুলির কারণ।
- পরিবেশে বিদ্যমান জীবাণুগুলি বায়ু, জল ও খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশলাভ করে। তারা দেহে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। অসুস্থ ব্যক্তি জীবাণুগুলিকে বৃহত্তর সংখ্যায় পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে বহু ব্যক্তিকে সংক্রামিত করে।
- আমাদের দেহের একটি সুরক্ষাতন্ত্র আছে, যেটি রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম। আধুনিক ঔষধ আমাদের সুরক্ষাতন্ত্রকে সাহায্য করে।
- মানুষ ও তার পরিবেশের সাম্যে ব্যাঘাতের ফলে রোগ হয়। আমাদের জনগণের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের জন্য নির্মল পানীয় জল, বসবাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং যথাযথ স্বাস্থ্যব্যবস্থার (sanitation) প্রয়োজন।
- ভারতে স্বাস্থ্যপরিসেবার নিরাময়মুখী দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র সীমিত উদ্দেশ্যেই সাধন করতে পেরেছিল। গ্রামাঞ্চলে রোগপ্রতিষেধের জন্য স্বাস্থ্যপরিসেবা ব্যবস্থার সংগঠনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশীয় দিকগুলির সঙ্গে জড়িত এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

২২.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১. নিম্নলিখিত রোগগুলির কারণস্বরূপ জীবাণুর নাম লিখুন।

রোগ	রোগদায়ক জীবাণু
(১) কলেরা	
(২) দাদ	
(৩) এড্‌স্	
(৪) চিকেন পক্‌স্	
(৫) ম্যালেরিয়া	
(৬) চোখ ওঠা	
(৭) গিনি কৃমি	

২. আপনার এলাকায় সমীক্ষা করে বিগত ছয় মাসে কোন কোন সংক্রামক রোগের প্রকোপ ঘটেছিল, তা নির্ণয় করুন। এসব রোগের বিস্তারে পরিবেশীয় উপাদানের অবদান থাকলে তা লিখুন।

....

....

৩. রোগপ্রতিরোধ টিকাদান কীভাবে সাহায্য করে, তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

২২.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (ক) স্বাস্থ্যবান, যথাযথ, (খ) বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভীয়

২. (ক) (১) মি (২) স (৩) মি
   (খ) আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখতে সারণি ২২.১ ব্যবহার করুন।

৩. (ক) মি (খ) মি (গ) স (ঘ) মি

৪. (ক) (১) মি (২) স (৩) মি (৪) স (৫) স (৬) স
   (খ) (২) ত্বক (২) স্বাস্থ্যবান (৩) খাদ্য, জল, জীবাণুবাহী আঙুল

৫. (ক) গ্রাস করা, অ্যান্টিবডি, টক্সিন (খ) সুরক্ষাতন্ত্র (গ) প্রহরী, সংবাহিত (ঘ) পরাস্ত (ঙ) বিনাশ (চ) দুর্বল, দেহ, প্রশিক্ষণ

৬. (ক) বায়ু (খ) খাদ্য, জল, মাছি (গ) বায়ু (ঘ) বায়ু (ঙ) জল (চ) বায়ু (ছ) বায়ু (জ) মশা

৭. (ক) আহারের আগে ও পরে হাতধোয়া
   স্নান করার পরেই শুধু রান্নাঘরে প্রবেশ করা
   (খ) শিল্পবিপ্লবের সময়ে শ্রমিকেরা অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় বাস করছিলেন। কোন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল না। গৃহের সামনে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠত এবং কসাইখানা বাড়িগুলি মাছিতে পূর্ণ থাকত।
   (গ) কতকগুলি রোগ আবর্জনার ওপরে প্রজননকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয়ে থাকে। আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলায় ব্যাকটেরিয়ার প্রজননক্ষেত্র অপসারিত হয়ে রোগনিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়েছিল।

৮. (ক) ফুসফুসের সংক্রমণ, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি।
   (খ) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মনে কলেরার ব্যাকটেরিয়া বেরিয়ে আসে। রোগী খোলা মাঠে মলত্যাগ করলে নগ্নপদ, বৃষ্টিজল বা অন্যান্য উপায়ের দ্বারা ব্যাকটেরিয়া জলসরবরাহের নিকটতম উৎসে বাহিত হয়। এই জল পান করে লোকে সংক্রামিত হয়।
   (গ) বিকিরণ এগুলি ঘটায় :
   (১) লিউকিমিয়া ও প্রাণনাশী টিউমারের মতো নানা ধরনের ক্যানসার। (২) দেহকলার ক্ষতি।

৯. (ক) স (খ) মি (গ) স (ঘ) মি (ঙ) স

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১. (১) ব্যাকটেরিয়া (২) ছত্রাক বা ফাংগাস (৩) ভাইরাস (৪) ভাইরাস (৫) এককোশি প্রাণী বা প্রোটোজোয়া (৬) ভাইরাস (৭) কৃমি।

২. টিকাদান কোন সংক্রমণের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অর্জনের একটি উপায়। সুরক্ষাতন্ত্রকে উদ্দীপিত করার জন্য দুর্বল বা মৃত ব্যাকটেরিয়ার একটি নমুনা দেহে প্রবেশ করানো হয় এবং তার ফলে ব্যাকটেরিয়াটির মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ প্রকার শ্বেতকণিকা উৎপন্ন হয়। এরকম শ্বেতকণিকায় এক ধরনের স্মৃতিশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ওই বিশেষ আক্রমণকারীটির ভবিষ্যৎ আক্রমণের প্রতিরোধ করতে প্রশিক্ষিত কোশ রূপে এই শ্বেতকণিকাগুলি সংরক্ষিত থাকে।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.-১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
৬

একক ২৩ মন ও দেহ	১০৯-১২৭
একক ২৪ আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক দিক	১২৮-১৪৯
একক ২৫ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৫০-১৬৭
একক ২৬ যোগাযোগের পদ্ধতি	১৬৮-১৮৮

পর্যায় ৬ : তথ্য, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি

প্রকৃতির রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটনে মানুষের সরল কৌতূহলের ফলে কীভাবে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের উৎপত্তি ঘটে, সেবিষয়ে পর্যায় ৩-এ আপনাদের একটা ধারণা দিয়েছিলাম। বিশ্বের উৎপত্তি ও জীবের অভিব্যক্তির রহস্যভেদের প্রয়াসগুলি সম্বন্ধে আপনাদের বলেছিলাম।

বর্তমান পর্যায়ে আমরা প্রথমে প্রকৃতির অন্য একটি রহস্য অর্থাৎ মানুষের মন ও দেহের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বুঝতে চেষ্টা করব এবং মন ও দেহের মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফলে কী ভাবে আচরণের সৃষ্টি হয় তা দেখব। আমরা মানুষের নার্ভতন্ত্র বর্ণনা করছি। মানবদেহের কেন্দ্রীয় অংশটি হল মস্তিষ্ক—বিশ্বে জটিলতম তন্ত্রগুলির অন্যতম। কম্পিউটারের চেয়ে এটি অনেক জটিলতর। বস্তুত কম্পিউটার মানবমস্তিষ্কের উদ্ভাবনশক্তির ফসল। মস্তিষ্কেই মানুষজন, ঘটনা এবং সর্বোপরি নিজেদের বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়ার অধিষ্ঠান। আমরা নার্ভতন্ত্রকে এমন একটি যোগাযোগের জাল বলে ভাবতে পারি, তথ্য নিয়ে যার কাজ। আমরা যা জানি, শিখি ও ভাবি, সকল কিছুই নার্ভতন্ত্রের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই যে নার্ভতন্ত্র আণাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে, তার বিশ্লেষণ ও সম্পূরণ করে এবং অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রসঙ্গে তার মূল্যায়ন করে। সবশেষে নার্ভতন্ত্র সেই তথ্য ব্যবহার করে যথোপযুক্ত আচরণ ব্যক্ত করে। কৈশোরের সময়ে হরমোনঘটিত যে পরিবর্তনগুলি বালকবালিকাকে প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হতে সক্ষম করে, সেগুলিও আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার পরে আমরা আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক দিকগুলি আলোচনা করব। কোনও ব্যক্তির শিক্ষা, চিন্তা, সৃজনশীল কাজকর্ম ও বুদ্ধি কী ভাবে তার আচরণকে আকার দেয়, আমরা তা ব্যাখ্যার প্রয়াস করব। ব্যক্তিকে যেসব দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়, তার জীবনে বহু আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্য সেগুলির সঙ্গে যুক্ত; এগুলি আক্রামক মানসিকতার কারণ। কাজেই আমরা দেখতে পাই, যে কোনও আচরণই দেহের শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের ফল এবং তা নির্ভর করে ব্যক্তির আহৃত তথ্য ও জ্ঞানের উপরে।

তথ্য হল কোনও ঘটনা বা ক্রিয়া সম্বন্ধে একজন থেকে অন্যজনে বাহিত বাস্তব সংবাদ অথবা মানবীয় চিন্তা। কিন্তু যোগাযোগ ব্যতীত তথ্য পরিবাহিত হতে পারে না। তথ্য হল বিষয়বস্তু এবং যোগাযোগ হল তাকে বহন করার আধার। সভ্য সমাজের পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ অপরিহার্য। বোধ হয়, মানবসভ্যতার একটি মুখ্য পদক্ষেপ ছিল যোগাযোগের ক্ষমতা—প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের সমাজে যোগাযোগের আবশ্যকতা, ক্রিয়া ও ভূমিকাতেও আমরা মনোনিবেশ করেছি।

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেওয়ার পরে আমরা এই পর্যায়ের শেষদিকে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। বেতার, দূরদর্শন, উপগ্রহ, ভিডিও রেকর্ডার, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা সবিস্তারে বিবেচিত হবে। তথ্যকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তারের সমস্যাটিকে আমরা বিষয়মুখী ভাবে বিচার করি। আমাদের জনসমষ্টির সকল নাগরিক ও বিভাগকে তাদের অধিকার, আনুকূল্য ও প্রাপ্য সুযোগগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করতে হবে। এসব তথ্য থেকে জনগণকে বঞ্চিত রাখা নিজ মৌলিক অধিকারগুলি প্রয়োগের সামর্থ্য থেকে

তাদের বঞ্চিত করার তুল্য হবে। আন্তর্জাতিক স্তরেও তথ্যের যুক্তিযুক্ত ও নিরপেক্ষ বণ্টন হওয়া উচিত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এই দাবি একটি 'নূতন বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ নির্দেশ' (New World Information and Communication Order) সম্বন্ধে আহ্বানে ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পর্যায়টি পাঠের পরে আপনাদের এগুলি করতে পারা উচিত :

- মানুষের নার্ভতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করা,
- মানুষের মনস্তত্ত্ব ও আচরণের নানা দিক বিশ্লেষণ করা,
- যোগাযোগের নানা পদ্ধতি এবং তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতে চলিত বিকাশগুলি এবং তাদের সামাজিক অভিঘাত বর্ণনা করা,
- শিক্ষা, পরিকল্পনা, নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণে তথ্যের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা,
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাগের মধ্যে তথ্যের যুক্তিযুক্ত ও নিরপেক্ষ বণ্টনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

একক ২৩ □ মন ও দেহ

গঠন

২৩.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২৩.২ দেহমন প্রশ্ন
২৩.৩ নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াগত একক—নিউরন
২৩.৪ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র
মস্তিষ্ক
সুষুম্নাকাণ্ড
২৩.৫ প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র
প্রতিবর্ত
স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র
২৩.৬ হরমোনতন্ত্র
২৩.৭ সারাংশ
২৩.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২৩.৯ উত্তরমালা

২৩.১ প্রস্তাবনা

আপনি কি জানেন যে বিশ্বের জটিলতম তন্ত্রগুলির মধ্যে একটি রয়েছে আপনার নিজের মাথার ভিতরে? বহু শতাব্দী ধরে মানুষের নির্মিত নানা যন্ত্রের সঙ্গে মস্তিষ্ককে তুলনা করা হয়েছে—সবচেয়ে সম্প্রতি অবশ্য তুলনা করা হয়েছে কম্পিউটারের সঙ্গে। কম্পিউটারের ক্রিয়াকলাপ দ্রুত হলেও এই বিচারে সীমিত যে, কোনও মানুষের দেওয়া কার্যক্রম অনুসারেই কম্পিউটার কাজ করে। কোটি কোটি নার্ভকোশ জটিলভাবে যুক্ত হয়ে মস্তিষ্ককে তথ্য গ্রহণ, সঞ্চয়, স্মরণ ও বিশ্লেষণের এবং নূতন চিন্তার সামর্থ্য দান করে, তাই কোনও যন্ত্রই মস্তিষ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। যাকে বুদ্ধিমান কম্পিউটার বলা যেতে পারে, তার সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীরা খুব কঠিন প্রয়াস করছেন। কিন্তু সে তো অন্য কাহিনি।

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, দার্শনিকদের কাছে মন ও মানসিক পদ্ধতিগুলি সব সময়েই চিত্তাকর্ষক ও বিতর্কিত বিষয় রয়ে গেছে। মোটামুটি সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পর্যন্ত মনের প্রকৃতি অথবা তার সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়ার সম্বন্ধের বিষয়ে আমরা বেশি কিছু জানতাম না বা বুঝতাম না। এমনকি আত্মিক বলে বিবেচিত মনের সঙ্গে পার্থিব বলে বিচারিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধের বিষয়েও বিতর্ক ছিল।

এই এককটিতে আমরা দেহমন সম্পর্কের প্রাথমিক বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ এবং মানবীয় নার্ভতন্ত্র ও তার ক্রিয়াকলাপের ভৌত বর্ণনার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাব। আমাদের সকল চিন্তার এবং মানুষ, ঘটনা ও সর্বোপরি নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়ার অধিষ্ঠানস্বরূপ মস্তিষ্কের উপরে বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত আমরা নার্ভতন্ত্রের অন্য এমন সব অংশও বিবেচনা করব, যেগুলি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এবং দেহের অবশিষ্টাংশের মধ্যে বার্তা বহন করে।

আচরণ বোঝার জন্য দেহের অন্য যে কতিপয় অংশের গুরুত্ব আছে, সেগুলি হল কয়েকটি গ্রন্থি। এগুলি হরমোন নামে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষরণ করে, দৈহিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে সেগুলি অংশ নেয়। এই এককটতে আপনারা যা পড়ছেন, মানুষের আচরণ এবং শৈশব থেকে শুরু করে তার মনের বিকাশ সম্বন্ধে একক ২৪-এ আরও শেখবার জন্য তা একটি বনিয়াদ তৈরি করবে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ার পরে আপনাদের পারা উচিত :

- নার্ভকোশের গঠন ও ক্রিয়া বর্ণনা করতে,
- মানবীয় নার্ভতন্ত্রের সাধারণ সংগঠন ও মুখ্য অংশগুলি এবং তার কাজকর্ম বর্ণনা করতে,
- মস্তিষ্কের অংশগুলি শনাক্ত করতে এবং মানুষের চেতনা, প্রতিক্রিয়া ও দৈহিক ক্রিয়াগুলি কীভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার বিবরণ দিতে,
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া চিনতে এবং তার সংজ্ঞা দিতে,
- হরমোনগুলি ও নার্ভতন্ত্র যে দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলির সমন্বয়সাধনে একত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং ব্যক্তির আচরণকেও প্রভাবিত করে, তা উপলব্ধি করতে,
- এই বিষয়টি যে বিশাল এবং আপনার জ্ঞান যে মাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের, তা উপলব্ধি করতে।

২৩.২ দেহমন প্রশ্ন

বৈদিক যুগে ভারতে দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিল, 'আত্মা', 'মানস', 'ইন্দ্রিয়ান' ও 'শরীর' দিয়ে মানুষ গঠিত। 'শরীর'কে বিবেচনা করা হত তার নানা অংশে অবস্থিত 'ইন্দ্রিয়ান'গুলির ভিত্তিস্বরূপ। 'মানস' ছিল দেহে বিদ্যমান বলে বিবেচিত এগারোটি অঙ্গের অন্যতম এবং তাকে স্মৃতি, জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতির অঙ্গরূপে বিবেচনা করা হত। ভাবা হত, 'আত্মা' জ্ঞানলাভে, অনুভব করতে এবং ক্রিয়া করতে সক্ষম, কিন্তু 'মানস', 'ইন্দ্রিয়ান' ও 'শরীর' ব্যতীত 'আত্মা' কাজ করতে অপারগ। পরবর্তী যুগগুলিতে যোগ ও তন্ত্র মস্তিষ্ক এবং নার্ভগুলিকে আত্মার অঙ্গ হিসাবে দেখতে শুরু করল। অবশ্য মনকে সব সময়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। শ্রবণ, দর্শন, অভিলাষ ও প্রত্যয়ের মতো সকল ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব তার উপরে অর্পিত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ দৃঢ় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে দৈহিক ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে লাগল। মানসিক ক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে বিবেচিত হল। স্বীকার করা হল যে দেহ ব্যতীত মনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; বিশ্ব ও তার দৃশ্য, শব্দ এবং গন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বোধ সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত সংজ্ঞাতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের দ্বারা।

আপনারা হয়ত দেখতে পাচ্ছেন, মন ও মানসিক ক্রিয়ার বিষয়ে প্রাচীন ও দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে আমাদের দেওয়া বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে দার্শনিকদের সম্পর্কে সুবিচার করা যায় না। কিন্তু মানবেতিহাসের সহস্র সহস্র বৎসর ধরে মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে লোকে কী ভেবেছে, তার বিস্তারিত বিববরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য, মানুষের মন ও আচরণ সম্বন্ধে বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কী জানা আছে, সংক্ষেপেই তা আপনাদের জানানো।

> আপনারা এটা জানতে আগ্রহী হবেন যে প্রাচীনকালে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা এবং তার ভিতরে কী আছে তা দেখা ধর্মবিরোধী কাজ বলে বিবেচিত হত। প্রথম যুগের চিকিৎসকেরা অভ্যন্তরীণ গঠন অনুসন্ধান করতে ছাগল ও শূকরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে কবরস্থানে গিয়ে মৃত মানবদেহ কাটাছেঁড়া করতেন। ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারের জায়গায় এল যুক্তিবাদ এবং চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ করা অনুমোদনযোগ্য হল। এভাবে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ তন্ত্রগুলি জানা গেল।

মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও প্রান্তীয় নার্ভগুলি নিয়ে গঠিত নার্ভতন্ত্রের দ্বারা মানবদেহের সম্পূর্ণ ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধিত হয়। মস্তিষ্কের কাজকর্ম দীর্ঘকাল এক রহস্য রয়ে গিয়েছিল। মস্তিষ্কের অর্বুদ (টিউমার) বা অন্যান্য দৈহিক ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত রোগে পীড়িত ব্যক্তিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বহু তথ্য একত্র গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই আজও আমরা জানি না। অবশ্য মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ যেসব পৃথক পৃথক নার্ভকোশে গঠিত, সেগুলির ধর্ম এখন ভালোভাবেই জানা গেছে। এসকল ধর্ম থেকে আমরা সম্পূর্ণ নার্ভতন্ত্রের চালনা ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি।

২৩.৩ নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াগত একক—নিউরন

মানবমস্তিষ্ক দশ হাজার কোটিরও (১০০,০০০,০০০,০০০ অর্থাৎ ১০^{১১}) বেশিসংখ্যক নিউরন নামক কোশ দিয়ে গঠিত। ছায়াপথের নক্ষত্রসংখ্যার সঙ্গে তুলনীয় এই সংখ্যাটি নিউরনের আয়তন সম্বন্ধেও আমাদের একটা ধারণা দেয়, কারণ এক লিটারের সামান্য বেশি জল থাকতে পারে, এমন একটি শূন্যস্থানে এরকম দশহাজার কোটি কোশ ধরে যায়। এই নিউরনগুলি যেহেতু সম্পূর্ণ নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াগত একক, তাদের কতকগুলি মৌল ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। চিত্র ২৩.১-এ কয়েক ধরনের নিউরন দেখতে পাবেন।

ক্রিয়া অনুসারে নিউরনগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

(ক) চেষ্টীয় নিউরন : নার্ভতন্ত্র থেকে পেশি ও গ্রন্থিতে সংকেত পাঠায়।

(খ) সংজ্ঞাবহ নিউরন : দেহের ইন্দ্রিয়স্থানগুলির গ্রাহককোশ থেকে নার্ভতন্ত্রে সংকেত বহন করে; যথা—স্পর্শ, ঘ্রাণ বা শ্রুতির ফলে উদ্ভূত সংকেতগুলি।

(গ) অন্তর-নিউরন বা অনুষঙ্গ নিউরন : অন্যান্য নিউরন থেকে প্রাপ্ত সংবেদজ তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং বার্তা পরিবহন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কীটপতঙ্গ দংশন করলে সেই জায়গাটি চুলকানোর জন্য আঙুলগুলিকে আদেশ দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের অধিকাংশ নিউরন এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

নিউরনগুলি দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তথ্য বহন করার বিষয়ে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এই বার্তাগুলিকে **নার্ভবিভব** বা **নার্ভ ইম্‌পাল্‌স্‌** বলে উল্লেখ করা হয়। নিউরনগুলিকে উত্তেজিত করে, এমন কোনও উদ্দীপনা বা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নার্ভবিভব উৎপন্ন হয়।

চিত্র ২৩.১-এ লক্ষ করুন, কোশের যে অংশে নিউক্লিয়াস থাকে, প্রত্যেক নিউরনে তাকে **কোশদেহ** বলা হয়। কোশের যে সূত্রাকারে প্রলম্বিত অংশগুলি অন্যপ্রকার নিউরন বা বহিঃপরিবেশ থেকে তথ্য বয়ে আনে, সেগুলিকে **ডেনড্রাইট** বলে; অন্যদিকে যে একটিমাত্র প্রলম্বিত অংশ কোশদেহ থেকে অন্যান্য নিউরনে, পেশি বা গ্রন্থিতে বার্তা নিয়ে যায়, তাকে **অ্যাক্সন** বলা হয়। এই প্রলম্বিত অংশগুলি একটি চর্বিযুক্ত আচ্ছাদনী দিয়ে আবৃত থাকতে পারে—এটি **তড়িৎরাসায়নিক সংকেত** বা **বিভবের** (ইম্পাল্স্) আকারে বার্তার পরিবহনে সাহায্য করে।

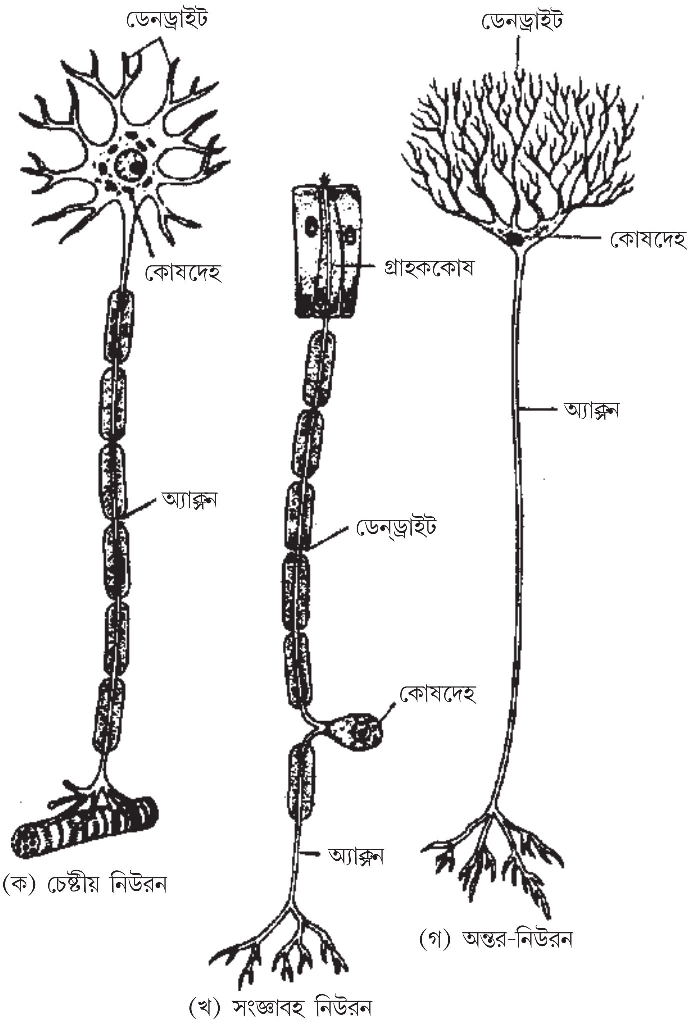

চিত্র ২৩.১ : কয়েক ধরনের নিউরন। শাখাবিশিষ্ট ডেনড্রাইটগুলি এবং কেবল প্রান্তভাগে শাখাবিন্যস্ত একটিমাত্র দীর্ঘ অ্যাক্সন লক্ষ করুন। যদিও কোশদেহ, অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট—এই তিনটি অংশ সকল নিউরনেই থাকে, প্রতিটি নিউরন তার ক্রিয়া অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য পায়। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে নিউরনের অবস্থানের সম্পর্কের উপরে এই বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

মানবদেহে কতকগুলি নিউরনের অ্যাক্সন দৈর্ঘ্যে এক মিটার বা ততোধিক, যেমন—যেটি সুষুম্নাকাণ্ড থেকে পদাঙ্গুলির প্রান্ত পর্যন্ত যায়। অন্য অ্যাক্সনগুলি এক মিলিমিটারের কম দীর্ঘ হতে পারে। অ্যাক্সনটি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুতে ভাগ হয়ে যায় এবং সেগুলি কতকগুলি **প্রান্তে** (টার্মিন্যাল) শেষ হয়। এই প্রান্তগুলি অন্যান্য কোশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই সংযোগস্থলটি **প্রান্তসন্নিকর্ষ** (সাইন্যাপ্স্) নামে একটি ব্যবধানের আকারে বর্তমান (চিত্র ২৩.২ দেখুন)। প্রান্তসন্নিকর্ষ হচ্ছে সেই স্থানটি যেখানে সংকেত অ্যাক্সনটি থেকে লাফ দিয়ে অন্য কোশদেহ বা ডেনড্রাইটে যায়। সংকেতগুলি বৈদ্যুতিক বিভবের আকারে অ্যাক্সন দিয়ে গেলেও এই বিভব লাফ দিয়ে প্রান্তসন্নিকর্ষ অতিক্রম করার মতো শক্তিশালী নয়। সেজন্য অ্যাক্সন-প্রান্তগুলি **নিউরোট্রান্স্মিটার** নামে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে। বিশেষ একটি চাবিই যেমন একটি তালার সঙ্গে খাপ খায়, এই রাসায়নিক বস্তুর অণুগুলি তেমনিভাবে বিশেষ উদ্দিষ্ট কোশে সংলগ্ন হয়। এই ঘটনাটি অতঃপর উদ্দিষ্ট কোশগুলিকে হয় উত্তেজিত করে সেগুলি থেকে আরও সংকেতের উৎপত্তি ঘটায়, না-হয় সংকেত প্রেরণ বন্ধ করতে প্রণোদিত করে। যে কোশটি থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, **নিউরোট্রান্স্মিটারটি** অতঃপর তার দ্বারা পুনর্ব্যবহৃত বা বিনষ্ট হয়।

এরকম প্রান্তসন্নিকর্ষের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোনও নিউরন অন্য কয়েক সহস্র নিউরনের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে। কাজেই মানবমস্তিষ্কে দশ হাজার কোটি ($১০^{১১}$) নার্ভকোশ থাকলে কমপক্ষে দশ লক্ষ অর্বুদ ($১০^{১৪}$) প্রান্তসন্নিকর্ষ আছে। মস্তিষ্কে নার্ভকোশগুলির অন্তরসংযোগের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় অন্তহীন।

একটি কেব্‌ল্-এর তারগুলির মতো বার্তাবাহী তন্তুগুলি একত্রে গুচ্ছবন্ধ হয়ে থাকে এবং একে **নার্ভ** বলে। নার্ভগুলির সমাহারে সজ্জিত তন্ত্রটি দিয়ে বার্তা এত দ্রুত ভ্রমণ করে যে বাইরের কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের এক সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ মাত্র সময় লাগে। ধরুন, আপনি সাইকেলে যাচ্ছেন এবং একটা দুর্ঘটনা এড়াতে ব্রেক করতে হবে; সেক্ষেত্রে তা করতে আপনার এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ লাগবে। এই মানবিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে মোটরযানের গতিসীমার কিছু সম্পর্ক আছে।

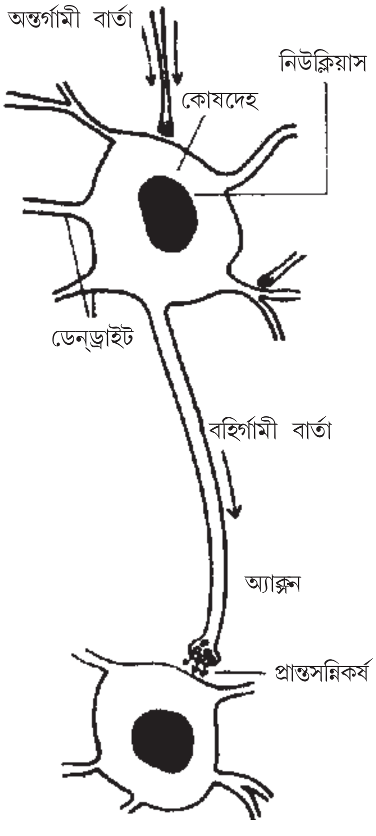

চিত্র ২৩.২ : প্রান্তসন্নিকর্ষসহ নার্ভের গঠন।

অনুশীলনী ১

নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(ক) নিউরনে ———— দেহকোশ থেকে দূরে বার্তাকে বহন করে এবং ———— দেহকোশের দিকে বার্তাকে বহন করে।

(খ) একটি ———— -এর প্রান্তগুলির সঙ্গে পরবর্তী কোশের ডেনড্রাইটের ব্যবধানকে ———— বলে।

(গ) ———— বার্তাকে ইন্দ্রিয়স্থান থেকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়।

(ঘ) ———— বার্তাকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র থেকে দূরে পেশি ও ———— -এর দিকে নিয়ে যায়।

(ঙ) ———— -এর সাহায্যে বার্তাগুলি এক নার্ভকোশ থেকে অন্য কোশে লাফ দিয়ে যায়।

(গ্রন্থি, চেষ্টীয় নিউরন, ডেনড্রাইট, প্রান্তসন্নিকর্ষ, সংজ্ঞাবহ নিউরন, অ্যাক্সন, নিউরোট্রান্স্‌মিটার, অ্যাক্সন)

আপনারা পৃথক পৃথক নিউরনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে পড়েছেন। এখন দেখা যাক, দেহে নার্ভতন্ত্র গঠন করতে এগুলি কীভাবে অতি বিশিষ্ট উপায়ে সংগঠিত হয়।

২৩.৪ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র

নার্ভতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (সংক্ষেপে CNS)—যা আপনারা এখন পড়বেন—এবং দেহের সকল অংশে প্রবাহিত পৃথক পৃথক নার্ভগুলিকে নিয়ে প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র (সংক্ষেপে PNS)—যা পড়বেন ২৩.৫ পরিচ্ছেদে। চিত্র ২৩.৩-এ নার্ভতন্ত্রের সাধারণ সংগঠন দেখা যেতে পারে।

২৩.৪.১ মস্তিষ্ক

নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রীয় অংশ হল মস্তিষ্ক, যা সম্ভবত পদার্থের সর্বাপেক্ষা সংগঠিত আকার। দেহের অন্য যে কোনও অঙ্গ থেকে এটি স্বতন্ত্র, কারণ মাত্র এটিই তথ্য গ্রহণ, ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে এবং প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারে।

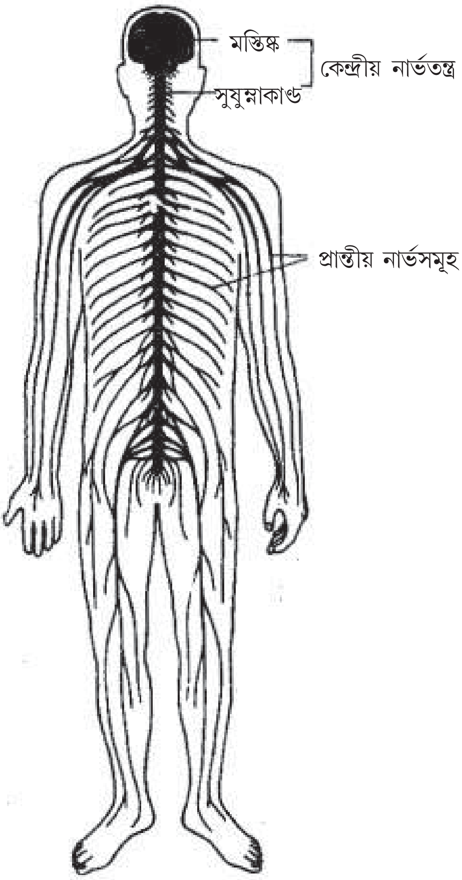

চিত্র ২৩.৩ : মানুষের নার্ভতন্ত্রে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ও প্রান্তীয় নার্ভসমূহ দেখানো হয়েছে।

কোটি কোটি নিউরন তাদের অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট সহ মানবমস্তিষ্কে থাকে। মস্তিষ্কটি কোমল পদার্থ এবং ভাঁজে ভাঁজে সজ্জিত। মস্তিষ্ক কোমল অঙ্গ বলে এটি তিনটি দৃঢ় ঝিল্লি দিয়ে অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং এক বিশেষ রসে ভাসমান, যা অভিঘাত (শক) শোষণে সাহায্য করে। এর উপরে সম্পূর্ণ অঙ্গটি অস্থিনির্মিত করোটির ভিতরে রক্ষিত (চিত্র ২৩.৪)। মস্তিষ্কে রক্তবাহিত অক্সিজেনের অত্যুত্তম সরবরাহ আছে। বস্তুত দেহে যত অক্সিজেনের প্রয়োজন, তার শতকরা ৭৫ ভাগ মস্তিষ্কের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। চারটি পরস্পরসংযুক্ত ধমনী মস্তিষ্কে রক্ত নিয়ে যায়, যাতে দুটি অবরুদ্ধ হয়ে গেলেও দুটি বিকল্প পথ তখনও থাকে। এই চারটি ধমনী লক্ষ লক্ষ **কৈশিক** (ক্যাপিলারি) নামে রক্তবাহের সঙ্গে যুক্ত—কৈশিকগুলি মস্তিষ্কের প্রতি অংশে পৌঁছায়। এমন কি দশ সেকেন্ডের জন্যও রক্তপ্রবাহে বিরতি ঘটলে আমরা সংজ্ঞা হারাই; রক্তপ্রবাহে কয়েক মিনিটের বিরতি মস্তিষ্ক-কোশগুলির স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক-কোশগুলির স্থান আবার পূরণ করা যায় না, কারণ পাঁচ বছর বয়সের পরে মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা বাড়ে না বস্তুত প্রতিদিন কিছু কিছু নিউরনের মৃত্যু হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশত এগুলি আমাদের দেহে এত বিশাল সংখ্যায় আছে যে এতে খুব একটা ইতরবিশেষ ঘটে না। নিউরনগুলির এই মন্থর অথচ স্থায়ী অবলোপকে বার্ধক্যে মানসিক ক্ষমতা হারানোর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। নিউরনগুলির অবলোপ পূরণ করা যায় না বলে পোলিওমায়েলাইটিসের মতো যেসব রোগে নিউরনগুলির বিনাশ ঘটে, সেগুলির ফলে পেশির পক্ষাঘাত নামে, অক্ষমতা উৎপন্ন হয়, কারণ বিনষ্ট নিউরনগুলির সঙ্গে যুক্ত পেশিগুলি কোনও বার্তা পায় না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউরনের মোট সংখ্যা হ্রাস পেলেও মস্তিষ্কে তাদের মধ্যে সংযোগের সংখ্যা বর্ধিত হয়। মনে করা হয়, শিক্ষা মস্তিষ্কে নূতন সংযোগ বা নার্ভবর্তনী (সার্কিট) স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত এবং একবার স্থাপিত হলে এগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। যে ব্যক্তিদের মাথা অপেক্ষাকৃত বড়ো, তাঁরা অধিক বুদ্ধিমান এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু যাঁদের অধিক সংখ্যায় ও জটিলতর নার্ভসংযোগ আছে, তাঁরা বেশি বুদ্ধিমান।

এখন মস্তিষ্কের মুখ্য ক্ষেত্রগুলির ও গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিলেখ দেওয়া যাক। নূতন শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা না করে এই পরিচ্ছেদটি পড়া সবচেয়ে ভালো হবে। যেমন যেমন প্রয়োজন হবে, এগুলিকে আবার দেখে

নিতে পারেন। চিত্র ২৩.৪ ও চিত্র ২৩.৫-এ মস্তিষ্কের প্রধান ক্ষেত্রগুলি দেখানো হয়েছে। এগুলি হল **পুরোমস্তিষ্ক** (ফোরব্রেন), **মধ্যমস্তিষ্ক** (মিডব্রেন) এবং **পরাঙ্মস্তিষ্ক** (হাইন্ড্ব্রেন)। আবার পুরোমস্তিষ্কেরই বহু অংশ আছে এবং এগুলি আমরা এখন বর্ণনা করব।

পুরোমস্তিষ্ক

চিত্র ২৩.৪-এ মস্তিষ্কের যে বৃহত্তম অংশটি দেখছেন, সেটি হল **সেরিব্রাম** বা **গুরুমস্তিষ্ক**। নার্ভতন্তুর একটি বন্ধনীর দ্বারা একত্রে যুক্ত দুটি গোলার্ধ দিয়ে এটি গঠিত (চিত্র ২৩.৫ দেখুন)। মজার কথা, এখানে নার্ভতন্তুগুলি বিপরীত পাশে প্রবাহিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ গোলার্ধটি দেহের বামপাশের এবং বাম গোলার্ধটি ডানপাশের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সেরিব্রামের বহিঃপৃষ্ঠকে **সেরিব্র্যাল কর্টেক্স্** বলে। এর বর্ণের জন্য একে প্রায়ই **ধূসর বস্তু** বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে প্রচুর রক্তবাহের সরবরাহ আছে।

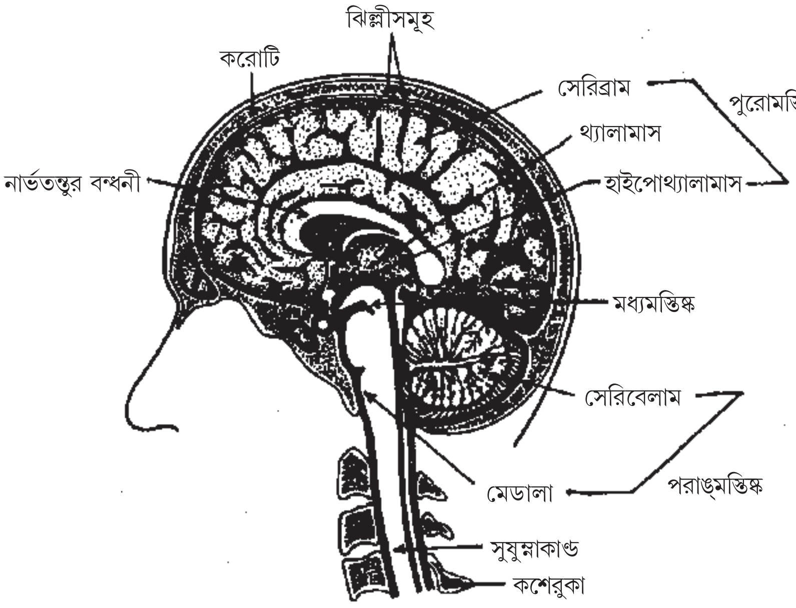

চিত্র ২৩.৪ : মধ্যতলে কর্তিত মানবমস্তিষ্ক—অস্থিনির্মিত করোটির দ্বারা পরিবেষ্টিত মস্তিষ্কের প্রধান বিভাগগুলি এবং মেরুদণ্ডের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুষুম্নাকাণ্ড দেখানো হচ্ছে।

বিশেষত উইল্ডার পেন্ফিল্ড্ নামক এক কানাডীয় নিউরোসার্জন একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে কর্টেক্স্ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে জানা ছিল যে মস্তিষ্কে কোনও ব্যথাগ্রাহক নেই এবং এজন্যই কোনও ব্যক্তিকে অচেতন না করেই মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা করা যায়। স্থানীয়ভাবে অবেদন (অ্যানেসথেসিয়া) করে করোটির শীর্ষভাগটি টুপির মতো সরিয়ে কর্টেক্স্কে উন্মোচিত করা যায়। ডঃ পেন্ফিল্ড্ ঠিক তাই করার পরে একে একে কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশকে বৈদ্যুতিক তার বা সন্ধানীযন্ত্র (প্রোব) দিয়ে স্পর্শ করে উদ্দীপিত করলেন। রোগীদের প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। কর্টেক্সের অংশবিশেষ সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে স্পর্শ করলে রোগীরা দেখতে, শুনতে, ঘ্রাণ নিতে বা স্পর্শের অনুভূতি পেতে থাকলেন। রোগীরা পুরানো স্মৃতি পুনরুদ্রেক করতে পারলেন। কেউ জানালেন, একটি বিশেষ গানের

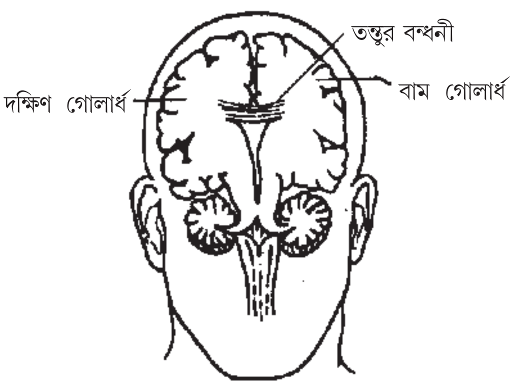

চিত্র ২৩.৫ : মস্তিষ্কের সম্মুখদৃশ্য দুই সেরিব্রাল গোলার্ধের সংযোজক নার্ভতন্তুর বন্ধনীটি দেখানো হয়েছে।

শব্দ শুনতে পেয়েছেন! এক মহিলা অনুভব করলেন, যেন তাঁর কন্যা সেই ঘরে রয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলছে! অন্য এক ব্যক্তি বাস্তবিকই ফুলের সুগন্ধ পেলেন! অন্যান্য ক্ষেত্রের উদ্দীপনার ফলে বাহু বা পায়ের বিচলনের মতো **চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া** ঘটল।

চিত্র ২৩.৬-এ সেরিব্রাল কর্টেক্সের যে পার্শ্বচিত্র দেখছেন, তাতে বিশেষ বিশেষ অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে।

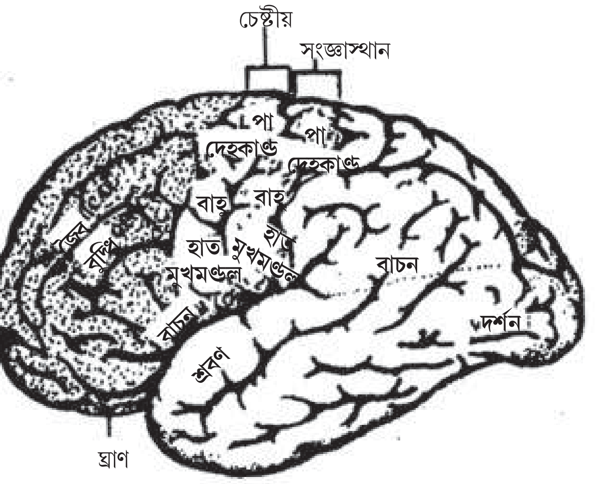

চিত্র ২৩.৬ : মানুষের সেরিব্র্যাল কর্টেক্সের পার্শ্বদৃশ্য—বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ক্রিয়াগুলির অধিষ্ঠান সেগুলি দেখানো হয়েছে।

মস্তিষ্কের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল, কর্টেক্সের দুই গোলার্ধের মধ্যে এক ধরনের শ্রমবিভাজন। আমাদের মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধটি বার্তাকে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে; এটি ভাষাতত্ত্বীয় সামর্থ্য এবং গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতার জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে দক্ষিণ গোলার্ধটি চারুকলা, সংগীত, উপলব্ধি ও স্বজ্ঞা সম্বন্ধীয় ক্ষমতার জন্য দায়ী (চিত্র ২৩.৭ দেখুন)। সাধারণত বাম গোলার্ধের সঙ্গে বিশ্লেষণী ক্রিয়াগুলি এবং দক্ষিণটির সঙ্গে সংশ্লেষণী ক্রিয়াগুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। উভয় ক্রিয়াই বিজ্ঞানের কাজে জড়িত থাকায় সেবিষয়ে উভয় গোলার্ধেরই ভূমিকা আছে। কোনও শিল্পকর্ম সম্পাদনে বাম গোলার্ধ বিশদ কাজকর্মে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ পুরাপুরি বিচার ও মূল্যায়নে লিপ্ত থাকে। কাজেই এই শ্রমবিভাজন কঠোর নয়। এখন দেখা গেছে যে ভাষা, বিজ্ঞান, চারুকলা প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের দক্ষিণ ও বাম গোলার্ধের পরিপূরক ভূমিকা আছে।

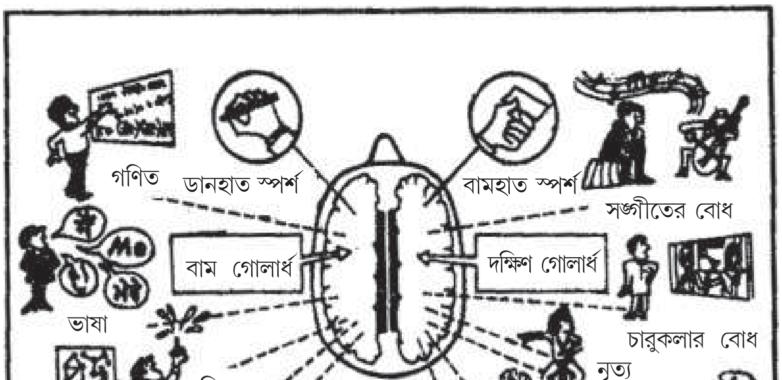

চিত্র ২৩.৭ : মস্তিষ্কে শ্রমবিভাজন।

চিত্র ২৩.৪-এ দেখানো অন্য অংশগুলির মধ্যে **থ্যালামাস** আপনাদের চোখে পড়বে; সেরিব্র্যাল কর্টেক্সে যাওয়ার পথে সংজ্ঞাবহ সংকেতগুলির এবং সেখান থেকে উৎপন্ন সংকেতগুলিরও থ্যালামাস একটি রিলে-কেন্দ্র। এর নিম্নস্থ **হাইপোথ্যালামাস** নামে অংশটি এটা সুনিশ্চিত করে যে, দেহের নানা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল

বিশেষক (প্যারামিটার) যেন সাম্যাবস্থায় থাকে এবং সকল দৈহিক কাজকর্ম যেন প্রকৃষ্ট ভাবে চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটি রক্তের উপরে ক্রমাগত নজরদারি করে। রক্তে অত্যল্প বা অত্যধিক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকলে হাইপোথ্যালামাস শ্বসনহারকে যথাক্রমে কমায় বা বাড়ায়। আপনার দেহের উষ্ণতা বাড়লে হাইপোথ্যালামাস ঘর্মক্ষরণ ঘটায়। হাইপোথ্যালামাস তৃষ্ণা ও ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিদ্রা, যৌন আচরণ ও প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

মধ্যমস্তিষ্ক

মধ্যমস্তিষ্কটি মস্তিষ্কের একটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সকল ইন্দ্রিয় ও দেহের প্রতিটি অংশ থেকে আগত বার্তা গ্রহণ করে এবং সংজ্ঞাবহ বার্তাগুলিকে বাছাই করে, অর্থাৎ তাদের কোন্ অংশ মস্তিষ্কের প্রাসঙ্গিক অঞ্চলগুলিতে পৌঁছানো উচিত, তা নির্ণয় করে। জাগ্রত অবস্থায় থাকার প্রসঙ্গে মধ্যমস্তিষ্কের ভূমিকা আছে এবং এর ক্ষতির ফলে জড়দশা অথবা স্থায়ী নিদ্রা দেখা দেয়।

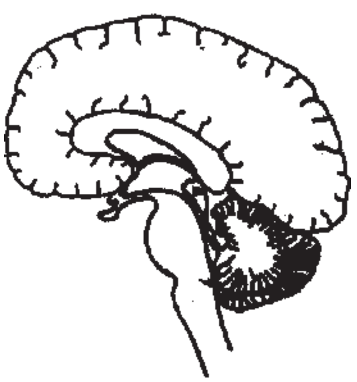

চিত্র ২৩.৮

পরাঙ্মস্তিষ্ক

সেরিবেলাম (লঘুমস্তিষ্ক) ও **ব্রেনস্টেম** (মস্তিষ্ককাণ্ড) দিয়ে পরাঙ্মস্তিষ্ক (হাইন্ড্ব্রেন) গঠিত (চিত্র ২৩.৪)। সেরিবেলাম সেরিব্রামের মতোই দুটি গোলার্ধে বিভক্ত এবং সেরিব্রামের পশ্চাদ্ভাগের তলদেশে অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে এটি বিচলনের সমন্বয় ঘটানোর কাজে লিপ্ত থাকে। সকল ইন্দ্রিয় থেকে আগত বার্তাকে এখানে গ্রহণ ও সম্পূরণ করা হয় এবং সকল পেশিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ঝাঁকানির মতো অসমন্বিত বিচলনের পরিবর্তে সূক্ষ্ম ও অবিরাম বিচলন ঘটতে পারে। সেরিবেলামের অন্য একটি ক্রিয়া হল দৈহিক স্থিতিসাম্য (ইকুইলিব্রিয়াম) অব্যাহত রাখা। চক্ষুকর্ণ থেকে আসা নার্ভবিভবগুলি চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অবস্থান সম্বন্ধে সেরিবেলামকে অবহিত করে। সে পেশিগুলি স্থিতিসাম্য অব্যাহত রাখার মতো দেহভঙ্গির জন্য দায়ী, সেরিবেলাম অতঃপর সেগুলিতে বার্তা পাঠায়। যেসব ক্রিয়াকলাপকে সেরিবেলাম নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির কোনওটিই ঐচ্ছিক নয় বলে আপনি এমনকি সেরিবেলামের কাজকর্ম সম্বন্ধে সচেতন না থাকতে পারেন। মস্তিষ্কের যে অংশটি মস্তিষ্ককে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে, সেটি হল ব্রেনস্টেম বা মস্তিষ্ককাণ্ড। এর **মেডালা** নামক নিম্নভাগটি শ্বসন, রক্তচাপ, বমি করা ও অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মেডালার যে-কোনও ক্ষতিতে সহজেই মৃত্যু ঘটতে পারে।

অনুশীলনী ২

চিত্র ২৩.৮-এ প্রদত্ত মানবমস্তকের পার্শ্বদৃশ্যের পরিলেখে সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস ও মধ্যমস্তিষ্ক কোথায় কোথায় অবস্থিত, তা সাধারণভাবে দেখান। মস্তিষ্কের উল্লিখিত অংশগুলির প্রত্যেকটির অন্তত একটি ক্রিয়া উল্লেখ করুন।

....

....

....

....

২৩.৪.২ সুষুম্নাকাণ্ড

সুষুম্নাকাণ্ডটি ব্রেনস্টেম থেকে নীচের দিকে কশেরুকা (vertebra) নামে সুরক্ষাদায়ী অস্থিবলয়গুলির ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের কেন্দ্রস্থল বেয়ে পিঠের তলদেশ পর্যন্ত নেমে গেছে। এর মধ্যদেশটি প্রস্থচ্ছেদে H-আকৃতিবিশিষ্ট (চিত্র ২৩.৯) এবং কয়েক প্রকার নিউরনে গঠিত। সেটিকে ঘিরে থাকা বস্তুটির বেশিরভাগই অ্যাক্সন তন্তুগুলির দীর্ঘ কেব্‌ল্ দিয়ে গঠিত। সুষুম্নাকাণ্ডটি মস্তিষ্কের মতোই তিনটি ঝিল্লিতে আবৃত; ঝিল্লিগুলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁকটি একটি রসে পূর্ণ থাকে।

৩১ জোড়া সুষুম্নানার্ভ আছে। সুষুম্নাকাণ্ডের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর এগুলি শাখার আকারে মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই নার্ভগুলি সংজ্ঞাবহ সংকেতগুলিকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং চেষ্টীয় সংকেতগুলিকে মস্তিষ্ক থেকে দেহের নানা অংশে বহন করে।

২৩.৫ প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড ব্যতীত নার্ভ ও নিউরনগুলির অবশিষ্ট জালটি **প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের** (সংক্ষেপে PNS) অন্তর্গত। এই তন্ত্রটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে দেহের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যুক্ত করে। মস্তিষ্কে অথবা সেখান থেকে অবশিষ্ট দেহে যে-কোনও বার্তা পাঠানো হয়, সেটি **প্রান্তীয় নার্ভগুলি** দিয়েই যাতায়াত করে। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ও সেজন্যই **করোটিক নার্ভ** (করোটি থেকে) বলে অভিহিত ১২ জোড়া পৃথক পৃথক নার্ভ এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে শাখার মতো বেরিয়ে আসা ৩১ জোড়া সুষুম্নানার্ভ দিয়ে প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র গঠিত। সুষুম্নাকাণ্ড ছাড়বার অব্যবহিত পরেই প্রত্যেক সুষুম্নানার্ভের শাখাগুলি তিনভাবে বিস্তৃত হয়—দেহের সামনের দিকের ত্বক ও পেশিগুলিতে, পিঠের দিকের ত্বক ও পেশিগুলিতে, এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গাগুলিতে।

প্রথম দুই ধরনের শাখাগুলি মস্তিষ্কে সংজ্ঞাবহ তথ্য নিয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক থেকে পেশি ও গ্রন্থিতে চেষ্টীয় সংকেত বহন করে। তৃতীয় প্রকারের শাখাগুলি **স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের** অন্তর্গত, যা প্রধানত অনৈচ্ছিক অভ্যন্তরীণ অঙ্গাগুলির ক্রিয়া পরিচলানা করে প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র নার্ভের যে বিশাল জালটি দিয়ে গঠিত, চিত্র ২৩.৩-এর দিকে আবার তাকালে সেটিকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

২৩.৫.১ প্রতিবর্ত

এটা জানলে আকর্ষণীয় লাগে, উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করতে পারার আগে সকল সংজ্ঞাবহ তথ্যকে মস্তিষ্কে যেতে হয় না। কোনও কোনও উদ্দীপনায় আমাদের সাড়াগুলি সরল, বৈচিত্র্যহীন ও দ্রুত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আঙুল জ্বলন্ত দেশলাইয়ের খুব কাছে এলে ত্বকের **গ্রাহককোশগুলি** একটি নার্ভ দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে সেই তথ্য পাঠায় এবং আঙুলটিকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে একটি **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (রিফ্লেক্স্) অনুষ্ঠিত হয়। এমন **প্রতিবর্ত বর্তনীগুলি** (রিফ্লেক্স্ সার্কিট্স্) ভালোভাবে ছড়িয়ে আছে এবং এগুলির একটিকে চিত্র ২৩.৯-এ দেখানো হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, আঙুলে পিন ফোঁটালে কী হয়।

১। পিনের খোঁচা হচ্ছে সেই উদ্দীপনা যা সেখানের গ্রাহককোশকে সক্রিয় করে।

২। ত্বক থেকে একটি নার্ভবিভব (নার্ভ-ইম্‌পাল্‌স্) একটি সংজ্ঞাবহ নিউরন দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে যায়।

৩। অন্তর-নিউরন দিয়ে নার্ভবিভবটি এবারে চেষ্টীয় নিউরনে যায় এবং পরিণামে পেশিতে যায়; পেশি হাতটিকে বেদনাদায়ক ঘটনা থেকে সরিয়ে নেয়।

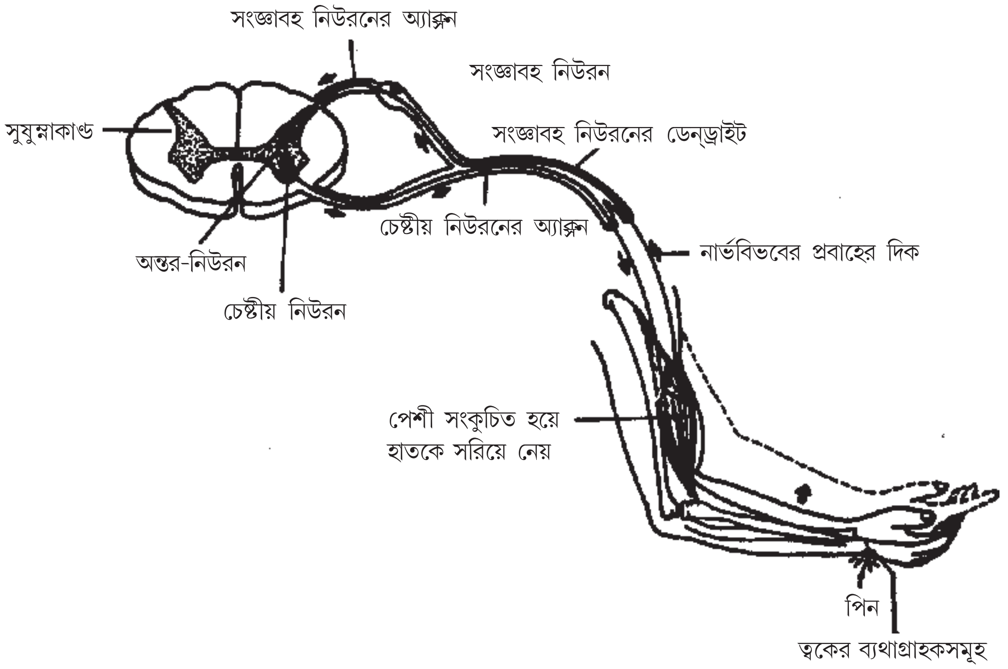

চিত্র ২৩.৯ : সুষুম্নাকাণ্ড এবং একটি প্রতিবর্ত বর্তনী।

স্বাভাবিক অবস্থায় এমন সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলিতে মস্তিষ্ক লিপ্ত থাকে না। কিন্তু ঘটনাটির পরে মস্তিষ্ক তার খবর পায় এবং কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক সেকেন্ডের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং প্রাণরক্ষার জন্য প্রায়ই এর গুরুত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেন, অন্য গাড়ির সঙ্গে আকস্মিক সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তাঁকে ব্রেক কষতে হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে তাঁর প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সময়সূচির গুরুত্ব আছে। অনুরূপভাবে, বিপর্যয় এড়াতে হলে বিমানচালকের প্রতিবর্তগুলি দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি চালানোয় মানুষের সামর্থ্য তার প্রতিবর্তগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দ্বারা সীমিত থাকে।

> কোনও ব্যক্তির প্রতিবর্তগুলির পরীক্ষা নিয়মমতো দৈহিক পরীক্ষার অংশবিশেষের অঙ্গীভূত। প্রতিবর্তগুলি পরীক্ষা করে নার্ভতন্ত্রের অবস্থা, বিশেষত প্রান্তসন্নিকর্ষগুলির ক্রিয়াকলাপ নির্ণয় করা যায়। নার্ভতন্ত্রের কোনও অংশ আহত হয়ে থাকলে কয়েকটি প্রতিবর্তের পরীক্ষা থেকে আঘাতের অবস্থিতি ও বিস্তারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোনও আবেদনকারী (অ্যানেস্থেটিক) দ্রবের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট কোনও প্রতিবর্ত উৎপাদনের চেষ্টা করতে পারেন।

সরল প্রতিবর্তের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলি বর্তমান :

- এগুলি বংশানুক্রমে পাওয়া যায় এবং শেখা যায় না, কাজেই ভোলাও যায় না।
- এগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; কাজেই, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কিছু প্রতিবর্তকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও এগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত।
- একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া সকল সময়েই একই রকম।

অনুশীলনী ৩

নিম্নলিখিতগুলিকে একটি সরল প্রতিবর্ত বর্তনীর পক্ষে সঠিক ক্রমে সাজান। প্রত্যেক উক্তির পাশে দেওয়া প্রকোষ্ঠে ১, ২, ... ইত্যাদি লিখে এই ক্রমটি নির্দেশ করুন। আপনাদের উদাহরণ দেওয়ার জন্য একটি ক্ষেত্রে আমরা করে দিয়েছি।

(ক) চেষ্টীয় নিউরন দিয়ে বার্তা যায়। [১]

(খ) সংজ্ঞাবহ নিউরন দিয়ে বার্তা যায়। [১]

(গ) সংকোচনের জন্য পেশি উদ্দীপিত হয়। [১]

(ঘ) গ্রাহককোশ বা অঙ্গ উদ্দীপিত হয়। [১]

(ঙ) অন্তর-নিউরন দিয়ে বার্তা যায়। [১]

২৩.৫.২ স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র

পাচন ও সংবহনের মতো যে স্বশাসিত বা স্বনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ আমরা নিদ্রিত বা সংজ্ঞাহীন থাকলেও ক্রমাগত ঘটতে থাকে, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে স্বতঃক্রিয় (autonomic) নার্ভতন্ত্রকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে স্বতঃক্রিয় নার্ভগুলি দিয়ে প্রবহমান নার্ভবিভবগুলি পরিবর্তনশীল প্রয়োজন অনুযায়ী রক্তবাহগুলিকে প্রসারিত বা সংকুচিত, পরিপাককে বিলম্বিত বা ত্বরিত এবং দেহের উষ্ণতাকে বর্ধিত বা হ্রাস করে। স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দুটি বিন্যাস আছে :

- **সমবেদী নার্ভগুলি** সংকট বা পীড়নের অবস্থায় রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দনহার, শ্বসন এবং পেশিতে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে তথা পাচনতন্ত্র ও বৃক্কে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য দেহকে উদ্দীপিত করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলির সব কটিই যুদ্ধ করা বা পলায়ন করার জন্য আকস্মিক শক্তিব্যয়ের প্রস্তুতি।
- **পরাসমবেদী নার্ভগুলি** বিশ্রামকালীন ক্রিয়াকলাপের জন্য দেহকে প্রস্তুত করে। অবশ্য স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র এবং সচেতন নার্ভীয় কাজকর্মের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একথা সুবিদিত যে উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ পরিপাককে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি পেপ্‌টিক আল্‌সার বা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুর বিতৃষ্ণা তাকে প্রতি প্রভাতে অসুস্থ করতে পারে, যদিও এই যোগাযোগটি সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। কোনও কোনও অবস্থায় যথেষ্ট অভ্যাসের পরে কিছু লোক দেখেছেন, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, দেহের উষ্ণতা বা শ্বসনহার এবং অক্সিজেন গ্রহণকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; অন্য কিছু লোক হয়তো ব্যথার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা কোনও অঙ্গের বিকারকেও সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু এগুলি ভীষণ সময় ও আয়াস ব্যয়ের দ্বারা বিকশিত অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী সামর্থ্য।

অনুশীলনী ৪

সঠিক উক্তিগুলিকে চিহ্নিত করুন :

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র

(ক) সচেতন নার্ভীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে দৈহিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

(খ) ঐচ্ছিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) অনৈচ্ছিক ও স্বনিয়ন্ত্রিত কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) সংকট বা পীড়নের সময়ে দেহকে সক্রিয় করে।

(ঙ) উপরের সব কটিই করে।

২৩.৬ হরমোনতন্ত্র

আমাদের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য নার্ভতন্ত্র ও পেশিগুলির সঙ্গে অন্য একটি তন্ত্রও যে অবিরত কাজ করে, আমরা অনেকেই সেসম্বন্ধে সচেতনই নই। **অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি** (এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড) নামে বিশেষ গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত **হরমোন** নামক রাসায়নিক দ্রব্যগুলির উপরে এই তন্ত্রটি নির্ভর করে। এই গ্রন্থিগুলির কোনও উন্মুক্ত মুখ বা প্রণালী নেই; এগুলির কলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত রক্তস্রোতেই এদের ক্ষরিত রসগুলি সোজাসুজি নিঃসৃত হয়। দেহে এগুলির অবস্থান চিত্র ২৩.১০-এ দেখতে পাবেন।

প্রত্যেক হরমোন কোনও একটি অঙ্গের উপরে একটি বিশেষ উপায়ে ক্রিয়া করে। হরমোনগুলির ক্রিয়ার অনেক ফলাফলই দীর্ঘকালীন পরিবর্তন, যেমন—বৃদ্ধি ও যৌন সুপরিণতির সময়ে দেহে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে থাকে। অবশ্য কতকগুলি পরিবর্তন দ্রুতও ঘটতে পারে, যেমন—হৃৎস্পন্দন ও শ্বসনের হার যখন বাড়ানো বা কমানো হয়।

কয়েকটি মুখ্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি এবং এগুলির ক্ষরিত হরমোনের একটি তালিকা সারণি ২৩.১-এ দেওয়া হল। এগুলির প্রতিটি আপনি মনে রাখবেন, এমন আশা করা হচ্ছে না। এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আরও জানতে যদি আপনি কৌতূহলী হন, সেজন্যই এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

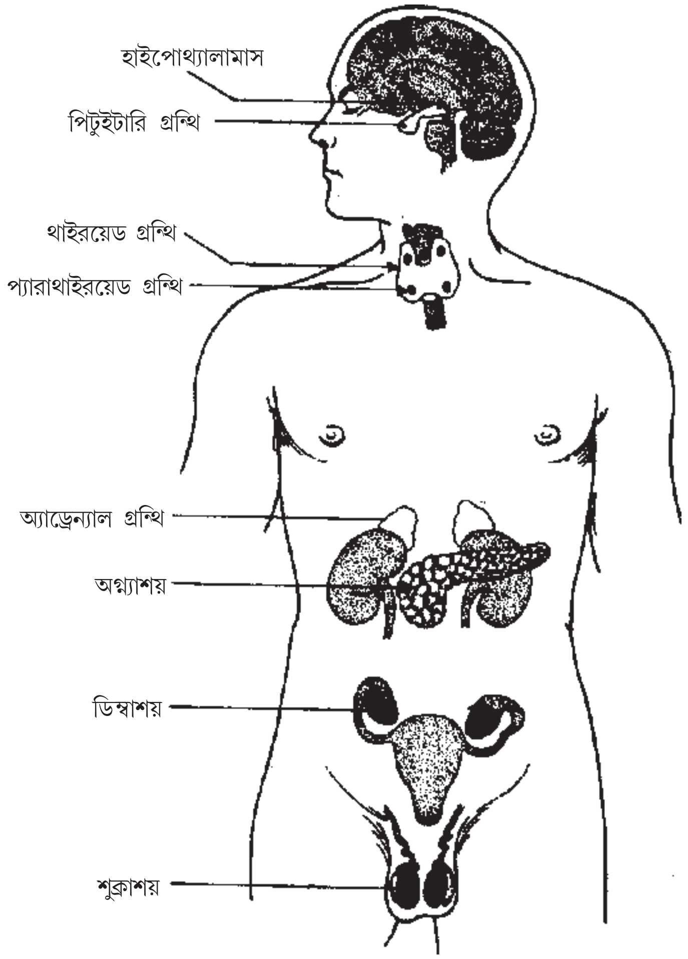

চিত্র ২৩.১০ : কয়েকটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির অবস্থান। সুবিধার জন্য চিত্রে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় দুই-ই দেখানো হয়েছে।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেহের যথাযথ ক্রিয়াকলাপের জন্য এই হরমোনগুলি অপরিহার্য। এরা দেহে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিণামে স্বাভাবিক দৈহিক অবস্থাগুলিকে অব্যাহত রাখার কাজে অর্থাৎ হোমিওস্ট্যাসিস বা সমস্থিতির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হরমোনগুলিকে নিয়ামক হিসাবে কাজ করতে হলে এগুলিকে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে এবং যথোচিত পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। দেহের সকল অংশ থেকে বার্তা পেয়ে এবং গ্রন্থিগুলিকে যথোপযুক্ত সংকেত পাঠিয়ে মস্তিষ্ক এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। এই 'ফিডব্যাক' বা 'প্রতিপুষ্টি' পদ্ধতিটি

কোনও যন্ত্রের উষ্ণতা-নিয়ন্ত্রক থার্মোস্ট্যাট্‌টির অত্যন্ত অনুরূপ। এই প্রতিপুষ্টি পদ্ধতিটির কোনরূপ বৈকল্যের কঠিন পরিণাম ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, থাইরয়েড গ্রন্থি যে থাইরক্সিন উৎপাদন করে তা দেহে বিপাকহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর অতিক্ষরণে কোনও ব্যক্তির শীর্ণ, অত্যাধিক ক্রিয়াশীল এবং উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে, আবার এর অল্পক্ষরণ তাকে দেহভারগ্রস্ত ও মন্থর করে। বস্তুত থাইরক্সিন অভাব মানসিক তথা দৈহিক মন্দন (retardation) ঘটায়; অভাবটি যথেষ্ট গোড়ার দিকে ধরা পড়লে এবং যথোচিত পরিমাণে হরমোনটি সেবন করালে এই মন্দন নিবারণ করা যায়।

হরমোনগুলি আমাদের নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করে। যেমন, কোনও বিপদ বা ভয়ের অবস্থায় সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে তথ্য পাঠায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র সক্রিয় হয়। অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থিগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠে অ্যাড্রেন্যালিন নামে একটি হরমোন নিঃসরণ করে। অ্যাড্রেন্যালিন পৌষ্টিক নালি ও ত্বকে পৌঁছালে তাদের রক্তবাহগুলি সংকুচিত হয়ে রক্তসরবরাহকে পেশিগুলির দিকে ঘুরিয়ে দেয়, চোখের তারারন্ধ্রগুলি বিস্ফারিত হয় এবং শ্বসনহার ত্বরান্বিত করতে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসৃত হয়। পালানো বা লড়াই করার মতো কাজের জন্য বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে, এমন ব্যক্তিকে এসকল পরিবর্তন সাহায্য করে। অনুচ্ছেদ ২৩.৫.২-এ যে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কথা পড়েছেন, তার দ্বারা আরম্ভ করা ক্রিয়াগুলির সঙ্গে এসব ক্রিয়ার অভিন্নতা আপনারা শনাক্ত করতে পারবেন।

সংকটকালে নার্ভীয় নিয়ন্ত্রণ এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে অত্যন্ত দ্রুত উৎপাদন করে; প্রারম্ভিক অভিঘাত (শক) কেটে যাওয়ার পরে প্রতিক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে যে সমর্থক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, হরমোনগুলি তার ব্যবস্থা করে। অন্তিম পরীক্ষা বা করণীয় কাজ শেষ হওয়ার পরেও যে 'নার্ভীয় শক্তি'র অবস্থা অবশিষ্ট থাকে, এই থেকেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

সারণি ২৩.১

কয়েকটি মুখ্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি এবং সেগুলির ক্রিয়া

গ্রন্থি	হরমোন	ক্রিয়া
হাইপোথ্যালামাস	একগুচ্ছ নিঃসারক বা অবদমক উপাদান	পিটুইটারিকে উদ্দীপিত বা অবদমিত করে
পিটুইটারি	মূত্রাধিক্য-নিবারক হরমোন (এ-ডি-এইচ)	মূত্রোৎপাদনের অবদমন ঘটায়
	অক্সিটোসিন	প্রসবকালে জরায়ুর সংকচোন এবং দুধের নিঃসরণ ঘটায়
	বৃদ্ধি হরমোন	অস্থি, পেশি ও গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটায়
	অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রোপিক হরমোন (এ-সি-টি-এইচ)	অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে
	থাইরয়েড-উদ্দীপক হরমোন (টি-এস-এইচ)	থাইরয়েডকে উদ্দীপিত করে
	গোনাডোট্রোপিন্‌স্ বা যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হরমোন	ডিম্বাশয় বা শুক্রাশয়কে উদ্দীপিত করে
প্যারাথাইরয়েড	প্যারাথরমোন	রক্তের ক্যালশিয়ামের মাত্রাকে বাড়ায়

গ্রন্থি	হরমোন	ক্রিয়া
থাইরয়েড	থাইরক্সিন	বিপাকহার বাড়ায়
	ক্যাল্‌সিটোনিন	রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমায়
অ্যাড্রেন্যাল মেডালা	অ্যাড্রেন্যালিন	হৃৎস্পন্দন ও শ্বসনের হার, রক্তশর্করার মাত্রা প্রভৃতি বাড়ায়
	নর্‌-অ্যাড্রেন্যালিন	রক্তচাপ বাড়ায়, নিউরোট্রান্‌স্‌মিটার রূপে কাজ করে
অ্যাড্রেন্যাল কর্টেক্‌স্‌	একগুচ্ছ হরমোন	শর্করা ও লবণের বিপাককে এবং পীড়নের বিরুদ্ধে সাড়াকে প্রভাবিত করে
	যৌন হরমোনগুলি	যৌনাঙ্গগুলির প্রথমদিকের বিকাশ
অগ্ন্যাশয়	ইনসুলিন	দেহকে শর্করার বিপাক ঘটাতে সমর্থ করে, চর্বির সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করে
	গ্লুকাগন	রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়
ডিম্বাশয়	ইস্ট্রোজেন	জরায়ুর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, গৌণ যৌনলক্ষণ-গুলির বিকাশ ঘটায়
	প্রোজেস্টেরোন	স্ত্রীজাতির প্রজননকলার বৃদ্ধি ঘটায়, গর্ভাবস্থাকে অব্যাহত রাখে
শুক্রাশয়	টেস্টোস্টেরোন	পুং-যৌনলক্ষণগুলির বিকাশ ঘটায়

প্রায়ই আমরা দেখি যে নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে একযোগে হরমোনগুলি কোনও ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বস্তুত কোনও ব্যক্তির কতকগুলি অস্বাভাবিক আচরণ কোনও কোনও হরমোনের অতিক্ষরণ বা অল্পক্ষরণের ফলে ঘটতে পারে। বর্তমানে প্রাণরসায়নের (বায়োকেমিস্ট্রি) বিজ্ঞান হরমোনের সংশ্লেষণ সম্ভব করেছে; গ্রন্থিগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ পরিমাণে হরমোন উৎপাদনে অক্ষম হলে এই সংশ্লেষিত হরমোনগুলি সূচপ্রয়োগে (ইনজেকশন দিয়ে) বা মৌলিকভাবে সেবন করানো যায়। এর সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ হল ইনসুলিন, যা মধুমেহ রোগীদের দীর্ঘতর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম করেছে।

অনুশীলনী ৫

প্রত্যেক বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত শব্দগুলির মধ্যে সঠিক বিকল্পটিকে চিহ্নিত করুন।

(ক) নার্ভক্রিয়ার তুলনায় হরমোনের ফলাফল (মন্থর/দ্রুত)।

(খ) দেহের যথাযথ ক্রিয়াকলাপের জন্য হরমোনগুলি (অপরিহার্য/গুরুত্বহীন)।

(গ) দেহ উপযুক্ত পরিমাণে হরমোন উৎপাদন করতে না পারলে সেগুলিকে বাইরে থেকে দিয়ে সম্পূরণ করা (যায়/যায় না)।

২৩.৭ সারাংশ

বর্তমান এককে আপনারা শিখেছেন :

- নিউরন নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াগত একক। এটি ডেনড্রাইটগুলি দিয়ে বৈদ্যুতিক বিভবের আকারে সংকেত পায় এবং অ্যাক্সন দিয়ে সংকেত পাঠায়। যে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে নিউরোট্রান্স্‌মিটার বলা যায়, সেগুলির সাহায্যে নার্ভবিভবগুলি প্রান্তসন্নিকর্ষ অতিক্রম করে পরিবাহিত হয়। মস্তিষ্কে কোটি কোটি নিউরনের মধ্যে অন্তর-যোগাযোগের ফলে জটিল ক্রিয়াগুলি সম্ভব হয় এবং এগুলি থেকেই আসে শিক্ষা, স্মৃতি ও বুদ্ধি।
- মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র এবং দেহের সকল নার্ভ নিয়ে প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র—এই দুটি ভাগে নার্ভতন্ত্র বিভক্ত। নীচের তালিকায় নার্ভতন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াগুলির সারাংশ দেওয়া হল।

মানবীয় নার্ভতন্ত্র

নার্ভতন্ত্র	ক্রিয়াসমূহ
মস্তিষ্ক	
পুরোমস্তিষ্ক	চিন্তা, স্মৃতি ও বুদ্ধির কেন্দ্র; ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সূচনা ঘটায়; সংবেদনকে ব্যাখ্যা করে; প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করে।
মধ্যমস্তিষ্ক	পুরোমস্তিষ্ক ও পরাঙ্‌মস্তিষ্কের সঙ্গে অনুষঙ্গ থাকায় সংজ্ঞাবহ তথ্য গ্রহণ করে এবং পুরোমস্তিষ্কে পাঠানোর আগে তাকে বাছাই করে।
পরাঙ্‌মস্তিষ্ক	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে বার্তার আদানপ্রদান ঘটায়, শ্বসনের মতো অনৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের স্থিতিসাম্য ও বিচলনের সমন্বয় ঘটায়।
সুষুম্নাকাণ্ড	মস্তিষ্ক ও প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের মধ্যে তথ্য বহন করে। প্রতিবর্ত বর্তনীগুলির অংশ।
প্রান্তীয় নার্ভসমূহ	সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলি থেকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে বার্তা নিয়ে যায়। পেশিগুলির ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ করে।
স্বতঃক্রিয় নার্ভসমূহ	অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির অনৈচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ। সংকটে সাড়া দেয়, হৃৎস্পন্দনহার বাড়ায়, তারারন্ধ্র বিস্ফারিত করে, রক্তচাপ বাড়ায় ইত্যাদি।

- প্রতিবর্ত এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া যেটির ব্যাপারে মস্তিষ্ক লিপ্ত নয়। সরলতম প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় লিপ্ত থকে সুষুম্নাকাণ্ডে প্রান্তসন্নিকর্ষ দিয়ে যুক্তি একটি সংজ্ঞাবহ নিউরন, একটি অন্তর-নিউরন এবং একটি চেষ্টীয় নিউরন।
- মানুষের নার্ভতন্ত্র একটি অত্যন্ত সম্পূরিত তন্ত্র যা বহু ধরনের ও বিকল্পের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য বহু নার্ভবিভবকে সমন্বিত ও নানাপথে প্রবাহিত করতে পারে।
- কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধির জন্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি এবং তাদের দ্বারা ক্ষরিত হরমোনগুলি অপরিহার্য। এই হরমোনগুলির মধ্যে কতকগুলি নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করে আচরণকে প্রভাবিত করে।

২৩.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। চিত্র ২৩.৯ দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দিন :

(ক) কতগুলি কোশদেহ আঁকা হয়েছে? তাদের নাম লিখুন।

....

....

....

....

(খ) কতগুলি প্রান্তসন্নিকর্ষ দেখানো হয়েছে?

....

....

২। যাদের সেরিব্র্যাল গোলার্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানসিক বৈকল্য ঘটলেও তারা জীবিত থাকে। যাদের ব্রেনস্টেম, বিশেষত মেডালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অল্পকালের মধ্যে তাদের মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোন্ দিকটি এই পার্থক্যের কারণ বলে আপনি মনে করেন?

....

....

....

....

....

৩। কাশি হওয়া প্রতিবর্ত ক্রিয়া না ঐচ্ছিক ক্রিয়া, সরল প্রতিবর্তের গুণাগুণ মনে রেখে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

....

৪। হরমোনগুলির দ্বারা সমন্বয় এবং নার্ভতন্ত্রের দ্বারা সমন্বয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এগুলি মনে রেখে আপনার উত্তর লেখা উচিত :

(ক) বার্তা পরিবহণের পথ,

(খ) পরিবহণের দ্রুতি এবং

(গ) প্রতিক্রিয়ার দ্রুতি ও স্থায়িত্বকাল।

....

....

....

....

....

৫। সঠিক উক্তিগুলির পাশে দেওয়া প্রকোষ্ঠে চিহ্ন দিন।

(ক) সেরিব্রাল কর্টেক্সের দক্ষিণার্ধ দেহের বামদিককে এবং বামার্ধ ডানদিককে নিয়ন্ত্রণ করে। [ ]

(খ) সেরিব্র্যাল কর্টেক্সের কেবল বাম গোলার্ধটি ভাষার জন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। [ ]

(গ) মস্তিষ্কের চেষ্টীয় অঞ্চলগুলি ঐচ্ছিক পেশিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। [ ]

(ঘ) কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে গঠিত। [ ]

(ঙ) মস্তিষ্কে নার্ভকোশগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য অন্তর-সংযোগ জটিল ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা, স্মৃতি ও বুদ্ধির জন্য দায়ী। [ ]

(চ) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির দ্বারা ক্ষরিত হরমোনগুলি একটি স্বতন্ত্র সমন্বয়তন্ত্র হিসাবে কাজ করে। [ ]

২৩.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) অ্যাক্সন, ডেনড্রাইট

(খ) অ্যাক্সন, প্রান্তসন্নিকর্ষ

(গ) সংজ্ঞাবহ নিউরন

(ঘ) চেষ্টীয় নিউরন, গ্রন্থি

(ঙ) নিউরোট্রান্স্‌মিটার।

২। চিত্র ২৩.৪-এর সঙ্গে লেবেলগুলির তুলনা করুন।

সেরিব্রাল	—	চিন্তা, বাচন, আস্বাদন ও অন্যান্য জটিল সাড়া।
সেরিবেলাম	—	বিচলনের সমন্বয়সাধন; দেহের স্থিতিসাম্য অব্যাহত রাখে।
থ্যালামাস	—	কর্টেক্সের দিকে আসা সংজ্ঞাবহ বার্তাগুলির রিলেকেন্দ্র।
হাইপোথ্যালামাস	—	তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, হোমিওস্ট্যাসিস্ বা সমস্থিতি অব্যাহত রাখে।
মধ্যমস্তিষ্ক	—	কোন্ কোন্ উদ্দীপনা মস্তিষ্কের প্রাসঙ্গিক অংশে পৌঁছানো উচিত, তার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩। (ক) ৪, (খ) ২, (গ) ৫, (ঘ) ১, (ঙ) ৩

৪। সঠিক উক্তিগুলি হল : (ক), (গ) এবং (ঘ)।

৫। (ক) মন্থর, (খ) অপরিহার্য, (গ) যায়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর

১। (ক) চারটি কোশদেহ : (১) ব্যথাগ্রাহক কোশ,
(২) সংজ্ঞাবহ নিউরন,
(৩) অন্তর-নিউরন,
(৪) চেষ্টীয় নিউরন।

(খ) চারটি প্রান্তসন্নিকর্ষ : (১) ব্যথাগ্রাহক ও সংজ্ঞাবহ নিউরনের ডেনড্রাইটের মধ্যে,
(২) সংজ্ঞাবহ নিউরনের অ্যাক্সন এবং অন্তর-নিউরনের কোশদেহের মধ্যে,
(৩) অন্তর-নিউরনের অ্যাক্সন এবং চেষ্টীয় নিউরনের কোশদেহের মধ্যে,
(৪) চেষ্টীয় নিউরনের অ্যাক্সন এবং পেশিকোশের মধ্যে।

২। সেরিব্র্যাল গোলার্ধের ক্ষতি ঐচ্ছিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। পক্ষান্তরে মেডালার ক্ষতি হৃৎস্পন্দন, শ্বসন ও রক্তচাপের মতো জীবনের পক্ষে অপরিহার্য দৈহিক ক্রিয়াগুলিতে ব্যাঘাত ঘটায়। এই ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং জীবনকে অব্যাহত রাখতে হলে এগুলিকে চালাতেই হবে।

৩। দুটিই হতে পারে। আপনি ইচ্ছা করে কাশতে পারেন, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এটি একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া, কারণ—

(ক) গলা খুশখুশ করলে বা আকস্মিকভাবে খাদ্য শ্বাসনালিতে প্রবেশ করলে এটি অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটে।

(খ) এমন অবস্থাগুলিতে সব সময়েই একই প্রতিক্রিয়া ঘটে। কেউ এগুলি ভোলে না।

৪। (ক) নার্ভ ও নার্ভতন্তু দিয়ে বার্তাগুলি যাতায়াত করে, কিন্তু হরমোনগুলি সোজাসুজি রক্তে ক্ষরিত হয় এবং রক্তই সেগুলিকে উদ্দিষ্ট কলায় নিয়ে যায়।

(খ) নার্ভতন্ত্র দিয়ে বার্তাগুলি অনেক দ্রুততর গতিতে এক সেকেন্ডের মধ্যে পরিবাহিত হয়, কিন্তু হরমোনগুলির ক্রিয়া অনেক মন্থর—কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন লাগে।

(গ) নার্ভবিভবের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটে, কিন্তু হরমোনগুলির ক্ষেত্রে বহু বৎসর ধরে প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

৫। সঠিক উক্তিগুলি হল : (ক), (গ), (ঘ) এবং (ঙ)।

একক ২৪ □ আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক দিক

গঠন

২৪.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২৪.২ শিক্ষা
উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া
পুরস্কার ও শাস্তি
জ্ঞানীয় শিক্ষা
২৪.৩ বুদ্ধ্যঙ্ক
২৪.৪ সৃজনশীলতা
২৪.৫ কৈশোর
২৪.৬ আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব ও নৈরাশ্য
২৪.৭ আগ্রাসন
সহজাত প্রবৃত্তি অথবা অর্জিত
আগ্রাসনের জৈব ভিত্তি
অর্জিত প্রতিক্রিয়ারূপী আগ্রাসন
২৪.৮ মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং
২৪.৯ মহাকাশে মানবসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা
২৪.১০ সারাংশ
২৪.১১ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২৪.১২ উত্তরমালা

২৪.১ প্রস্তাবনা

পূর্বের এককে আমরা মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্রের গঠন ও কাজকর্ম আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম, আমাদের সকল আচরণই মস্তিষ্ক, নার্ভতন্ত্র এবং নানা হরমোন-ক্ষরণকারী প্রণালীহীন গ্রন্থি বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতন্ত্রের ক্রিয়াগুলির উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু মানবমস্তিষ্কের জটিলতা এবং "চিন্তন", "কল্পনা" অথবা "অন্তর্দৃষ্টি"র মতো ক্রিয়াগুলির দুর্বোধ্য প্রকৃতির জন্য মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে এখনও বহু বিশাল ফাঁক থেকে গেছে। সুতরাং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের তুলনায় গৃহীত সংকেত ও সে সম্বন্ধে ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নার্ভতন্ত্র ও

মস্তিষ্কের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা অধিকতর ব্যবহারসিদ্ধ। এথেকে আমরা মনোবিদ্যা ও মানবীয় আচরণের কতকগুলি দিকের আলোচনায় নীত হই। মানসিক বিকাশের স্তর এবং শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভূমিকার মতো অন্য কয়েকটি প্রশ্ন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হবে। আমরা আপনাদের মানবোপাদান (হিউম্যান ফ্যাক্টর) ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব—এই বিজ্ঞানটিতে কোনও যন্ত্রপাতি ও কর্মস্থল পরিকল্পনার সময়ে মানবদেহের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় আনা হয়। অসাধারণ পরিবেশে মানুষ কীভাবে অভিযোজন করে, সে সম্বন্ধে বোঝার ইচ্ছা থেকে মহাকাশে তাদের নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার সূচনা হয়েছিল। এমন সব অনুসন্ধানের সময়ে নিরীক্ষিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধেও আপনাদের অবহিত করার চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ার পরে আপনার সক্ষম হওয়া উচিত :

- শিক্ষা যে তিনটি আকারে ঘটে থাকে, সেগুলি বর্ণনা করতে,
- বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার মধ্যে পার্থক্য করতে,
- কৈশোরে যে দৈহিক ও আচরণগত পরিবর্তনগুলি ঘটে, সেগুলির কয়েকটিকে শনাক্ত করতে,
- আগ্রাসী আচরণ সহজাত প্রবৃত্তিঘটিত না অর্জিত, তা ব্যাখ্যা করতে,
- মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত নীতিগুলির বিকাশের কারণ দেখাতে,
- মহাকাশে মানুষের উপরে কৃত কয়েকটি মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বর্ণনা দিতে।

২৪.২ শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে বলার সময়ে আমরা সাধারণত বোঝাই একটি নূতন দক্ষতা, নূতন তথ্য বা নূতন ধারণা আয়ত্ত করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি সাইকেল চড়তে, কোনও খেলা খেলতে অথবা নূতন কোনও ভাষা বলতে শিখতে পারেন। এবিষয়ে ভাবলে মনে পড়ে, চলতে ও কথা বলতে শেখা থেকে শুরু করে ইতিহাস বা ভূগোল প্রভৃতি শেখা পর্যন্ত, এমনকি সামাজিক আচরণ ও ভুল-নির্ভুল বা ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা শেখা পর্যন্তও নানা জিনিস সারা জীবন ধরে আপনি শিখেছেন। বস্তুত আপনার সকল মনোভঙ্গি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস, যা কিছু আপনাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে, তা এই ক্রমাগত শিক্ষারই পরিণাম। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যহ নব নব পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই এবং সেগুলি থেকে আমরা সকলেই অবিরাম শিখে থাকি। প্রশিক্ষণ, পঠনপাঠন বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি, আমাদের আচরণ তারই উপরে দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সকল আচরণই যুক্তিসম্মত বা বিচারসিদ্ধ। নিজ দেহ বা পরিধেয় পরিচ্ছন্ন না রাখার অথবা অলস ও জড়তাগ্রস্ত থাকার মতো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি কোনও ব্যক্তি শিশু অবস্থাতেই আয়ত্ত করে থাকতে পারেন। কেবল ভিন্ন ভাষায় কথা বলে বা ভিন্ন ধর্মমত পোষণ করে বলে অন্য লোককে অস্পৃশ্য বা ঘৃণ্য বিবেচনা করার মতো ভ্রান্ত মূল্যবোধগুলিও কখনও কখনও পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের কাছ থেকে "শেখা" হয়। অবশ্য কতকগুলি আচরণ "সহজাত প্রবৃত্তিগত", অর্থাৎ কিছু না শিখেই মনুষ্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কোনও কোনও কাজ মানুষ করবে, যেমন—জননীর শিশুকে আঘাত থেকে রক্ষা করা।

২৪.২.১ উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া

যে বিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণ ও মনোভঙ্গি সম্বন্ধে আগ্রহী, সেই মনোবিজ্ঞানীরা সরল মডেল ও অবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষার বনিয়াদি পদ্ধতিটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। সরলতম মডেলটি হল **উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া**। উনিশ

শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রুশ বিজ্ঞানী ইভান পাভলভ কুকুর নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন; বোধ হয় এগুলি ছিল উদ্দীপনার ফলে একটি বিশেষ ধরনের **প্রতিক্রিয়া** উৎপন্ন হওয়ার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। কুকুরের দেহে পরিপাকের শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময়ে তিনি লালাপ্রবাহ মাপতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কুকুরের গালে একটি নল প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং তার সামনে একপাত্র মাংস রেখেছিলেন—কুকুরটি লালাক্ষরণ শুরু করেছিল (চিত্র ২৪.১ দেখুন)।

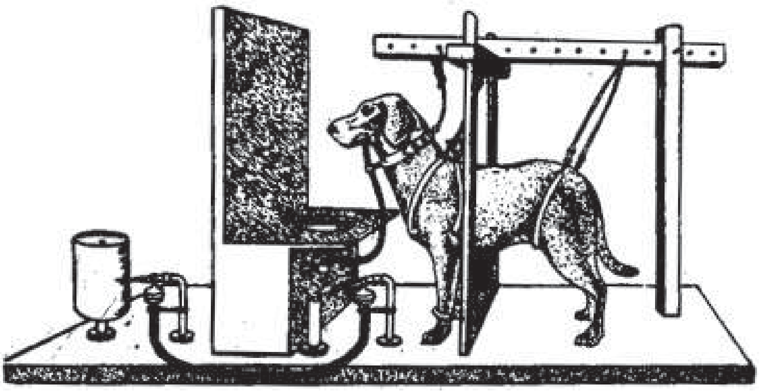

চিত্র ২৪.১ : পাভ্‌লভের পরীক্ষার যন্ত্র। অর্জিত প্রতিবর্তগুলি পরীক্ষার জন্য রুশ বিজ্ঞানীর দ্বারা উদ্ভাবিত যন্ত্রটির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পাভ্‌লভের বিখ্যাত কুকুরগুলির মধ্যে একটি দাঁড়িয়ে আছে। নলবাহিত লালা একটি বীকারে নীত হয়ে বামদিকে পর্দার পিছনে কলমের সঙ্গে যুক্ত একটি লিভারকে সক্রিয় করত। প্রত্যেক লালাবিন্দু ঘূর্ণমান ড্রামটির উপরে একটি চিহ্নের আকারে নথিভুক্ত হত। দৃশ্যত কুকুরগুলি তাদের কাজ উপভোগ করতে শিখেছিল এবং না বলতেই মঞ্চটির উপরে লাফিয়ে উঠত।

এটি অবশ্য যে-কোনো কুকুরেরই একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তার খাদ্য পেলেই সে লালাক্ষরণ শুরু করে। কিন্তু একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। খাদ্য সামনে রাখবার আগেই যন্ত্রপাতি বা পরীক্ষাকারীকে দেখে সে লালাক্ষরণ করতে শুরু করছিল। পাভ্‌লভ এটিকে পরীক্ষার পক্ষে অসুবিধাজনক বিবেচনা করতে পারতেন, কিন্তু বিজ্ঞানী বলেই তিনি এসম্বন্ধে কৌতূহলী হতে শুরু করলেন।

পাভ্‌লভ জানতেন, খাদ্যদর্শনে লালাক্ষরণ ঘটা একটি **স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া।** জন্ম থেকে প্রতিটি কুকুরের এরকম ঘটে থাকে; কিন্তু অন্য প্রতিক্রিয়াটি একটু নূতন ধরনের ছিল, যাকে আমরা একটি **অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** বলতে পারি। খাদ্যের সঙ্গে অন্য উদ্দীপনাগুলির সম্বন্ধ কুকুরটিকে বোঝাতে পারা যায় কিনা, এবারে তিনি তা অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একটি নিদর্শনমূলক পরীক্ষায় কুকুরকে মাংস দেবার অব্যবহিত আগে একটি ঘণ্টা বাজানো হল এবং কয়েকবার তার পুনরাবৃত্তি করা হল। পাভ্‌লভ লক্ষ করলেন, এবারে খাদ্য না দিলেও ঘণ্টাটি বাজানোমাত্র কুকুরটি লালাক্ষরণ শুরু করছে। পশুটি খাদ্য ও ঘণ্টা, এই দুই উদ্দীপনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে ফেলেছিল, তাই একটির জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পদগুলি সারণি ২৪.১-এ দেখানো হচ্ছে।

সারণি ২৪.১

পাভ্‌লভের পরীক্ষার পদসমূহ

	উদ্দীপনা	প্রতিক্রিয়া
প্রশিক্ষণের আগে	ঘণ্টাধ্বনি	কুকুরের মনোযোগ আকৃষ্ট হল, কিন্তু লালাক্ষরণ ঘটল না।
	খাদ্য	লালাক্ষরণ (স্বাভাবিক প্রতিবর্ত)
প্রশিক্ষণের সময়ে	ঘণ্টাধ্বনি ও খাদ্য	লালাক্ষরণ
প্রশিক্ষণের পরে	শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনি	লালাক্ষরণ (অর্জিত প্রতিবর্ত)

মানুষও এই সরল মডেল অনুসারেই নানা বিষয় শিখে থাকে। কোনও ব্যক্তি বারবার আপনার মঙ্গল করে থাকলে আপনি হিতৈষণাকে তার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে শুরু করতে পারেন। কখনও কখনও প্রবঞ্চক ব্যক্তিরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে কয়েকটি সরল ভালো কাজের দ্বারা আপনার আস্থা অর্জন করে এবং আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার পরে আপনার যথাসর্বস্ব নিয়ে অন্তর্ধান করতে পারে।

২৪.২.২ পুরস্কার ও শাস্তি

পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে অন্য একপ্রকার শিক্ষাও এসে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আপনার একটি পালিত কুকুরশাবক থাকে এবং তাকে 'বসো' এই আদেশ পালনের প্রশিক্ষণ দিতে চান, সে 'বসো' কথাটি বুঝবে না, কারণ এই ভাষা সে বোঝে না। কিন্তু আপনি যদি আদেশ দেওয়ার সময়ে তাকে ধরে বসিয়ে দেন এবং একটি বিস্কুট দেন, তাহলে এই অভিজ্ঞতার কয়েকবার পুনরাবৃত্তি ঘটলে কুকুরশাবকটি আদেশটি পালন করতে শিখবে। বসতে আদেশ দেওয়ার শব্দকে কুকুরছানাটি বিস্কুট পুরস্কারের সঙ্গে অনুষঙ্গিত করে নেবে। প্রশিক্ষণের পরে কুকুরছানাটি কোনও পুরস্কার না পেলেও 'বসো' বলে আদিষ্ট হলেই বসে পড়বে। কতকগুলি অবস্থায় শাস্তিদানেও একই ফললাভ হবে।

এরকম সব পদ্ধতিতে আমরা অনেক বিষয়ে শিখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও শিশু ক্ষুধার্ত হলে কাঁদতে পারে, যাতে তার জননীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে তাকে দুধ খাওয়ানো হতে পারে। শিশুটি অচিরেই এই কৌশলটি শিখে যায়। অনুরূপভাবে, কোনও ছাত্র গণিত ক্লাসে একটি সমস্যার সঠিক সমাধান করে শিক্ষকের কাছে প্রশংসা পায়। পরের বারে শিক্ষকের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সে আরও উৎসাহে অন্যান্য গাণিতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। আমরা সকলেই এমন অবস্থাগুলির সঙ্গে পরিচিত যেখানে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রশমনের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ পদ্ধতি হল নিতম্বে চপেটাঘাত বা ভর্ৎসনা করা অথবা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা। যথা, লাল আলো উপেক্ষা করে গাড়ি চালিয়ে গেলে ট্রাফিক পুলিশ মোটরচালকদের জরিমানা করে, অথবা হোমওয়ার্ক না করলে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের 'দূরদর্শন' দেখতে অনুমতি দেন না।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তির এই নীতি বিস্তারিত ভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ স্কুলে শিক্ষকেরা অবিরত সুকৃতিকে উৎসাহিত বা পুরস্কৃত করছেন এবং মন্দ কৃতি বা কাজকর্মকে নিরুৎসাহিত করছেন বা শাস্তি দিচ্ছেন। সমাজ ও জনসংগঠনগুলিতে একই নীতি অনুসৃত হয়। কোনও ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনশীলতার জন্য বোনাস অথবা উৎপাদনে ঘাটতির জন্য বেতন কাটা একই ধরনের দৃষ্টান্ত।

সাইকেল চড়া শেখার মতো সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারাও আমরা শিখতে পারি। পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বারবার আমরা সাইকেল চড়তে চেষ্টা করি। এর কারণ হল, সাইকেল চালানো শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ আছে অথবা সাইকেল চালাতে শেখায় কোনও সুবিধা আমরা দেখতে পাই। এখানে শিক্ষাপদ্ধতির বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, প্রতিটি ভুলের পরে সেটিকে পরের বার এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস করা হয়। দ্রুত শেখবার নিশ্চিততম পথ হল, আপনার ভুলগুলি সংশোধনের ইচ্ছা। নমনীয়তা শিক্ষার সহায়ক এবং নিজের ভুলত্রুটি দেখার বা তার সংশোধন করার বিষয়ে অনমনীয়তা বা অনিচ্ছা ব্যর্থতার নিশ্চায়ক। অন্ধবিশ্বাসী হলে অথবা যা কিছু শেখার আছে তা ইতিপূর্বেই জানি এমন অনুভূতি থাকলে আমরা কিছুই শিখব না।

২৪.২.৩ জ্ঞানীয় শিক্ষা

সাধারণভাবে শিক্ষায় চারটি বিষয়ের মুখ্য ভূমিকা আছে। এগুলি হল, স্মৃতি, যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। অবশ্যই স্মৃতির খুবই গুরুত্ব আছে কারণ এটি হল সেই পদ্ধতি যার দ্বারা আমরা আমাদের মনে তথ্য ধরে রাখি। কিন্তু মাত্র স্মৃতিই যথেষ্ট নয়; একাধিক পুস্তক সম্পূর্ণ মুখস্থ করেও কোনও ব্যক্তি মুর্খ থাকতে পারে। স্মৃতির দ্বারা বাহিত তথ্যকে যুক্তির অধীনে আনতে হবে, যা মস্তিষ্কে সেরিব্র্যাল কর্টেক্সের বাম গোলার্ধে ঘটে থাকে বলে আমরা একক ২৩-এ দেখেছি।

যুক্তিবিচার তথ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অথবা বিভিন্ন ভাব ও ধারণার মধ্যে যোগাযোগ বুঝতে দেয়; যেমন, সূর্যোদয় ও দিনের আলোর মধ্যে অথবা পুঞ্জীভূত মেঘ ও সম্ভাব্য বর্ষণের মধ্যে। যুক্তির মাধ্যমেই কার্যকারণ সম্পর্কও ব্যাখ্যা করা হয়। যুক্তি প্রয়োগ করলে আমাদের কাছে প্রদত্ত তথ্যের অধিকতর অর্থ করতে পারি এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। যেমন, একটি খুনের বিষয়ে নানা তথ্য থেকে যুক্তি ও বিশ্লষণের ভিত্তিতে কে খুন করেছে অথবা কীভাবে খুনটি হয়ে থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এজন্য বিশ্লেষণকে স্মৃতি বা যুক্তির চেয়ে উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া বলে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণের বহু ক্ষেত্র থেকে তথ্যগুলিকে মিলিত করে একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রস্তুত করতে হয়। পদ্ধতিটি হল, প্রথমে বিষয়গুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে নিয়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা এবং পরে সম্পূর্ণভাবে কিছু বোঝার জন্য সেগুলিকে একত্রিত করা অর্থাৎ সংশ্লেষণ করা। সংশ্লেষণকে এমনকি বিশ্লেষণের চেয়েও উচ্চতর স্তরের মানসিক ক্রিয়া বলা যায়। এর অর্থ এই নয় যে এসব পদ্ধতি পৃথক পৃথক ভাবে অথবা একের পর এক ঘটে থাকে। যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত বা উপলব্ধির উদয় হয়, মনে যুক্তিপ্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ অগ্রপশ্চাৎ চলতে থাকে। এরকম শিক্ষা যা মোটামুটি জটিল এবং যার সঙ্গে চিন্তার পদ্ধতিগুলি বিজড়িত, তাকে **জ্ঞানীয় (cognitive) শিক্ষা** বলা হয়। প্রত্যেক ছাত্রের এবিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং আমরা সবাই আমাদের সারা জীবন ধরে এই সাধারণ উপায়েই জ্ঞান অর্জন করি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্যক্তির মানসিক সামর্থ্য কীভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে, সেবিষয়ে সুইস মনোবিজ্ঞানী জাঁ পিয়াজের (Jean Piaget) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কাজ আছে। দীর্ঘকালব্যাপী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময়ে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে তিনি চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন। সারণি ২৪.২-এ আমরা আপনাদের এগুলি মাত্র একনজরে দেখাতে পারি।

> 'জাঁ পিয়াজে—শিশুর বিকাশের দশাগুলি' (Jean piaget—Developmental stages of the child) শীর্ষক ভিডিও কার্যক্রমটি দেখে নিতে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সারণি ২৪.২

শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দশা

দশা	প্রত্যেক দশার সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণ
সংবেদ-চেষ্টীয় কাল—জন্ম থেকে ২ বৎসর	এটি সংজ্ঞাবহ তথ্যের সঙ্গে চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়সাধনের কাল। দৃশ্য, শব্দ ও গন্ধ প্রথমে খাওয়া, আদর করা এবং সকল ভালো জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত সংকেত রূপেই থাকে। কিন্তু শীঘ্রই শিশুরা দূরত্ব বিচারের এবং নিজের হাত দিয়ে জিনিসপত্র ধরে ফেলার জন্য কঠিন চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রায় দশ মাস নাগাদ বয়সে তারা আবিষ্কার করে, কোনও জিনিস দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও তার তখনও অস্তিত্ব থাকে। একে বস্তুর চিরস্থায়িত্ব বলা হয়। তাদের কাছ থেকে লুকানো কোনও মুখ

দশা	প্রত্যেক দশার সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণ
	বা খেলনা তারা খোঁজার চেষ্টা করবে। তারা চলতে শেখে এবং কথা বলতে আরম্ভ করে। যুক্তিসম্মত ব্যাকরণগত ক্রমে শব্দগুলি সাজানোর এবং অর্থবহ বাক্য রচনার বিষয়ে শিশুদের ক্ষমতা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট বিস্ময়ের বিষয়।
প্রাক্-ক্রিয়াকলাপ কাল—২ থেকে ৭ বৎসর বয়স	শীঘ্রই বালকবালিকারা প্রতীক ও ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে, কিন্তু তারা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে অন্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পায় না। নিজেদের তারা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচনা করে। তাদের যুক্তির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। কোনও বস্তুর আকার বদলালেও তার পরিমাণ একই থাকবে, একথা তারা বুঝতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনুরূপ আকারের কাচপাত্র ক এবং খ-এ (চিত্র ২৪.২ দেখুন) সমপরিমাণ তরল পদার্থ আছে, বালক বা বালিকা তা বোঝে; কিন্তু খ থেকে তরল পদার্থ একটি সরু লম্বা কাচপাত্র গ-এ ঢেলে দিলে সে বলবে, গ-এ বেশি তরল পদার্থ আছে। এই বয়সে বালকবালিকাদের স্মৃতিশক্তি খুব ভালো থাকে : তারা সহজেই মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু বারবার স্মৃতিচারণ না করলে তারা ভুলেও যায়।

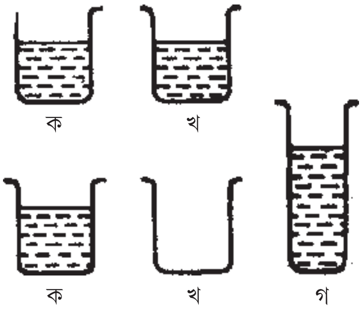

চিত্র ২৪.২।

দশা	প্রত্যেক দশার সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণ
বাস্তবনির্ভর ক্রিয়াকলাপ—৭-১১ বৎসর	চিন্তাধারা যৌক্তিক হয়ে ওঠে। এখন আর লম্বা কাচপাত্র দিয়ে বালকবালিকাদের বোকা বানানো যায় না। অবশ্য এর কেবল বাস্তব ও তাৎক্ষণিক বিষয়ই বুঝতে পারে। প্রকৃত অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়ে অথবা "ন্যায়" বা "সততা"র মতো বিমূর্ত ধারণা সম্বন্ধে বালকবালিকাকে শেখাতে চেষ্টা করলে মাতাপিতা ও শিক্ষকেরা নিরাশ হতে পারেন। বালকবালিকারা ওজন ও আকারের মতো কোনও মাত্রার প্রসঙ্গে দুটি জিনিসের তুলনা করার ক্ষমতাও অর্জন করে; যথা ক খ-এর চেয়ে এবং খ গ-এর চেয়ে বেশি লম্বা হলে তারা বলবে, ক গ-এর চেয়ে অবশ্যই বেশি লম্বা।
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ—১১ বৎসরের ঊর্ধ্বে	এখন বালকবালিকারা বিমূর্ত ধারায় ভাবতে শুরু করতে পারে। তারা যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং কোনও সমস্যার উপাদানগুলিকে খুঁজে বার করতে পারে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে বয়স্কজনোচিত চিন্তাধারার উদয় হয়।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, এগুলির সব কটিরই ভিত্তি হল সুইজারল্যান্ডে বালকবালিকার সম্বন্ধে সাধারণ পর্যবেক্ষণ। আমাদের দেশে বালকবালিকারা ভিন্ন ধরনের পারিবারিক জীবন পায় এবং এই সাধারণ অবস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঠিক একাত্মতা না থাকতে পারে। তা ছাড়া জৈব কারণবশত ব্যাপক ব্যক্তিগত

বৈষম্য থাকতে পারে—কিছু ছেলেমেয়ে সাধারণের উপরে, কিছু বা সাধারণের নীচে থাকতে পারে। আপনার পাশাপাশি বালকবালিকা থাকলে আপনি নিজেই তাদের মানসিক বিকাশের এই স্তরগুলির মধ্যে কয়েকটি আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারেন।

পক্ষান্তরে, একেবারে শৈশব থেকে ১২-১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানসিক বিকাশের ধারা থেকে দেখা যায় যে জীবনের বিভিন্ন দশায় বালকবালিকা কতটা শিখতে পারে তার সীমা আছে। যে শিক্ষাবিদেরা পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করেন, তাঁদের পক্ষে এই তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তথ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আমরা যদি এমন কোনও বালক বা বালিকাকে বিমূর্ত ধারণাগুলি শেখাতে চেষ্টা করি, যার এসব ধারণা বোঝার মতো মানসিক ক্ষমতা বিকশিত হয়নি, তাহলে উত্তর মুখস্থ করা এবং নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের জীবনে এধরনের ঘটনা খুব প্রায়শই ঘটে থাকে; ফলে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষারীতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষার পদ্ধতি অপেক্ষা মুখস্থ করা বা পুনরাবৃত্তি-নির্ভর শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে।

অনুশীলনী ১

(ক) প্রদত্ত তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(১) কোনও আচরণ বৈশিষ্ট্যমূলক হলে এবং অনুশীলনের দ্বারা প্রভাবিত না হলে, তা হল ————————।

(২) ———————— কোনও প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা হ্রাস করে।

(৩) কোনও কোনও খাদ্যের সম্বন্ধে মন্দ অভিজ্ঞতার জন্য তার দর্শনে বা ঘ্রাণে যে বিতৃষ্ণার অনুভূতি জন্মায়, তা হল একটি ————————।

(৪) কোন কুকুরকে অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে প্রধানত ————————-এর মাধ্যমে শিক্ষা।

(৫) পাঠ্যপুস্তকের তথ্য শেখা এবং মনে রাখার সঙ্গে জড়িত থাকে ————————।

(শাস্তি, জ্ঞানীয় শিক্ষা, অর্জিত প্রতিবর্ত, সহজাত প্রবৃত্তিগত, পুরস্কার)।

(খ) ডানদিকের কলমের নির্ভুল উক্তিগুলিকে বামদিকের কলমে দেওয়া উক্তিগুলির সঙ্গে মেলান। দৃষ্টান্ত হিসাবে আপনাদের হয়ে একটি ক্ষেত্রে আমরা করে দিয়েছি।

পিয়াজের (Piaget) মানসিক বিকাশবাদ অনুযায়ী :

(১) ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	[গ]	(ক) প্রাক্-ক্রিয়াকলাপ কাল
(২) বাল্যকালের প্রথমদিকে ২ থেকে ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকা প্রায়ই নিজেদের পৃথিবীর কেন্দ্র বলে বিশ্বাস করে।	[ ]	(খ) বালকবালিকারা যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা করতে শেখে, কিন্তু বিমূর্ত ধারণাগুলি বুঝতে পারে না।
(৩) ১১ বৎসর এবং তার ঊর্ধ্বে	[ ]	(গ) সংবেদ-চেষ্টীয় কাল।
(৪) বাস্তবনির্ভর ক্রিয়াকলাপের কালে	[ ]	(ঘ) বালকবালিকারা প্রকল্পিত পরিস্থিতির ব্যবহার করে চিন্তা করতে এবং যুক্তি দেখাতে পারে।

২৪.৩ বুদ্ধ্যঙ্ক

প্রাপ্তবয়স্কদের দিকে ফেরা যাক। তাঁদের ক্ষেত্রে জ্ঞানীয় শিক্ষা স্মৃতি, যুক্তিপ্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপরে নির্ভর করে। অবশ্য সকল মানুষ সমান নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একটি স্বাভাবিক বৈষম্য আছে এবং যে “পরিবেশ” বা শিক্ষার সুযোগসুবিধা কোনও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছে, তার জন্যও একটি বৈষম্য ঘটেছে। কাজেই মানসিক ক্ষমতায় পার্থক্য বর্তমান এবং তার পরিমাপের প্রয়োজন আছে। জ্ঞানীয় বিকাশে কৃতি সর্বাধিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির অনুপাত বা ‘বুদ্ধ্যঙ্ক’ (IQ) হিসাবে মাপা হয়। এটি কী বোঝায়, তা দেখা যাক। একটি সুবিধাজনক উপায় হল MA/CA অনুপাতের আকারে এর সংজ্ঞা দেওয়া। MA কোনও ব্যক্তির মানসিক বয়স (mental age) এবং CA তার সাধারণ কালিক বয়স (chronological age) বোঝায়। অতএব IQ বা বুদ্ধ্যঙ্কের সংজ্ঞা দাঁড়ায় : (মানসিক বয়স/কালিক বয়স) × ১০০ (MA/CA × 100)। গুণক হিসাবে ১০০ ব্যবহার করা হয় যাতে মানসিক বয়স কালিক বয়সের সমান হলে বুদ্ধ্যঙ্কের মান ১০০ হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তির বয়স ২০ বৎসর এবং বুদ্ধি ২০ বৎসর মানসিক বয়সের মতো, তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে ১০০। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, মানসিক বয়স কম হলে বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ থেকে কম এবং বেশি হলে বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ থেকে উপরে হবে। বুদ্ধ্যঙ্কের নানা স্তরের বর্ণনায় সাধারণত ব্যবহৃত বিশেষণগুলি সারণি ২৪.৩-এ দেওয়া হল। লক্ষ করুন, অধিকাংশ লোকের বুদ্ধ্যঙ্কই ১০০-র কাছাকাছি।

সারণি ২৪.৩

স্ট্যান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা অনুযায়ী বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাখ্যা

বুদ্ধ্যঙ্ক	মৌখিক বর্ণনা	জনসমষ্টিতে শতকরা বিস্তার
১৩৯-এর উর্ধ্বে	অত্যুৎকৃষ্ট	১
১২০—১৩৯	উৎকৃষ্ট	১১
১১০—১১৯	উচ্চ গড়	১৮
৯০—১০৯	গড়	৪৬
৮০—৮৯	নিম্ন গড়	১৫
৭০—৭৯	সীমারেখা	৬
৭০-এর নীচে	মানসিক প্রতিবন্ধী	৩
		১০০

বুদ্ধ্যঙ্কের স্তরগুলি মাপার জন্য কয়েকটি অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। চিত্র ২৪.৩-এ এরকম একটি আংশিক পরীক্ষার নমুনা দেওয়া হয়েছে। দেখতে পাবেন, শব্দ, সংখ্যা ও চিত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচিত আছে, সেই ব্যক্তিরা এই অভীক্ষাগুলি ভালোভাবে উত্তর করতে পারেন। কোনও নিরক্ষর গ্রামবাসী কোনও স্কুল-শিক্ষকের মতোই বুদ্ধিমান হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় শিক্ষকটি বেশি নম্বর পেতে পারেন। সুতরাং এই অভীক্ষাগুলি সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত—বিশেষত এগুলির ভিত্তিতে জনসমষ্টির কোনও বিভাগকে যেন হেয় করা না হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিতে পার্থক্য থাকে, তার প্রমাণ আছে; কিন্তু বুদ্ধি প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক মর্যাদা, জাতি, গাত্রবর্ণ বা সম্প্রদায় প্রভৃতির মতো বিষয়ের উপরে নির্ভর করে না। যেমন, শিক্ষাদীক্ষায় উত্তম কৃতির ক্ষমতাকে

পঠনপাঠনের সদভ্যাস অথবা বৌদ্ধিক দক্ষতাগুলির বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ থেকে সহজে পৃথক করা যায় না। বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যে শিশু ইতিপূর্বে এমন এক পরিবেশে অভীক্ষিত হয়েছিল যা বৌদ্ধিক দক্ষতার উন্নতি ঘটায় না, পরিবেশ পরিবর্তনে প্রায়ই তার বুদ্ধ্যঙ্কের মান উন্নত হয়। অবশ্য বেশিদিন আগের কথা নয়, বিশ্বাস করা হত যে বুদ্ধি জন্মকালেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তী জীবনে কোনও কিছুতেই প্রভাবিত হয় না। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপরে পরিচালিত অনুসন্ধান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জন্মের পূর্বে এবং জীবনের প্রথম বৎসরগুলিতে অপ্রতুল পুষ্টি কেবল দেহের বামনত্বই নয়, মনেরও বুদ্ধিহ্রাস ঘটায়।

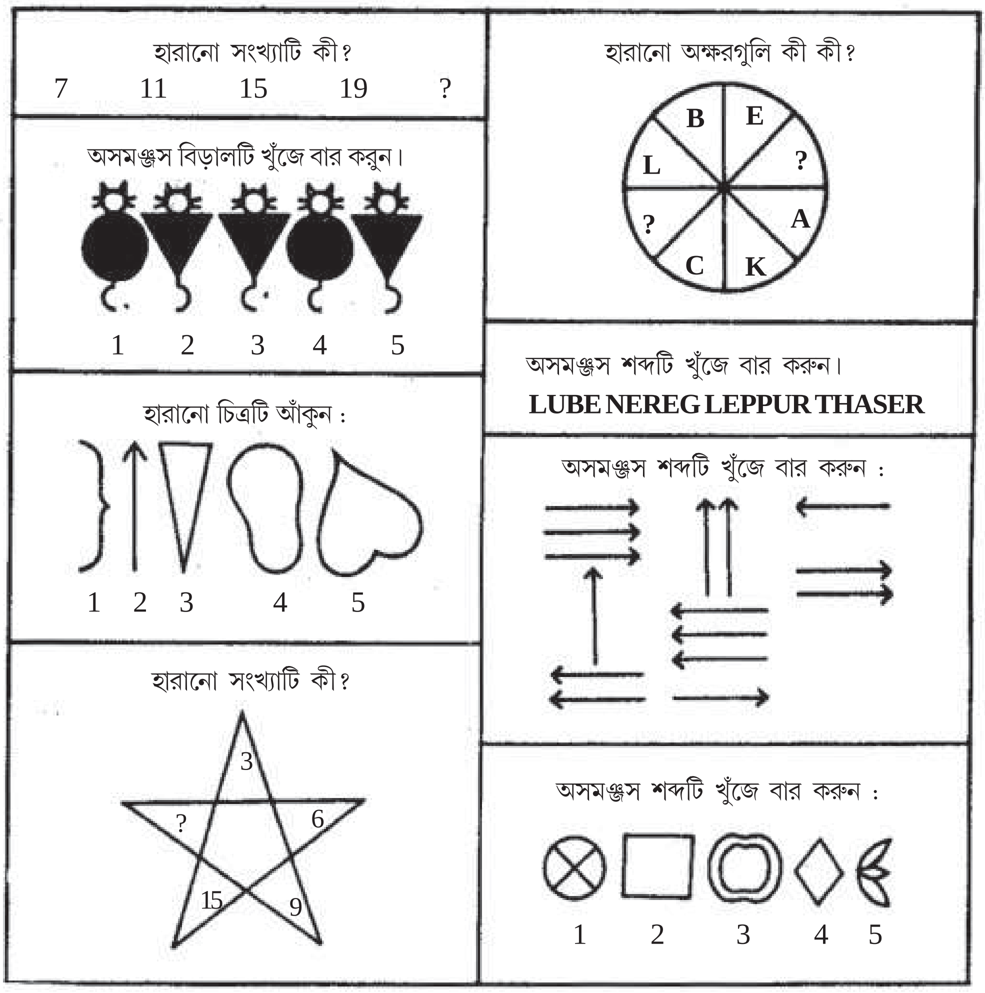

চিত্র ২৪.৩ : বুদ্ধি অভীক্ষার প্রশ্নাবলির নমুনা।

সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সঙ্গে স্কুলে কৃতির উচ্চ সহগতি (correlation) এবং পরবর্তী জীবনে কৃতির নিম্নতর সহগতি থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও সফলতম ব্যবসায়ী বা কোনও ক্রিকেটার বা রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক উচ্চমানের হবে, এমন কোনও কথা নেই।

একটি নিদর্শনমূলক বুদ্ধি অভীক্ষায় ভালো করতে হলে পরীক্ষাধীন পাত্রকে অবশ্যই কোনও সমস্যাকে স্মরণ করতে, চিনতে এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারতে হবে; কিন্তু তাকে কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, নূতন ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কার করা অথবা নতুন এক তত্ত্ব সৃজন করার মতো নূতন জিনিস উদ্ভাবনে সক্ষম হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। শেষোক্ত ক্ষমতাগুলি "সৃজনশীলতা"-র সঙ্গে জড়িত, যা আমরা এর পরে আলোচনা করব।

২৪.৪ সৃজনশীলতা

নূতন ধারণাগুলি উদ্ভাবনের ক্ষমতা যুক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, কারণ যুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই পথে নিয়ে যাবে এবং একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে। নূতন কোনও ধারণা বিবৃত করতে যুক্তি পার হয়ে যেতে হয় এবং তারপরে তার প্রয়োগসিদ্ধতার জন্য পরীক্ষা চালানো যায়। অনুরূপ ভাবে, কোনও শিল্পী যে ছবি আঁকেন, সে কোনও জ্যামিতিক বিবেচনার জন্য নয়, বরং সুন্দর কিছু সৃজনের আবেগে। কথিত হয়, কল্পনাশক্তি সৃজনশীলতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তিরা কোনও বিশেষ অবস্থায় বহু, এমনকি অসামান্য বিকল্পগুলির কথাও অবলীলায় ভাবতে পারেন, সৃজনশীলতার পক্ষে অনুকূল সাবলীল ও নমনীয় ধারণার অধিকারী বলে তাঁরা বিবেচিত। যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ থেকে স্বতন্ত্র এই অসামান্য সামর্থ্যটি বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির মুখ্য অগ্রগতিগুলির এবং সর্বসমাদৃত মহৎ শিল্পকলাগুলির অভিন্ন উৎসস্বরূপ। বিজ্ঞানে নিউটন ও আইনস্টাইন, কলাবিদ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও তানসেন, এবং সমাজবিজ্ঞানে মার্ক্স্ ও গান্ধি এর দৃষ্টান্ত।

দেখা গেছে, অসাধারণ ধারণাগুলির সৃজনে যাঁদের বুৎপত্তি থাকে, বহু প্রথা ও বিধানে তাঁরা কঠিনভাবে আবদ্ধ থাকেন না; আপন আচরণে তাঁরা অধিকতর স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী এবং সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকেন। যেসব ছাত্রের এরকম গুণাবলি দেখা যায়, সব সময়ে তারা তাদের শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র নয়; এমনকি স্কুলের শিক্ষা তাদের কর্মপথের প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হয়। যেহেতু সমাজের অগ্রগতিতে সৃজনশীল ব্যক্তিদের বিশাল অবদান থাকে, শিক্ষা এবং স্কুলব্যবস্থার এমন বিকাশে আমাদের আগ্রহী হওয়া উচিত যাতে তাদের মূল্য সপ্রমাণ করার সুযোগ করে দেওয়া যায়।

সৃজনশীলতার সম্ভাবনা পরিমাপের জন্য উদ্ভাবিত নানা প্রকার অভিক্ষার একটি নমুনা চিত্র ২৪.৪-এ দেখানো হয়েছে। কোনও ব্যক্তির বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার মধ্যে সম্বন্ধ খোঁজার জন্য এরকম আরও কয়েকটি অভিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছিল। ফলাফল থেকে দেখা গিয়েছিল যে বুদ্ধ্যঙ্ক ও সৃজনশীলতার মধ্যে মাত্র নিম্নমাত্রার সহগতি (correlation) বর্তমান।

- কোনও ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক কম হলে তার সৃজনশীলতাও কম ছিল।
- সৃজনশীলতা উচ্চমানের হলে বুদ্ধ্যঙ্ক গড়ের উর্ধ্বে ছিল।
- কিন্তু উচ্চ বুদ্ধ্যঙ্কের অর্থ উচ্চ সৃজনশীলতা, সবক্ষেত্রে এমন দেখা যায়নি।
- গড়ের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধি আছে এমন পরীক্ষাপাত্রদের একটি গোষ্ঠীতে সৃজনশীলতা ও বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

১। উল্লিখিত শব্দটি থেকে পাঁচ মিনিটে আপনি কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারেন, দেখুন।

২। একটি কাগজ আটকানোর ক্লিপের সাহায্যে আপনি কী কী করতে পারেন, পাঁচ মিনিটে তার তালিকা দিন।

৩। একখণ্ড খালি কাগজে পাশের ছবিটির একটি অনুলিপি করে নিয়ে সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি চিত্র আঁকুন।

৪। দশটি মুদ্রা নিয়ে চিত্রে প্রদর্শিত আকারে তাদের সাজান। দুটি মাত্র মুদ্রাকে সরিয়ে এমন দুটি সারি তৈরি করুন, যার প্রত্যেকটিতে ছটি মুদ্রা থাকবে।

CONSTANTINOPLE

চিত্র ২৪.৪ : কোনও ব্যক্তির সৃজনশীলতা পরিমাপের জন্য যে ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, তার একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

উপরের পরিচ্ছেদে যা শিখেছেন, আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এই অনুশীলনীটির উত্তর দিতে চেষ্টা করে তা পরীক্ষা করুন।

অনুশীলনী ২

(ক) প্রত্যেক সঠিক উক্তিকে তার পাশে দেওয়া প্রকোষ্ঠে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(১) বুদ্ধ্যঙ্ক মাপা প্রকৃতপক্ষে হল কোনও ব্যক্তির মানসিক বয়স মাপা। [ ]

(২) অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত লোকেদের বুদ্ধ্যঙ্ক কম হতে বাধ্য। [ ]

(৩) আমেরিকায় ব্যবহৃত বুদ্ধ্যঙ্কের অভীক্ষাগুলি ভারতে ব্যবহারের পক্ষে সর্বোত্তম। [ ]

(৪) উচ্চ সৃজনশীল ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যঙ্ক অবশ্যই ১৪০ হবে। [ ]

(৫) ছাত্র বা ছাত্রীর যুক্তিপ্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ক্ষমতা তার স্কুলশিক্ষার উপরে নির্ভর করে। [ ]

(৬) বুদ্ধি হল কোনও সমস্যার একটিমাত্র সমাধান খুঁজে বার করা এবং সৃজনশীলতা হল বহু সম্ভাব্য সমাধানের খোঁজ করা। [ ]

(খ) চিত্র ২৪.৪ দেখুন এবং সেখানে প্রদত্ত সৃজনধর্মী কাজগুলি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন।

২৪.৫ কৈশোর

'মন ও দেহ' সম্বন্ধীয় একক ২৩-এ আপনারা ইতিপূর্বেই পড়েছেন যে কয়েকটি হরমোন কোনও ব্যক্তির যথাযথ দৈহিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ১২ বৎসর বয়স নাগাদ একটি সময় আরম্ভ হয় যখন দেহে বিশেষ বিশেষ হরমোন ক্ষরিত হয় এবং বাল্যকাল থেকে প্রাপ্তবয়সে রূপান্তর ঘটে। এই সময়টিকে **কৈশোর** বলে। এসময়ে অতি দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জননাঙ্গগুলির এবং পুরুষের দাড়ি ও নারীর স্তনের মতো গৌণ যৌন লক্ষণগুলির ক্রমবিকাশ ঘটে। কৈশোরের বয়ঃসীমা সাধারণত বারোর কাছাকাছি থেকে প্রায় আঠারো বৎসর পর্যন্ত, যখন দৈহিক বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

কৈশোরে শুধু দৈহিক বৃদ্ধিই দ্রুত এমন নয়, বরং তার যৌনবিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটায়। জ্ঞানের ভিত্তি ও জ্ঞানীয় বিকাশ এমন স্থানে পৌঁছায় যে জীবনের নানা প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্যক্তিটি মোটামুটি পরিষ্কার ভাবে তার ধারণাগুলি ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। লোকে নিজস্ব জাগতিক দৃষ্টিকোণ বা আদর্শের এবং তা থেকে নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। পরিণামে তারা আর বালক বা বালিকা থাকে না; সাধারণ ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম পুরুষ বা নারীতে পরিণত হয়। কৈশোর দশার পাঁচ-ছয় বৎসর প্রত্যেকের পক্ষেই অত্যন্ত বিনিশ্চায়ক (crucial); যেহেতু এই বৎসরগুলি সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বা কলেজের প্রথম বর্ষ পর্যন্ত সময়ের প্রতিষঙ্গী, অতএব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আচরণে শিক্ষকদের এগুলির কথা মনে রাখার গুরুত্ব আছে। এই রূপান্তর তরুণ ব্যক্তিটিকে অসুন্দর ও বিভ্রান্ত, অতীব আগ্রাসী বা অতিমাত্রায় নিরীহ করে তুলতে পারে। কিন্তু বাল্যকাল ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠার এবং বিশ্বকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এক আত্মবিশ্বাসী সদস্য হিসাবে জগতের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতাও বিস্ময়কর।

অনুশীলনী ৩

নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) ———————— হল বাল্যকাল থেকে প্রাপ্তবয়সে রূপান্তরের সময়।

(খ) শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলি বালকবালিকাদের মধ্যে দৃষ্ট ———————— -এর জন্য দায়ী।

(গ) কৈশোর প্রায়ই মানসিক চাপ এবং আবেগের অস্থিরতার কাল, কারণ এই সময়টি ———————— -এর অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত।

(গৌণ যৌন লক্ষণসমূহ, ব্যক্তিগত সত্তা, কৈশোর)

২৪.৬ আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব ও নৈরাশ্য

আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছিলাম যে কৈশোরে কোনও ব্যক্তিকে নূতন দৈহিক ও মানসিক অবস্থাগুলির সঙ্গে উপযোজন করতে হয়। কীভাবে আমাদের সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা হবে, সেবিষয়ে প্রায়ই বাছাবাছি করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কখনও কখনও বেছে নেওয়া সহজ, যেমন—নীল না সবুজ, কোন পোশাক পরা হবে। অন্যান্য সময়ে দ্বন্দ্ব আমাদের উভয়সংকটে ফেলে দিতে পারে, যেমন—সিনেমায় যাওয়া হবে, না বাড়িতে পড়াশুনা করা হবে। বিবাহ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চাকরি পরিবর্তনের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠে উদ্‌বেগ এমনকি নৈরাশ্য সৃষ্টি করতে পারে। আমরা প্রায়ই কিছু হবার বা কোনও পদলাভ বা উদ্দেশ্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, কিন্তু এরকম আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য পরিবার, চাকরির ধরন বা কর্মস্থল অথবা অন্যান্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। **দুই ভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব** থাকলে সেই অবস্থা মানসিক চাপের এক অব্যক্ত উৎস হয়ে ওঠে। আপনি যুগপৎ ভালো খেলোয়াড় হতে এবং ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে চাইতে পারেন। দুটি কাজের জন্যই আপনার অবশ্যই বহু সময় চাই। কাজেই আপনাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্বন্দ্বের মীমাংসা বা সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে গুরুতর মনোস্তত্ত্বীয় বা মানসিক বৈকল্য গড়ে উঠতে পারে।

আপনি নিরাশ হলে কী ঘটে? আপনি বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হন, যার ফলে যুক্তিবিরুদ্ধ অপ্রীতিকর বা অস্বাভাবিক ধরনের আচরণের উদ্ভব হতে পারে। পরে এই প্রতিক্রিয়াগুলির দিকে দৃষ্টি দেব। কিন্তু নৈরাশ্যের অনুভূতি কোনও সমস্যার সংকেত দেয় যার সমাধান করতে হবে। সাধারণত সমস্যাটি সহজে শনাক্ত করা যায় না এবং তাকে শনাক্ত করাই হল প্রথম লড়াই। প্রত্যেককে নিজ নিজ অভিপ্রায় ও পছন্দগুলি খুঁজতে হয় এবং প্রকৃত বাধাগুলি ঠিক কোথায়, তা পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু একবার এটি করা হলে আমরা আমাদের বিকল্প পছন্দগুলি সম্বন্ধে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এজাতীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের মানসিক বৃদ্ধি ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও ছাত্র পরীক্ষায় ভালো করতে না পারায় অকৃতকার্য হল, ফলে সে নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন সে তার ব্যর্থতার কারণটি শনাক্ত করতে পারে—অন্য বিষয়ে তার আগ্রহ পড়াশুনায় বাধা দিয়েছে কিনা, বা বন্ধুরা মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে কিনা, অথবা শিক্ষক ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেননি কিনা, ইত্যাদি—তখন সে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার চেষ্টা করতে পারে। অমীমাংসিত নৈরাশ্য থেকে এক অদ্ভুত আচরণের সৃষ্টি হতে পারে, যাকে বলা হয় "আগ্রাসন" বা আক্রামক আচরণ।

২৪.৭ আগ্রাসন

আমাদের ক্রোধ ও বৈরিতাকে সংযত করা প্রায়ই আমাদের পক্ষে কঠিন হয় এবং তা থেকে "আগ্রাসন" বা আক্রামক আচরণের উদ্ভব ঘটে। এর দ্বারা আমরা কী বোঝাই, তার সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। আগ্রাসনকে প্রায়ই অন্য ব্যক্তিকে দৈহিক বা মৌখিক ভাবে আহত করার অথবা সম্পত্তি নষ্ট করার **অভিপ্রায়** বলে বর্ণনা করা হয়। লক্ষ করুন, অভিপ্রায় শব্দটিতে জোর দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কারো পা মাড়িয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, সেই কাজটিকে আগ্রাসী বলা যাবে না। কারণ আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে না মাড়াননি।

২৪.৭.১ সহজাত প্রবৃত্তি অথবা অর্জিত?

আগ্রাসনের সংজ্ঞা দেওয়ার পরে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করা যাক, এটি একটি মৌল সহজাত প্রবৃত্তি না একটি অর্জিত আচরণ। কিছু মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, আগ্রাসন একটি স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি। এর সমর্থনে তাঁরা অন্তত দুই রকমের যুক্তি দর্শান। প্রথমত, এটি সুদূরপ্রসারী। আমাদের ইতিহাস প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস এবং আমাদের সমাজে প্রত্যহ বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটার কথা আমরা শুনি। দ্বিতীয়ত, প্রাণীদের মধ্যে প্রত্যেক দশায় আমরা আগ্রাসী আচরণের কথা জানি; এমনকি আগ্রাসী আচরণের জন্য আমরা প্রাণীদের নির্বাচনমূলক প্রজন ঘটাতে পারি, যেমন—বুলডগ, হাউন্ড ও টেরিয়ার পুড্‌ল্‌-এর মতো অন্যান্য কুকুরদের চেয়ে অধিকতর আগ্রাসী। এরকম কুকুরদের শিকারের জন্য এবং পুলিশি কুকুর হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পুরাতন কালে রাজা ও নবাবেরা দ্বন্দ্বক্রীড়ার জন্য ভেড়া, মোরগ, ঈগল প্রভৃতির প্রজনন ও প্রশিক্ষণ করাতেন। আগ্রাসী প্রকৃতির জন্য এগুলির কুলজি অব্যাহত রাখা হত। অন্যদিকে আরেক দল মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে আগ্রাসন নৈরাশ্য ও দ্বন্দ্বের ফল এবং শিক্ষাদ্বারা অর্জিত প্রতিক্রিয়া; এটিকে নিষ্ক্রমণপথ পেতেই হবে। আমরা এই বিষয়টি পরে ব্যাখ্যা করব।

২৪.৭.২ আগ্রাসনের জৈব ভিত্তি

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হাইপোথ্যালামাসের এক বিশেষ অংশের মৃদু বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রাণীদের আগ্রাসী আচরণ উৎপন্ন করে। মস্তিষ্কে তড়িৎ-দ্বার বপন করে ও বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বিড়ালের হাইপোথ্যালামাসকে উদ্দীপিত করলে তার লোম খাড়া হয়ে উঠল, সে হিস্ হিস্ শব্দ করল, পিঠ ধনুকের মতো বাঁকালো এবং খাঁচার মধ্যে যা কিছু রাখা হল তাকেই আঘাত করে গেল।

বানরের মতো উচ্চতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এই সহজাত প্রবৃত্তিঘটিত আচরণসমষ্টি দেখা যায় না। এদের আচরণ কেবল হাইপোথ্যালামাসের উদ্দীপনার দ্বারা নয়, বরং সেরিব্র্যাল কর্টেক্সের দ্বারাই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। হাইপোথ্যালামাস সেরিব্র্যাল কটেক্সে বার্তা পাঠায় যে তার আগ্রাসনকেন্দ্রগুলি উদ্দীপিত হয়েছে; তখন পরিবেশে কী চলছে এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতিতে কী সঞ্চিত আছে, সেসব বিবেচনা করে কর্টেক্স্ প্রতিক্রিয়া নির্বাচন করে।

আমাদেরও মস্তিষ্কে এমন কেন্দ্র আছে যেগুলি আমাদের আগ্রাসী আচরণ করায়। কিন্তু সেগুলিকে সক্রিয় করা জ্ঞানীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। যে উদ্দীপনায় স্বাভাবিক ব্যক্তিদের কোনও প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হবে না, তারই প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত কোনও কোনও ব্যক্তি আগ্রাসী আচরণ করতে পারেন। এমন সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেরিব্র্যাল কর্টেক্স্ই ছিল মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল। স্বাভাবিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে আগ্রাসী আচরণ প্রধানত সামাজিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা নির্ণীত হয়।

২৪.৭.৩ অর্জিত প্রতিক্রিয়ারূপী আগ্রাসন

পূর্বের পরিচ্ছেদটি পাঠ করে আপনাদের নিশ্চয় এই ধারণা হয়েছে যে আগ্রাসন মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তিমাত্র নয়। লক্ষ্যে অন্তরায় ঘটায় যে ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, মানসিক চাপের পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যা শিখেছে তার উপরে নির্ভর করে সে আগ্রাসী আচরণ করতে বা না করতে পারে।

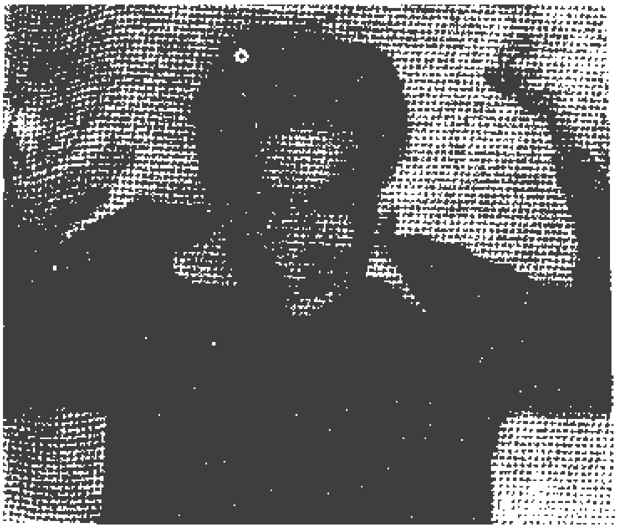

চিত্র ২৪.৫ : নৈরাশ্য আগ্রাসী আচরণের অন্যতম কারণ।

চিত্র ২৪.৬ : প্রাণীদের ক্ষেত্রে আগ্রাসন সহজাত প্রবৃত্তিঘটিত।

আরও বিশদ করার জন্য ধরা যাক, আপনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অথবা কিছু পড়ছেন যার জন্য মনোযোগের প্রয়োজন। আপনার প্রতিবেশী তারস্বরে রেডিয়ো চালাচ্ছেন। আপনি সম্ভবত প্রথমে গিয়ে তাঁকে আওয়াজ কমাতে বলবেন। তিনি যদি অস্বীকার করেন, কী করবেন তা আপনাকে ভাবতে হবে।

- আপনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু রূঢ় শব্দ বিনিময় করতে পারেন, অথবা
- আপনি তাকে প্রহারও করতে পারেন,
- অন্য একটি বিকল্প হতে পারে, আপনার মেজাজকে ঠান্ডা হতে দিন অথবা আরও নিভৃত জায়গায় সরে যান। এতে আপনি আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে বিষয়টি এমন সময়ে আলোচনা করতে পারবেন যখন আপনারা উভয়ে যুক্তিসঙ্গত মেজাজে রয়েছেন।

এই তিনটির মধ্যে আপনি সেই প্রতিক্রিয়াটিই বেছে নেবেন, যা অতীতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সফল হয়েছিল।

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে অনেক সময়েই আগ্রাসী আচরণ উৎপন্ন হয়। দুটি দল নিয়ে একটি অনুসন্ধানে একটি দলকে বন্ধ ও তপ্ত ঘরে এবং অন্য দলকে শীতলতর ও আরামদায়ক ঘরে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি দলের সঙ্গে এক ব্যক্তিকে আগ্রাসী আচরণ করতে বলা হয়েছিল। আরামপ্রদ পরিস্থিতিতে কর্মরত দলটির তুলনায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কর্মরত দলটির ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যজনক ভাবে অধিকতর আগ্রাসী ছিল। শিশুরাও বয়স্কদের অনুকরণে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। কতকগুলি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যে শিশুরা কোনও প্রাপ্তবয়স্ককে আগ্রাসী আচরণ করতে দেখেছে, তারা তাকে অনুসরণ করতে শিখে পরস্পরকে আঘাত করা বা ধাক্কা দেওয়ার মতো অধিকতর আগ্রাসী আচরণ করেছে। পক্ষান্তরে, প্রাপ্তবয়স্কের আগ্রাসী আচরণের সম্মুখীন হয়নি এরকম শিশুদের অন্যান্য দলে আগ্রাসী মনোভাবের কোনও বৃদ্ধি দেখা যায়নি।

আগ্রাসী আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেখা হয় এবং প্রায়ই ফলাফলের দ্বারা বলিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্য বালকদের তুলনায় আকারে বিশাল ও অধিকতর পেশিশক্তির অধিকারী কোনও কিশোর যদি দেখে যে ছোটোদের ভয় দেখিয়ে বা প্রহার করে সে যা চায় তাই পেতে পারে, তবে সে যতবার পারবে এই কাজের পুনরাবৃত্তি করবে।

কখনও কখনও আমরা আমাদের নৈরাশ্যের উৎসের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে আগ্রাসন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে যা হয়, তা হল **স্থানচ্যুত আগ্রাসনের** ঘটনা। ধরুন, ১৫-১৬ বৎসরের একটি বালক তার বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহের শেষটা কাটাতে কোথাও বেরোতে চায় এবং তার মাতাপিতা অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। বালকটি এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু করতে পারে না, কিন্তু ক্রোধে বাড়ির কয়েকটি জিনিসপত্র ভাঙতে বা সশব্দে দরজা বন্ধ করতে অথবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে পারে।

কিছু ক্ষেত্রে এই স্থানচ্যুত আগ্রাসন আমাদের দৃষ্টান্তের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর পরিণতির দিকে এগোতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষতিসাধনের প্রয়াসে নৈরাশ্যের ফলে একদল ধর্মঘটি ছাত্র বা শ্রমিক ক্ষিপ্ত হয়ে জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি এমনকি নিরপরাধ দর্শকদের আঘাত পর্যন্ত করতে পারে।

অনুশীলনী ৪

বামদিকের শব্দটিকে ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশের সঙ্গে বাক্যাংশের সঙ্গে মেলান।

(ক) নৈরাশ্য	(১) পরোক্ষ ক্রোধ	[ ]
(খ) আগ্রাসন	(২) লক্ষ্যপথে অন্তরায় বা বিভ্রান্তির ফলে উদ্ভূত	[ ]
(গ) দ্বন্দ্ব	(৩) অন্য কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করার অভিপ্রায়	[ ]
(ঘ) আকাঙ্ক্ষা	(৪) পছন্দমতো বেছে নেওয়ার প্রয়োজনে	[ ]
(ঙ) স্থানচ্যুত আগ্রাসন	(৫) কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাওয়া	[ ]

২৪.৮ মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং তন্ত্রের সঙ্গে অবিরত মিথস্ক্রিয়া করতে হচ্ছে। কারখানার শ্রমিক, মোটরযানর চালক, মাড়াইকল ও ট্র্যাক্টরের মতো কৃষিযন্ত্র ব্যবহারক কৃষক বা জটিল কম্পিউটার প্রয়োগকারী ব্যক্তি—সর্বস্তরেই এই মিথস্ক্রিয়ার বিস্তার সুদূরপ্রসারী।

বিষয়টির আরও ভালো প্রেক্ষাপট পাওয়ার জন্য আপনাকে 'মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং' (Human Factor Engineering) শীর্ষক অডিও কার্যক্রমটি শুনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটির গুরুত্ব আছে যে শ্রমের সর্বাধিক ফসল পেতে হলে যন্ত্রপাতি ও সেগুলির চালনাপদ্ধতি মানুষের ক্ষমতার উপযোগী হওয়া উচিত। কাজের পরিবেশে মানুষের নৈপুণ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানকে **মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্গোনমিক্স্** বলে। ফলিত মনোবিদ্যার এই শাখায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা মানবোপাদান বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত।

উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও যন্ত্র পরিকল্পনার গুরুত্ব কীভাবে উপলব্ধি করা হয়েছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন বিমানবাহিনীতে বাইশ মাসে চারশ সাতান্নটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনাগুলির এক বিশ্লেষণে দেখা গেল, যথাক্রমে অবতরণ ও ডানাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি নিয়ন্ত্রক লিভারের মধ্যে তারতম্যে বৈমানিকদের বিভ্রান্তি ঘটেছিল। তাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত পেট্রোল আছে কিনা, এমনকি সে সম্বন্ধেও তারা প্রায়ই জানত না। কেবল নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের দ্বারাই যে কুশল বিমানচালক তৈরি করা যায় না, শীঘ্রই তা উপলব্ধি করা গেল। সাজসরঞ্জামের নকশারই পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন পড়ল।

সেই প্রথম যন্ত্রপাতি যাতে মানুষের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় তা সুনিশ্চিত করার প্রয়াসে নকশা-ইঞ্জিনিয়াররা মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কাজ করতে শুরু করলেন। বিমান অবতরণের গিয়ার ও ডানার নিয়ন্ত্রকগুলির আকারের এমন নকশা করা হল যাতে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা গেল এবং ভ্রমের সম্ভাবনা দূর হল। অনুরূপ ভাবে জ্বালানি মাপকের দাগগুলির এমন পরিবর্তন করা হল যাতে জ্বালানির পরিমাণ বাস্তবিক গ্যালনের পরিবর্তে "পরিপূর্ণ", "অর্ধপূর্ণ", "শূন্য" এরকম ভাবে সূচিত হয়। এটা আপনারা নিশ্চয়ই আধুনিক বাস, মোটরযান

প্রভৃতিতে লক্ষ করে থাকবেন। অতএব মানবোপাদান বিশেষজ্ঞদের অপরিহার্য কর্তব্য হল **ব্যবহারকের কথা মনে রেখে যন্ত্রপাতির নকশা করা** যাতে সেগুলি সর্বাধিক নৈপুণ্য ও সর্বনিম্ন ভুলভ্রান্তির সঙ্গে চালানো যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কর্মস্থলে বায়ুচলাচল, শব্দ ও দীপনমাত্রার মতো পরিবেশের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন। এর ফলে কর্মস্থলের নকশার উন্নতি হয়ে জায়গাটি আরামদায়ক, নিরাপদ ও কর্মানুকূল হয়ে ওঠে। একটি লোক কতক্ষণ সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে কাজ করতে পারে, তা দেখার জন্য উৎপাদনের সঙ্গে শিফ্‌টের মেয়াদের সম্পর্কও বিচার করা হয়। কর্মীদের প্রতিবর্তের দ্রুতি এবং চেষ্টীয় বিচলনগুলিও বিবেচনা করতে হয়।

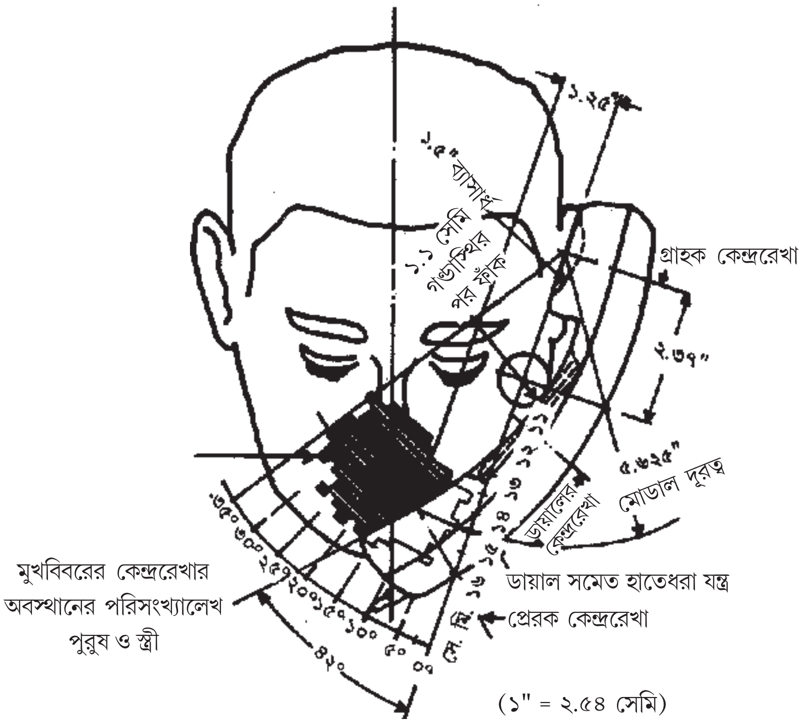

চিত্র ২৪.৭ : দূরভাষ ব্যবহারকারীর মাথার গড় পরিমাপের উপাত্ত। এরকম উপাত্তকে নরমিতি (anthropometric) উপাত্ত বলা হয়। মাউথপীসের কাছে প্রত্যেক ছায়া জনসমষ্টির শতকরা ২০ ভাগের কান থেকে মুখ পর্যন্ত দূরত্ব বোঝায়।

মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফলাফল সর্বদাই প্রকট না হতে পারে, বিশেষত যদি ফলটি নিরাপত্তার চেয়ে বরং সুবিধার সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। দূরভাষ এমন একটি যন্ত্র যা স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং এর নকশার প্রত্যেক পরিবর্তনের আগে বিশদ পরীক্ষা ও হিসাব করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৭ সালে একটি নূতন হাতে-ধরা যন্ত্রের নকশা করা হয় এবং চিত্র ২৪.৭-এ দেখানো মাত্রাগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ২০০০ জন স্ত্রীপুরুষের মাথার মাপ নেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সবাই দিনের বেলায় বিভিন্ন সময়ের জন্য চেয়ার ব্যবহার করি। আমাদের কেউ কেউ দিনে আট ঘণ্টারও বেশিক্ষণ এটিকে ব্যবহার করি। এই এককটি পড়ার সময়ে হয়তো আপনি চেয়ারেই বসে আছে। জাপানের শিবা (Ciba) বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো কোহারো (Jiro Koharo) আমাদের দেহের উপরে চেয়ারের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দেখেছেন, চেয়ারের বসার জায়গাটি অতিরিক্ত উঁচু বা অত্যধিক লম্বা হলে উরুর রক্তবাহগুলিতে রক্তসংবহনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। চেয়ারের পিঠ যদি মেরুদণ্ডকে ঠিকমতো ঠেস দিতে না দেয়, উদর ও পিঠের পেশিগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অস্বস্তি ঘটে। চেয়ারের নরম দিকগুলি সর্বাধিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে, কারণ এগুলি দেহের স্থিতিসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে না এবং তার ফলে দৈহিক স্থিতিসাম্য অব্যাহত রাখতে পেশীগুলিকে নিরন্তর কাজ করতেই হয়।

যদিও প্রায়ই আমরা উপলব্ধি করি না, তবু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে জিনিসগুলি ব্যবহার করি, তাদের অধিকাংশই মানুষের সামর্থ্য ও সুবিধার কথা মনে রেখেই পরিকল্পিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রান্নাঘরের তাক বা ঢালাই-করা পাথরের উচ্চতা এমন হয় যাতে কাজ করতে করতে ব্যবহারকারী যথাসম্ভব কম ক্লান্ত হন।

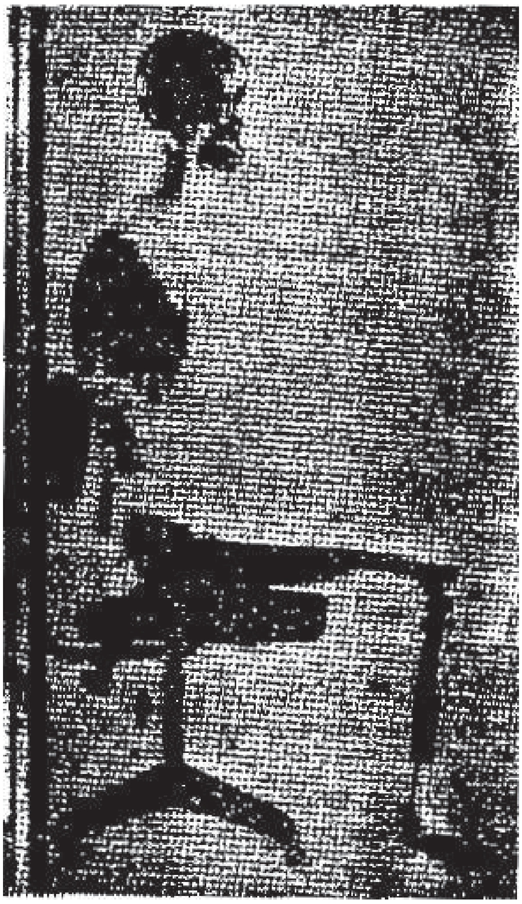

চিত্র ২৪.৮ : দেহের যন্ত্রবিদ্যা বা মেকানিক্সের সঙ্গে চেয়ারের সম্বন্ধস্থাপন। মেরুদণ্ডের জন্য ঠেস। একজন অফিসকর্মীর এক্স্-রে আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে, চেয়ারের পিঠ-হেলান দেওয়ার জায়গাটি কোথায় চাপ দেয়। এক্স্-রে চিত্রটি দেখার পরে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, উপবেশনকে আরও আরামদায়ক করতে পিঠ-হেলান দেওয়ার জায়গাটি আরও ২.৫ সেন্টিমিটার নামানো হোক।

২৪.৯ মহাকাশে মানবসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ইতিপূর্বেই পর্যায় ৩ এবং ৪-এ আমরা মহাকাশচারণের উপযোগিতার কথা আলোচনা করেছি। উপগ্রহ থেকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করা যায়, আবহবিদ্যা সংক্রন্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, পৃথিবীর সম্পদভার এবং শস্য ও বনের অবস্থা সম্বন্ধে অমূল্য উপাত্ত আহরণ করা যায়। অজানাকে জানার এবং সম্ভব হলে চাঁদ বা গ্রহগুলির অবস্থা কেমন তা দেখার তাড়নাও মহাকাশ গবেষণার এক প্রধান কারণ। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই গবেষণা ও অন্বেষণের অধিকাংশই চালানোর সুযোগ আমাদের দিয়েছে মানুষেরই স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদে মানষের প্রকৃত উপস্থিতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি ও রকেটের দ্বারা চাঁদের মাটির নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে।

অবশ্য আলোকচিত্রের মাধ্যমে ক্যামেরা যা করতে পারে, তাকে ছাড়িয়ে চাঁদের দৃশ্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করতে মানবচক্ষুর মতো আর কিছুই নেই। কিন্তু মানুষের পক্ষে মহাকাশচারণ একটি সুকঠিন সংকল্প এবং এটিকে সম্ভবপর করতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ইঁদুর, কুকুর, এমনকি বানরের মতো অন্যান্য জীব ও প্রাণীকে পাঠিয়ে প্রভূত গবেষণা করা হয়েছে।

মানুষকে সর্বাধিক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই মহাকাশচারণ করতে হয়। একমাত্র মহাকাশচারী হলে যতদিন তিনি ভ্রমণ করেন তাঁর একেবারেই কোনও সঙ্গী থাকে না এবং দৃশ্যাবলি থাকে সর্বাপেক্ষা অপরিচিত—গবাক্ষের বাইরে তাকালে নক্ষত্রগুলি ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন না। এই **একাকিত্ব** এবং বাইরে থেকে **সংবেদনের অভাব** বিপুল মানসিক চাপের উৎস বলে দেখা গেছে। মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং স্বাভাবিক বোধ করতে হলে তাকে তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক প্রভৃতির মাধ্যমে সংবেদন পেতে হয়। কৃত্রিম উপগ্রহে ভ্রমণের সময়ে ভারশূন্যতার অনুভূতি হয়—গেলাস উপুড় করলে তা থেকে কোনও তরল পদার্থ পড়ে যায় না। কাজেই খাদ্যও স্বাভাবিক ভাবে গলা দিয়ে নেমে যায় না—এমনকি জলও গেলা সহজ নয়। মনে হয়, আমাদের সারা দেহ (পাচনতন্ত্র, এমনকি রক্তসংবহনও) পৃথিবীর অভিকর্ষে অভ্যস্ত এবং একে নিষ্ক্রিয় করে দিলে আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। এমনকি পেশির বিচলনও কঠিন হয়। মহাকাশযানের ভিতরে বায়ুকে কৃত্রিম চাপে রাখা হয়, কারণ বাইরে প্রায় সম্পূর্ণ শূন্যতা থাকে এবং কোনও প্রকার শব্দই মহাকাশযানে পৌঁছাতে পারে না। অবশ্যই হাত মুখ ধোওয়া, স্নান করা বা মলত্যাগ করা বড়ো বড়ো সমস্যা হয়ে পড়ে। স্পষ্টত যে-কোনো মহাকাশচারী এতে অস্বস্তি বোধ করবেন। কিন্তু অস্বস্তিও খুব মৃদু শব্দ হল; তিনি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, জড়িমাগ্রস্ত এবং মানসিক স্থিতিসাম্যহীন বোধ করতে পারেন।

তবে বারবার অনুশীলনে প্রভূত সাহায্য হয়। আধুনিক মহাকাশচারীরা দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যান। মহাকাশে কী আশা করা যায়, তা জানা থাকলে তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে তার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভারশূন্যতাও উদ্দীপিত করা হয় যাতে মহাকাশচারী এর বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। বর্তমানে যোগাযোগের অনেক উন্নতি হয়েছে; মহাকাশচারীরা দূরভাষে কথা বলতে ও দূরদর্শনে ছবি দেখতে পারেন। তাঁদের শারীরিক ব্যায়াম করতে হয়। এখন মাত্র একজনের পরিবর্তে পুরুষদের বা স্ত্রীপুরুষের একটি দলকে মহাকাশে পাঠানোর প্রথা হয়েছে। এভাবেই একটি সোভিয়েট মহাকাশযানে প্রতিকূল ফলাফল ছাড়াই লোকে একবারে এক বৎসরের বেশি অতিবাহিত করেছে। মহাকাশচারীর করণীয় নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের কাজকর্মগুলিও সংখ্যায় অনেক এবং এজন্য একটি দলের প্রয়োজন হয়।

এসব থেকে দেখা যায়, আমাদের দেহ ও মন বায়ুচাপ, অভিকর্ষ, সংবেদন ও যোগাযোগের স্বাভাবিক অবস্থাগুলির অধীনেই বাস করতে অভ্যস্ত। অস্বাভাবিক ভৌত পরিবেশ আমাদের দেহতন্ত্রকে বিরাট চাপের মধ্যে ফেলে এবং গুরুতর দৈহিক তথা মানসিক ফলাফল দেখা দেয়। অবশ্য মহাকাশকে জয় করতে হয়েছিল এবং মানুষের বসবাসের নূতন অবস্থাগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছিল বলেই এসব বিষয়ের অনেকগুলিই জানা গেছে। চাঁদ বা অন্য কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করা হলে অন্য সব অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হবে এবং আশা করা যায়, মানুষ নিজেকে সমস্যার সমাধানে সমর্থ বলে প্রমাণ করবে।

২৪.১০ সারাংশ

বর্তমান এককে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখেছেন :

- শিক্ষা হল আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন যা ঘটতে পারে : প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, যাতে একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনা তার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে; পুরস্কার বা শাস্তির মাধ্যমে; স্মৃতি, যুক্তিপ্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ জড়িত আছে এমন জ্ঞানীয় শিক্ষার মাধ্যমে।

- পিয়াজের প্রস্তাবমত, জ্ঞানীয় বিকাশ একটি নিয়মানুগ ক্রমে চলে এবং দৈহিক বিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।
- জ্ঞানীয় বিকাশে কৃতি বুদ্ধ্যঙ্কের আকারে মাপা হয়; অন্যদিকে স্বকীয় চিন্তার সামর্থ্য ব্যক্তির সৃজনশীলতার দ্বারা মাপা হয়। অবশ্য বুদ্ধ্যঙ্ক ও সৃজনশীলতার মধ্যে সহগতি অল্প।
- কৈশোর হল সেই সময় যা বাল্যাবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার মধ্যে ব্যবধানটিতে সেতু রচনা করে। এটি হল দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি এবং অনিশ্চয়তা, অনুশীলন ও নূতন নূতন ভূমিকা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার কাল।
- অন্য ব্যক্তির বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে যে আচরণ, সেই হল আগ্রাসন। আগ্রাসন পশুদের একটি সহজাত প্রবৃত্তিঘটিত আচরণ, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রধানত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত। অনেক সময়েই এটি মানসিক চাপ, দ্বন্দ্ব বা নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া।
- মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে মানুষের কুশলতার অনুসন্ধানে রত থাকে। যন্ত্রপাতি ও কর্মস্থলের পরিকল্পনার মাধ্যমে একাজ সাধিত হয়।
- মহাকাশচারণের সম্ভাবনার ফলেই মহাকাশে মানুষ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। ভারশূন্যতা, নিঃসঙ্গতা এবং বদ্ধ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার পরিণামে মানসিক চাপ ও চিন্তাপদ্ধতির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

২৪.১১ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। শিক্ষা যে তিনটি পথে ঘটে থাকে, বর্তমান এককে সেগুলি আলোচনা করেছি। প্রতিটির দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি কি একটি করে উদাহরণ দিতে পারেন? ....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। বারো বৎসর বয়স্কা সুধা তার ক্লাসে সর্বদা প্রথম হয়। বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতা, উভয়ের জন্যই তার স্কুলের মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা সে অভীক্ষিত হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় তার মূল্যাঙ্ক ছিল ১৫ পয়েন্ট, কিন্তু সৃজনশীলতা অভীক্ষার মূল্যাঙ্ক বেশ কম ছিল।

(ক) তার বুদ্ধ্যঙ্ক গণনা করুন।

(খ) সৃজনশীলতার অভীক্ষায় সে কেন ভালো মূল্যাঙ্ক পায়নি বলে আপনি মনে করেন?

....

....

....

....

....

৩। কৈশোরের সময়ে যে পরিবর্তনগুলি হয়, তাদের দৃষ্টান্ত নীচে তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি পরিবর্তন দৈহিক, মানসিক না সামাজিক, তা নির্দেশ করুন।

(ক) পনেরো বছর বয়স্ক রমেশ খুব ভালো গান গায়। সে সমাবেশের সামনে গান করত এবং নিজের কৃতিত্ব জাহির করত। ইদানীং তার মাতাপিতা তাঁদের বন্ধুদের গান শোনাতে বললে সে লজ্জিত হয় এবং নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

(খ) স্কুলের অনুষ্ঠানে যে সমবেত সংগীত গাওয়া হবে, তা থেকে তেরো বছর বয়স্ক মোহনকে সরে আসতে বলা হয়েছে, কারণ অবশিষ্ট বালকদের সঙ্গে তার গলা মিলছে না বলে মনে হয়েছে।

(গ) এখন ষোলো বছর বয়স হওয়াতে কৃষ্ণ আরও সমঝদার হয়েছে বলে মনে হয়। সে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও সম্ভ্রম সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করেছে।

....

....

৪। নিউগিনিতে একটি সমাজ আছে, যেখানে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আগ্রাসন ও দ্বন্দ্ব অজ্ঞাত বললেই হয়। বয়স্কেরা পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত সহযোগিতা করেন এবং খাদ্য, স্নেহ, বিশ্বাস, কর্ম প্রভৃতি ভাগ করে নিতে ও সাহায্য করতে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ আছে। শিশুদের মধ্যে খেলার সময়েও এমনকি আকস্মিক আগ্রাসী আচরণও থাকে না বা প্রশ্রয় পায় না। এই পর্যবেক্ষণগুলি থেকে আপনি কী সিদ্ধান্ত করবেন? আগ্রাসন কি সহজাত প্রবৃত্তিগত না অর্জিত আচরণ?

....

....

....

৫। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন যেখানে মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারকের উপকার করেছে এবং শ্রমের ফসল বাড়িয়েছে বলে আপনি মনে করেন।

....

....

....

....

....

৬। কোন তিনটি প্রধান বিষয় মহাকাশে মহাকাশচারীর মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিসাম্যকে প্রভাবিত করে?

....

....

....

....

২৪.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) (১) সহজাত প্রবৃত্তিগত;

(২) শাস্তি;

(৩) অর্জিত প্রতিবর্ত;

(৪) পুরস্কার;

(৫) স্থানীয় শিক্ষা।

(খ) (১) -এর সঙ্গে মেলে (গ)
(২) -এর সঙ্গে মেলে (ক)
(৩) -এর সঙ্গে মেলে (ঘ)
(৪) -এর সঙ্গে মেলে (খ)।

২। (ক) (১) সঠিক
(২) ভুল
(৩) ভুল
(৪) ভুল
(৫) সঠিক
(৬) সঠিক।

(খ) চিত্র ২৪.৪-এ বর্ণিত কাজের কোনও 'সঠিক' উত্তর নেই। সৃজনশীলতা নূতন ধরনের উত্তরের সঙ্গে জড়িত।

৩। (ক) কৈশোর;
(খ) গৌণ যৌন লক্ষণসমূহ;
(গ) ব্যক্তিগত সত্তা।

৪। (ক) -এর সঙ্গে মেলে (২)
(খ) -এর সঙ্গে মেলে (৩)
(গ) -এর সঙ্গে মেলে (৪)
(ঘ) -এর সঙ্গে মেলে (৫)
(ঙ) -এর সঙ্গে মেলে (১)।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর

১। (ক) **উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়া**
বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়ার মডেল ব্যবহৃত হয়। তারা তাদের উৎপাদিত বস্তুকে আকর্ষণীয় স্থান বা ব্যক্তির সঙ্গে জোড়া বাঁধায়। এমন বিজ্ঞাপন বারবার দেখার ফলে বস্তুটি দেখলে ক্রেতার মনে তার সপক্ষে প্রতিক্রিয়া ঘটে।

(খ) **পুরস্কার ও শাস্তি**
সেনাবাহিনীতে যোগদানে আহূত ব্যক্তিরা পুরস্কার ও শাস্তির নীতির মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা রাখতে শেখেন।

(গ) **জ্ঞানীয় শিক্ষা**
আপনি যদি কোনও নূতন জায়গায় গিয়ে থাকেন এবং ফিরে আসার পথ যদি মনে রাখতে হয়, আপনি জ্ঞানীয় শিক্ষা ব্যবহার করে তা করেন, কারণ আপনি পথের একটি মানসিক মানচিত্র তৈরি করেন, পথের চিহ্নগুলি বা চারিপাশের দৃশ্যগুলি মনে রাখেন ওই পথে ফেরার সময়ে সেসব স্মরণ করেন। আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে এই তিন প্রকার শিক্ষার এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত ভাবতে পারেন।

২। (ক) সুধার বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫।
(খ) কারণ উচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক উচ্চ সৃজনশীলতার পরিচায়ক হবে, এমন কোনও কথা নেই।

৩। (ক) মানসিক। (খ) দৈহিক। (গ) সামাজিক।

৪। মানুষের ক্ষেছে আগ্রাসন সাধারণত একটি অর্জিত প্রতিক্রিয়া রূপে বিবেচিত হয়। শিশুগুলি কখনও আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়নি বলে তারা সেটি শেখেনি।

৫। মানবোপাদান ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মূলনীতিগুলির দৃষ্টান্ত দিতে আপনি অন্য কয়েকটি উদাহরণের কথাও ভাবতে পারেন। আমরা এই দুটি দিয়েছি :
(ক) টাইপরাইটারের চাবির বোর্ডটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে যে অক্ষরগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সেগুলিতে সহজেই হাত পৌঁছায়।
(খ) বড়ো হাতলযুক্ত ঝাঁটা ব্যবহার করলে ছোটো হাতলের ঝাঁটার তুলনায় পিঠে কম টান পড়ে।

৬। নিঃসঙ্গতা, সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার অভাব এবং ভারশূন্যতা।

একক ২৫ □ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

গঠন

২৫.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২৫.২ সর্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা
২৫.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যাবলি
২৫.৪ সচেতনতার বিকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা
অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা
যোগাযোগ ব্যবস্থার রাজনৈতিক ভূমিকা
যোগাযোগ ব্যবস্থার সামাজিক ভূমিকা
বিশদফা কর্মসূচি ও যোগাযোগগ ব্যবস্থা
২৫.৫ শিক্ষার উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা
গণমাধ্যম ও শিক্ষার পরিবেশ
গণমাধ্যম ও দূরশিক্ষা
আকাশবাণী ও দূরদর্শন কর্তৃক শিক্ষাপাঠের সম্প্রচার
ভবিষ্যৎ যোজনায় শিক্ষা ও গণমাধ্যম
২৫.৬ সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা
গণমাধ্যম, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি
গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি
গণমাধ্যম ও সাধারণ সাংস্কৃতিক চেতনা
মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ
২৫.৭ সারাংশ
২৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২৫.৯ উত্তরমালা

২৫.১ প্রস্তাবনা

আগের দু'টি এককে আপনি শরীর ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মনস্তত্ত্ব এবং আচরণের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই এককে আমরা জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকারের প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জাগরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। এ ছাড়া দেশের বিপুল নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে, অসংখ্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনে এবং শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করার

জন্য তার বৈচিত্র্য আনায় বিভিন্ন মাধমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করব। ভারতবর্ষ হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এক বৃহৎ দেশ। এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে এক যৌথ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই এককে আমরা বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি যে সব ক্ষেত্রে মাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন, সেগুলি হল :

- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে,
- শিক্ষাকে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাকে আরও অর্থবহ করে তুলতে সাহায্য করায় ও
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়ে এবং তাদের কাছাকাছি এনে আমাদের দেশে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে।

২৫.২ সর্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা

এই পর্যায়ের পূর্ববর্তী এককগুলিতে শরীর এবং মনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আমরা আপনাদের পরিচিত করতে চেষ্টা করেছি। খুব সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় যে মন হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে তথ্য নিয়ে সমস্ত রকম ক্রিয়াকর্ম চলে এবং তার ভিত্তিতে চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে এই মনই শারীরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের কাজকর্মকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে মনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং ব্যবহারের জন্য যাবতীয় তথ্য দুইই যোগায় আমাদের শরীর। পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনকে অজস্র অনুভূতি সরবরাহ করে—যেমন মানুষের একগাছি চুলে হাত দিলেও সেই সংবাদ পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। বস্তুত অজস্র তথ্যের যে ধারা সর্বদা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছে যাচ্ছে তার একটা বড়ো অংশকেই মস্তিষ্ক খুব গুরুত্ব না দিয়ে সরিয়ে রাখতে শেখে। তবু সম্ভবত কান আর চোখ বহির্জগত এবং মনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যোগসূত্র। আমরা যা কিছু পড়ি বা শুনি তার মধ্যে দিয়ে অন্যান্য মানুষের চিন্তাভাবনা তথা মনোজগতের সঙ্গে পরিচিত হই। এভাবেই আমরা মানসিকভাবে আমাদের অতীত, আমাদের সংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সমস্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হই। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে যখন কোনো মানুষের বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়, যখন তিনি কিছুই দেখেন না, শোনেন না বা কোনো কিছুর স্বাদ গন্ধ গ্রহণ করেন না অর্থাৎ বাইরের কোনো সংকেতই শারীরিকভাবে গ্রহণ করেন না, তখন তাঁর স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার বিষয়টি মানুষের অস্তিত্বের জন্য একান্তই প্রয়োজন, ঠিক যেমনটা প্রয়োজন বাতাস, খাদ্য ও পানীয়ের।

তবে হ্যাঁ, আমাদের মন কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রেরিত তথ্য ধরে রাখার এক নিছক যন্ত্র নয়। আমরা চোখ এবং কান ব্যবহার করে বহু জিনিস দেখি এবং শুনি তো নিশ্চয়ই, তবে তা কি কেবলই দেখা এবং শোনা? না, কারণ এই দুটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক জটিল লিখিত বিষয় পঠিত বা শ্রুত হয় এবং বহু ধ্যানধারণা আমাদের সামনে উঠে আসে। আমাদের মনের যে এই সমস্ত তথ্য ও ধ্যানধারণা থেকে সর্বদাই শেখবার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব

ধ্যানধারণা গড়ে তোলার এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অন্যভাবে বললে, মন বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা মিলিয়ে মিশিয়ে নানা সমন্বয় তৈরি করে এবং এভাবে গড়ে ওঠা সমন্বয়ের মধ্যে কখনও কখনও কিছু নিজস্বতাও ফুটে ওঠে। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মন তথ্যাদির ব্যবহার এবং তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ব্যাপারে নিজস্ব নিয়মকানুন গড়ে তোলে। এগুলোই আমাদের কাছে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত। কেউ কেউ যা পড়েন বা শোনেন তার সবটুকুই বিশ্বাস করেন এবং মেনে নেন আবার কেউবা যে-কোনো ধারণা গ্রহণ বা বর্জনের আগে যথেষ্ট খুঁটিয়ে তা বিচার করেন। কেউ কেউ "মুক্তমনা" এবং মানসিকতার দিক দিয়ে নমনীয়, অন্যদিকে কেউ কেউ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে রাখার ব্যাপারে রীতিমতো অন্ধ এবং কট্টর। কেউ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শ নিজেই তৈরি করে নেন কেউ থেকে যান বাস্তববাদী।

আমাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই বাইরের থেকে নানা তথ্য, ধ্যানধারণা তথা প্রেরণা গ্রহণ করে এবং মানুষের আচরণ তার দ্বারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ঘটনাটি কিন্তু অনেক চিত্তগ্রাহী সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। বিষয়টাকে যদি আমরা কতগুলি বিশেষ প্রেক্ষাপটে দেখি তাহলে ভালো বোঝা যাবে। যে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে জীবনের অনেকগুলি বছর আমরা জ্ঞানলাভের জন্য অতিবাহিত করি, যে লক্ষ লক্ষ বই ও পত্রপত্রিকা তথ্য ও চিন্তার সম্ভার সাজিয়ে অজস্র ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, অথবা দূরদর্শন, রেডিয়ো, চলচ্চিত্র বা সংবাদপত্রের মতো যে গণমাধ্যমের আমরা সর্বদা মুখোমুখি হই, এর সবকিছুই তো তথ্য ও চিন্তার আকর। সন্দেহ নেই, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে জালিকা বিস্তৃত হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে যা পরিবেশিত হচ্ছে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের মন বা চেতনা। এর সাহায্যে মানুষকে সেই অর্থে 'শিক্ষিত' করে তোলা যায়, যার ফলে সে যে শুধু নানা ধরনের বিচিত্র তথ্যে প্রবেশাধিকার পাবে তাই না, যে শিখবে কী করে সবকিছু আগেই স্বীকার করে না নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। এভাবেই একজন মানুষ হিসেবে, পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মানুষজনের সঙ্গে তার সার্বিক জীবনযাপনের দক্ষতা বাড়বে এবং তার নিজের কাজকর্মের মান হবে উন্নততর। তবে এই একই যোগাযোগ-মাধ্যমের সাহায্যে একপেশে বক্তব্য প্রচার, অন্ধবিশ্বাসের প্রসার এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য এমন কী গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়াও সম্ভব। যেহেতু অন্য কিছু তাদের শোনবার বা জানবার সুযোগ নাও দেওয়া যেতে পারে তাই এর সাহায্যে মানুষকে অসত্য বিষয় পর্যন্ত বিশ্বাস করানো সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে; সরকারি প্রচারের জোরে সেদেশের মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে জাতি হিসেবে তারা উচ্চস্তরের তো বটেই, যুদ্ধেও তারা অপরাজেয়। তা ছাড়া গণমাধ্যমে বিপুল বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কোনো জিনিসের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি ক'রে মানুষের কাছে নিছক অপ্রয়োজনীয় জিনিসও বিক্রি করা সম্ভব। সরকারি নীতির সপক্ষে রেডিয়ো, দূরদর্শন বা কখনও কখনও সংবাদপত্রেও ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। সাধারণ বইপত্র এমনকি পাঠ্য বইতেও ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ কিছু বিকৃতি ঢুকিয়ে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে মানুষের মধ্যে সংশয় এবং বিভেদ তৈরি করা হয়। আমেরিকার বহু মানুষ বিশ্বাস করেন যে ভারতীয়রা ধুতি আর পাগড়ি পরিহিত কিছু বিচিত্র মানুষ যারা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়, দড়ি বা খুঁটি বেয়ে ওঠে এবং মন্ত্রতন্ত্রে তাদের অগাধ আস্থা। আবার ভারতবর্ষে আমাদের অনেকের, আফ্রিকার মানুষ বা সাদা চামড়ার মানুষদের ব্যাপারে এমনকি আমাদের নিজস্ব আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কেও বহু বিচিত্র ধারণা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা আবেগ তথা ভ্রান্ত চিন্তার উন্মেষের এক ভয়ংকর সম্ভাবনা। এবার বরং আমরা যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি তার কতকগুলি দিক খতিয়ে দেখি।

২৫.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যাবলি

সামাজিক কাঠামোয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ভূমিকা মোটামুটিভাবে এইরকম :

- তথ্য, বার্তা ও মতামতের আকারে সংবাদের আদানপ্রদান। এ কাজটি নানা আলোচনা, বক্তৃতা বা বিতর্কসভার মাধ্যমে হতে পারে।
- প্রেরিত বার্তার গ্রাহককে বিশেষ কোন কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই বার্তার বাহক ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন, আবার রেডিয়ো, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, পত্রিকা, বই বা চলচ্চিত্রের মতো কোনও গণমাধ্যমও হতে পারে। এই কর্মধারা পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি অবলম্বন, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, অথবা কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করা হতে পারে।
- শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসারণ। শ্রেণিকক্ষের মতো একটি অবস্থা তৈরি করে জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তা ছাড়া সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রচার ও শিল্পকলার চর্চাও করা যেতে পারে।
- সংগীত, নাটক বা খেলাধুলার বিষয় প্রচারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ বা সমষ্টির বিনোদন।
- বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনমতকে প্রভাবিত করে।

এগুলি হ'লো যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল কার্যাবলি। আমাদের অধিকাংশ কাজই এর কোনো একটি শ্রেণিতে পড়ে।

২৫.৪ সচেতনতার বিকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা

এই পরিচ্ছেদে আমরা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। তবে শুরু করার আগে কিছু প্রয়োজনীয় সাধারণ তথ্য স্মরণ করা দরকার।

২৫.৪.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বর্তমানে (১৯৯৮) প্রায় ৯৮ কোটি। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ এদেশের বাসিন্দা। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে নিরক্ষর ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ কোটি। সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৫২%। প্রধান প্রধান আঠারটি ভাষা সংবিধান স্বীকৃত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক লোকের ব্যবহৃত ভাষা এবং উপভাষার সংখ্যা সম্ভবত গিয়ে দাঁড়াবে কয়েক হাজারে। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ ৫,৭৫,০০০টি গ্রামে বাস করেন। আপনারা পঞ্চম পর্যায়ে দেখেছেন যে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ উপযুক্ত খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয়-জল, যথোপযুক্ত বাসগৃহ, স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ এবং বস্ত্রাদি থেকে বঞ্চিত।

এদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা বিচারে এই সমস্ত তথ্য আমাদের দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। প্রথমত সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা উচিত। যাতে এর সাহায্যে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়িয়ে মানুষের, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল ও কম সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মানের

উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত যেহেতু আমাদের দেশের বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য ছাপানো বই, কাগজপত্র, প্রচারপত্র বিশেষ কার্যকরী হবে না, অতএব অন্য কোন মাধ্যমকে সেই কাজে ব্যবহার করতে হবে।

এইজন্য ভারত তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এজন্য জাতীয় সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করাটাই লক্ষ্য যাতে এর মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সুফল পৌঁছায়, যাঁরা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন যেন শুধু তাঁদেরই সম্পদ বৃদ্ধি না হয়। তাই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সনদেই যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সনদের "জাতীয় উন্নয়নে জনসহযোগিতা" শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল "পরিকল্পনার নীতিনির্ধারক অগ্রাধিকারগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারলে কোনও নাগরিক সার্বিকভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ভূমিকাটুকু সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। এজন্য পরিকল্পনার বিষয়টি জনসাধারণের ভাষায় অথবা তাঁদের বোধগম্য চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। আর তাই সৃজনশীল লেখক এবং শিল্পীদের একটি বিশেষ তালিকা গঠন খুবই জরুরি। সমস্ত ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। কেবল রেডিয়ো, চলচ্চিত্র, গান এবং নাটকের মাধ্যমেই নয়, লিখিত এবং কথিতভাবেও মানুষের সামনে এই বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।"

এই প্রেক্ষাপটে আকাশবাণী ও দূরদর্শন এখন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমগুলি নিরক্ষতার বাধা পেরিয়ে বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আকাশবাণীর সম্প্রচার প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং দূরদর্শনের সম্প্রচার প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায়, তবে তাদের কাছে রেডিয়ো বা টেলিভিশন সেট থাকা দরকার। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে 'ফিল্ম ডিভিশন' বা 'ফিল্ড পাবলিসিটি আধিকারিকে'র মতো কয়েকটি মাধ্যম-সংগঠন আছে যারা প্রচারকে দুর্গম ও দূরবর্তী স্থানের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় নিয়োজিত। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখা, তাদের শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, তাদের চারপাশের জগৎকে বিস্তৃত করে দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সমস্যাদি সম্পর্কে তাদের সচেতন করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন, জাতীয় সুরক্ষা এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের আহ্বান রাখা।"

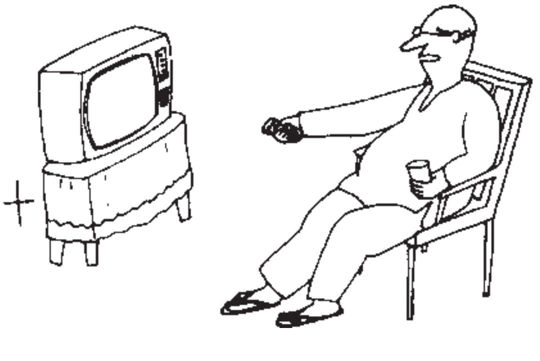

চিত্র ২৫.১ : তথ্য চাই! বিনোদন চাই! শিক্ষা চাই!

রাজ্য সরকারগুলি নিজস্ব ক্ষেত্রীয় শাখা এবং সম্প্রসারণ পরিসেবার সাহায্যে রাজ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে আমরা কেন্দ্রীয় গণমাধ্যম বা রাজ্যগুলির কর্মসূচির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি না। আমাদের বক্তব্য আসলে এই যে এদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। আর এটাও এখন বোঝা গেছে যে এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ শুধু রেডিয়ো বা দূরদর্শনের সম্প্রচার

নয়, শ্রাব্য (audio) ও দৃশ্যশ্রাব্য (video) ক্যাসেট, স্লাইড, চলচ্চিত্র, বই এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সবই এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

অনুশীলনী ১

আপনি কী গ্রামীণ ও শহরবাসী জনসাধারণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অন্তত দুটি করে ক্ষেত্র নির্দেশ করতে পারেন, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে?

....

....

....

....

....

২৫.৪.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার রাজনৈতিক ভূমিকা

রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নেতারা জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। ব্রিটিশ সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে (All India Radio) তাঁদের কোনো প্রচার সুযোগ ছিল না। কারণ ব্রিটিশ সরকার ওই সংগ্রামকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে দাবিয়ে রাখতেই সচেষ্ট ছিল। টেলিভিশন তখন ছিল না, সংবাদপত্রের খবর ছিল এক এক ধরনের। ক্ষুদ্র সংখ্যক কিছু দৈনিক পত্রিকা সেই সময়কার সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও জনসভার মাধ্যমে, ত্রিবর্ণ পতাকা বা চরকার মতো জাতীয়তার প্রতীকের সাহায্যে এবং দেশাত্মবোধক সংগীতের ওপর ভিত্তি করে আমাদের নেতারা এই উপমহাদেশের হৃদয় উদ্‌বেল করে তুলতে পেরেছিলেন। জনসংযোগ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের সে ছিল এক অনন্য পর্যায়। মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের পথে নিয়ে আসার জন্য সেগুলি ছিল অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা।

স্বাধীনতার পরে আমাদের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার রয়েছে। এভাবে প্রত্যেক নাগরিক কর্মসূচি ও নীতিনির্ধারণকারী সংস্থাগুলিতে জনপ্রতিনিধি পাঠানোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারগুলি আইন প্রণয়ন করেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা তাঁদের কর্মসূচি ও প্রণীত আইনগুলি অনুমোদন করিয়ে নিতে বাধ্য থাকেন।

নির্বাচনের সময় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঠিক করতে পারেন, তিনি কাকে ভোট দেবেন। তিনি কোনো দলীয় প্রার্থী বা নির্দল প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। বিভিন্ন দল বা এক একজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নানান প্রতিশ্রুতিও দেন। এই পুরো ব্যাপারটিকে বলা যেতে পারে রাজনৈতিক প্রচার এবং এর মধ্যে দিয়ে ভোটদাতা তাঁর পছন্দ বেছে নিতে পারেন।

যে দুটি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ওঠে সেগুলি হল :

- রাজনীতি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করে?
- যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজনীতিকে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করে?

এদেশে আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। গণসংযোগের মাধ্যমগুলি এই অধিকার প্রয়োগে কিছুটা সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যেন এর ফলে দেশের কোনো আইন ভঙ্গ না হয়। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন কী আকাশবাণী বা দূরদর্শনের মতো কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাও একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় যার ফলে রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে তাদের বস্তুনির্ভর ও নিরপেক্ষ হতে হয়। বর্তমানে ওই দুটি মাধ্যম নির্বাচনি প্রচারের সময় সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে সম্প্রচারের জন্য সমান সময় দিচ্ছে। এমনকি প্রচারের সময় ছাড়া জাতীয় প্রয়োজনে সরকার মাধ্যমে দুটিকে ব্যবহার করতে পারলেও দলীয় প্রচারের কাজে তা করা চলে না।

এভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষকে তথ্য সরবরাহ করে ও সচেতন করে তোলে যাতে তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারে। এই কাজের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছে। বস্তুত এটা বলাই উচিত যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ মতপ্রকাশ, আলোচনা ও বিতর্কের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অবাধ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভবই নয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কিত নীচের অনুশীলনীটির দিকে একটু নজর দিতে হয়ত আপনার খারাপ লাগবে না।

অনুশীলনী ২

নীচে দেওয়া শব্দগুচ্ছের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১। আমাদের সংবিধান ——————— এর নীতি গ্রহণ করেছে।

২। আমরা এদেশে ——————— এবং ——————— এর স্বাধীনতা উপভোগ করি।

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অধিকাংশ যোগাযোগই ছিল ——————— মাধ্যমে।

৪। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমকে ———————, ——————— ও ——————— হতে হবে।

(ব্যক্তিগত যোগাযোগের, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক বিষয়ে, মতপ্রকাশ, বাক্‌স্বাধীনতা, বস্তুনির্ভর)।

২৫.৪.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার সামাজিক ভূমিকা

যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থেকেই বেরিয়ে আসে তার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা। প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে সামাজিক পরিবর্তন আনার কথা এদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? বলাই বাহুল্য, এর সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া বেশ শক্ত। এখানে সাধারণভাবে কিছু বলাই যথেষ্ট হবে। আমাদের দেশে আয়ের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য রয়েছে—খুব অল্প সংখ্যক মানুষ সম্পন্ন আর এক বিরাট অংশ দরিদ্র। তাই কেবল শিল্পের প্রসার বা কৃষির অগ্রগতি আমাদের নীতি নয় বরং তার সুফল সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার। এর অর্থ হল—এক নতুন ধরনের সমাজের দিকে এগিয়ে চলা। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের, ভাষার এবং সংস্কৃতির অসংখ্য মানুষ বসবাস করে। অতীতে ঔপনিবেশিক শাসকের হাতে আমাদের অধিকাংশই বঞ্চনার

শিকার হয়েছি। ওই শাসকেরা জনসাধারণের এক এক অংশকে তাদের সমস্যার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। সমস্ত সংস্কৃতি, ভাষা এবং গোষ্ঠীকে উন্নীত করে তাদের পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আশা হলো আমাদের বর্তমান নীতি, এর ফলে আমাদের জাতীয় একাত্মবোধ বা সংহতি বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য কাজে মনসংযোগ করতে পারব। কিন্তু এটাও একটা বিরাট সামাজিক পরিবর্তন। আমাদের বক্তব্য, আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দিকে এগোতে চাই, আমরা চাই আমাদের রাষ্ট্র হোক ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্ম কোনো বিভেদ সৃষ্টি করবে না। এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হবে যুক্তিনিষ্ঠ, ভাবাবেগ বা একদেশদর্শিতার সেখানে স্থান হবে না। গণতন্ত্রে যেহেতু নাগরিকই সার্বভৌম তাই কিছু চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে তাদের বুঝিয়েই আমাদের এগোতে হবে। এবং এখানেই যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একই লক্ষ্যবিশিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়ার সেতুবন্ধন হল যোগাযোগ ব্যবস্থার সামাজিক ভূমিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বস্তুত এদেশে গণমাধ্যমের সামনে এ এক কঠিন পরীক্ষা।

সামাজিক প্রেক্ষাপটেও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকের আশু স্বার্থ এবং প্রয়োজন মেটাবে বলে আশা করা হয়। দেশের আইন অনুযায়ী যে অধিকার তাদের রয়েছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে জনসাধারণ বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু তাঁরা এ সম্পর্কে অবহিত না থাকলে কীভাবে তাঁরা তাদের দাবি তুলে ধরবেন? বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক, কিছুদিন আগে পাঞ্জাবের খান্না জেলার কিছু নির্বাচিত গ্রামীণ এলাকায় 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যাস কমিউনিকেশান' একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যে কৃষিশ্রমিকরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম দৈনিক মজুরির বিষয়টি জানেন কিনা। সমীক্ষকদল এমন অনেক গ্রামে গেলেন যেখানে কৃষিশ্রমিকরা ফসল তোলার কাজে রত ছিলেন। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে আসা। বছরের পর বছর কাজের উদ্দেশ্যে ফসলের মরসুমে এঁরা পাঞ্জাবে চলে আসেন। সমীক্ষকদল চূড়ান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে নারী বা পুরুষ, একজন কৃশ্রিমিকও জানেন না যে, তিনি আইন নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দাবি করতে পারেন। সেই খবরটিই তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের এই অজ্ঞতার সুযোগে অন্য একটি শ্রেণি লাভবান হচ্ছেন। আর তাঁরা যা পাওয়ার অধিকারী তার চেয়ে অনেক কম পাচ্ছেন। এই শ্রমিকরা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং রেডিয়ো থেকে খবর পাওয়ার উপায়ও তাঁদের নেই। যদিবা তাঁরা রেডিয়ো শোনবার সুযোগ পান, তখন এই তথ্য সম্প্রচারিত হয় না। এর ফলে সামাজিক অবিচার ও আর্থিক শোষণের একটি সুস্পষ্ট ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের মতো সমৃদ্ধ রাজ্যে, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক সেখানেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পশ্চাৎপদ ও দুর্গম অঞ্চলগুলিতে অবস্থাটা কিরকম তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এমনকি নগরাঞ্চলেও সংবাদ ও তথ্যের অভাবে নাগরিকরা সামাজিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। সমাজের কিছু অংশ, যেমন মহিলারা, প্রায়ই অন্যদের তুলনায় তাঁদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে বেশি অজ্ঞ থাকেন। বিবাহবিচ্ছেদ বা সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনগুলি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হলেও বস্তুত এধরনের সমস্যায় পীড়িত মহিলারা কজন তাঁদের অধিকার বা দায়িত্ব সম্পর্কে জানেন? প্রশ্নটি নিয়ে নগরাঞ্চল বা গ্রামীণ ক্ষেত্রে সমীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক বৈচিত্র্য ও অসাম্যের প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকাটি দেখা দরকার। আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ যে সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের শক্তিশালী করে তুলতে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে রাজনৈতিক শিক্ষাকে। তাই সরকার নিয়ন্ত্রিত বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, যে ধরনের মাধ্যমই হোক না কেন, তার ওপর ন্যস্ত রয়েছে একটি জাতীয় দায়িত্ব।

যে আলোচনা হল তার থেকে আপনি নীচের অনুশীলনীটির উত্তর দিতে পারবেন।

অনুশীলনী ৩

নীচের ক্ষেত্রগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সামাজিক প্রয়োজন উল্লেখ করুন ঃ

১। নারীর অধিকার এবং সুযোগ।

২। জাতীয় সংহতি।

....

....

....

....

....

....

২৫.৪.৪ বিশ দফা কর্মসূচি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের দশকে প্রস্তাবিত বিশ দফা কর্মসূচির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ভারত সরকার এটি জাতীয় অগ্রাধিকারের কর্মসূচি হিসাবে জনসাধারণের সামনে পেশ করেছিলেন। এই কর্মসূচির মূল বিষয়গুলির তালিকা পাশের মার্জিনে দেওয়া হল, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ওই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যেমন নারী, শিশু বা বস্তিতে বসবাসকারী জনসাধারণ প্রভৃতির সামাজিক প্রয়োজনও ওই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিশ দফা কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কর্মসূচির সাফল্যের জন্য জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ দফা কর্মসূচি

১। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ।
২। বৃষ্টির জলকে কৃষিকাজে ব্যবহারের পন্থা।
৩। সেচের জলের আরও সুষ্ঠু ব্যবহার।
৪। বেশি ফলন ফলানো।
৫। ভূমি সংস্কারের রূপায়ণ।
৬। গ্রামীণ শ্রমিকের জন্য বিশেষ কার্যক্রম।
৭। বিশুদ্ধ পানীয় জল।
৮। সকলের জন্য স্বাস্থ্য।
৯। "দুটি সন্তান" নীতির প্রচলন।
১০। শিক্ষার প্রসার।
১১। তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির প্রতি সুবিচার।
১২। নারীর সমানাধিকার।
১৩। যুব সম্প্রদায়ের জন্য নতুন সুযোগসুবিধা।
১৪। জনসাধারণের জন্য আবাসন।
১৫। বস্তির উন্নয়ন।
১৬। বনাঞ্চলের জন্য নতুন কর্মধারা।
১৭। ক্রেতা সুরক্ষা।
১৮। ক্রেতার স্বার্থরক্ষা।
১৯। গ্রামের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ।
২০। সজাগ ও সংবেদনশীল প্রশাসন।

২৫.৫ শিক্ষার উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা

জ্ঞান ও তথ্যের সঞ্চালন হচ্ছে শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ যা স্বভাবতই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। এই যোগাযোগ শ্রেণিকক্ষের মতো পরিবেশে অথবা কোন কারখানা বা কর্মশালায়, কিংবা কোন গোষ্ঠী আলোচনার মাধ্যমেও হতে পারে। আর এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই একজনের কাছ থেকে আরেকজনের অথবা একটি গোষ্ঠীর কাছে জ্ঞানের সঞ্চালন ঘটে। বিশেষ ধরনের দক্ষতার প্রশিক্ষণ বা কোন একটি কাজ করার প্রকৌশল এই একই পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। বিভিন্ন মাধ্যম, রেডিয়ো, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, স্লাইড, চার্ট এবং অন্যান্য ধরনের চিত্রাদি জ্ঞান বা দক্ষতার প্রসারে পুস্তক এবং শিক্ষকের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যমের ব্যবহারের মাধ্যমে এক বিপুল সংখ্যক মানুষের উপকার সম্ভব হচ্ছে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র বা ভিডিওর মতো দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমগুলি শ্রেণিকক্ষের তুলনায় মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতে এবং বোঝাতে পারে। টেলিভিশন বা ভিডিওতে চলমান ছবির সাহায্যে কোনো কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার যে সুযোগ রয়েছে শুধু সেটুকুই এই মাধ্যমগুলিতে যুক্ত করেছে এক বিপুল সম্ভাবনা।

২৫.৫.১ গণমাধ্যম ও শিক্ষার পরিবেশ

গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কিছু সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শিক্ষার জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষার সহায়তাদানে ও বিস্তারে এইসব মাধ্যমের ব্যাপকতর ব্যবহার যেন এক শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে সমর্থ হয়েছে। এই নতুন পরিবেশে তরুণ বা বৃদ্ধ, সকলেই শিখবার সুযোগ পেতে পারেন। বৃহত্তর অর্থে বলা যায় যে, মননশীলতার বিকাশের এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গণমাধ্যমগুলি বঞ্চিত নারী পুরুষ বা শিশুদের জন্যও জ্ঞানলাভের সুযোগ প্রসারিত করেছে। এই শ্রেণির পক্ষে প্রথাগতভাবে নাম লিখিয়ে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষালাভ হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের হয়তো রেডিয়ো শোনার বা স্থানীয় সমাজকেন্দ্র টেলিভিশন দেখার সুযোগ রয়েছে। এভাবেই গণমাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে অনেক প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন এক নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে। এর সহজ কারণ এই যে তথ্য ও শিক্ষার উৎস এত ব্যাপক হয়ে চলেছে যে অসংখ্য বিষয়ে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

২৫.৫.২ গণমাধ্যম ও দূরশিক্ষা

দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। বোঝাই যাচ্ছে যে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা এক্ষেত্রে চলে দূর থেকে। এ ছাড়া, শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় চিঠিপত্রের আদান প্রদান, দৃশ্য-শ্রাব্য সহায়ক ব্যবস্থাকারী, যেমন রেডিয়ো, টেলিভিশিন, টেলিফোন এবং অবশ্যই ব্যক্তিগত যোগাযোগ। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ভৌগোলিক অবস্থান বা নির্দিষ্ট এলাকা থাকে, মোটামুটি একই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধা পাঠ্যক্রম ধরে সেখানে পড়াশোনা হয়। কিন্তু 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন স্থানে, এমনকি দূরদূরান্তে বসবাসকারী, চাকুরি বা গৃহকর্মে রত সব ধরনের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অনেক ধরনের পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে পারে, তেমনি একই পাঠক্রমে পাঠরত বিভিন্ন ছাত্রের শিক্ষার গতি বিভিন্ন হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এমন জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মুখ্য নীতিগুলির অন্যতম। এই মানুষেরা কেউ হয়তো দূর, প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসের জন্য, কেউবা হয়তো অর্থনৈতিক অসুবিধা, পারিবারিক দায়দায়িত্ব বা অন্য কোন কারণে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার পাঠকেন্দ্রগুলি, যেখানে রয়েছে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের সহায়তা এবং গ্রন্থাগার। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পড়াশুনার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। রেডিয়ো এবং দূরদর্শনের সহায়তাও দূরশিক্ষার পক্ষে বিশেষ জরুরি। ভারতের অনেকগুলি রাজ্য তাদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে রাজ্যস্তরে মুক্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।'

২৫.৫.৩ আকাশবাণী ও দূরদর্শন কর্তৃক শিক্ষাপাঠের সম্প্রচার

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সহায়ক হিসেবে ইলেকট্রনিক মাধ্যম আকাশবাণী ও দূরদর্শন এক সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করছে। এগুলি বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি-নির্ভর শিক্ষাপাঠের সম্প্রচার নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। দূরদর্শনও মূলত কলেজের ছাত্রদের জন্য কিছু "সমৃদ্ধীকরণ" অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে যার উদ্দেশ্য শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার পরিপূরণ এবং শিক্ষার দিগন্তের সম্প্রসারণ। এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাপাঠের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হলেও এগুলির অবদান মোটেই কম নয়। আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া সাধারণ মানুষও এই ধরনের সম্প্রচার থেকে উপকৃত হতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। যেহেতু একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সরাসরি দেশের সব জায়গা থেকে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতিযুক্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তা দেশের সব অংশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আকাশবাণীর অনেকগুলি কেন্দ্রই শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রচার করে। কথাবার্তা বা আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ মোট সময়ের আট শতাংশ ব্যয় হয় এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য। মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত স্তরে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে রেডিয়োর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। এক্ষেত্রে যে বক্তা শিক্ষকের ভূমিকায় রয়েছেন তাঁকে ছাত্ররা দেখতে পান, যদিও তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন না। তবে টেলিভিশন মাধ্যমটিকে যথাযথভাবে বুঝে নিয়ে যদি শিক্ষাদানের পাঠটিকে তৈরি করা যায়, তাহলে প্রত্যাশিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেওয়াই উচিত। তবে তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন পরীক্ষা, আলোকচিত্র বা মডেল, যেগুলি বক্তব্য বোঝানোর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী সেগুলি দেখানো কেবলমাত্র টেলিভিশনেই সম্ভব। তাই শিক্ষার পক্ষে টেলিভিশন একটি অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম।

দূরদর্শন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যসূচি নির্ভর অনুষ্ঠান দিয়ে কাজ শুরু করে। প্রারম্ভিক লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মানের, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার মানের উন্নয়ন, কারণ সেই সময় এমনকি দিল্লিতেও অনেক স্কুলে পরীক্ষাগারের উপযুক্ত জায়গার যন্ত্রপাতির বা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ছিল। তখন থেকেই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক বা কৃষকদের মতো বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা দূরদর্শনের নিয়মিত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখা গেছে যে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান কেবল সরাসরি শিক্ষাদান বা সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিই করে না, তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের উন্নতি ঘটায়। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ভূমিকা দ্বিগুণ গুরুত্ব লাভ করে।

২৫.৫.৪ ভবিষ্যৎ যোজনায় শিক্ষা ও গণমাধ্যম

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তা রূপায়ণের কার্যসূচি এবং সংসদ তা অনুমোদন করে। পাঠ্যক্রমের সঙ্গো সংশ্লিষ্ট বা জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক, যে ধরনের অনুষ্ঠানই হোক না কেন শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমগুলির সহায়তার প্রয়োজনকে ওই শিক্ষানীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং রেডিয়ো, টেলিভিশন বা ভিডিওর যতদূর সম্ভব বেশি ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এতে যে সুপারিশগুলি করা হয় তা হ'ল,

- স্কুলের ছাত্রছাত্রী, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা তপশিলি জাতি ও আদিবাসী অঞ্চলের জন্য সমস্ত প্রধান ভাষাভাষী অঞ্চলে টেলিভিশন ও রেডিয়োর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের যথাসম্ভব অধিক প্রচার।
- কিছু নির্বাচিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে টেলিভিশনে একটি আলাদা চ্যানেলের সৃষ্টি।
- শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের কথা মনে রেখে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহারের জন্য একটি উপগ্রহ ব্যবস্থার উদ্ভাবনা।
- সমস্ত প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ে রেডিয়ো এবং টেলিভিশন সেট বিতরণের ব্যবস্থা।
- একটি 'জাতীয় শিক্ষাতথ্যকেন্দ্রে'র প্রতিষ্ঠা।

অনুশীলনী ৪

নীচের ক্ষেত্রগুলিতে মাধ্যমের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন :

১। শিক্ষার সুযোগের বিস্তার।

....

....

....

....

২। শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধীকরণ।

....

....

....

....

৩। শিক্ষালাভের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি।

....

....

....

....

২৫.৬ সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা

সাংস্কৃতিক উত্তরণের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক প্রয়োজনে যোগাযোগের মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত রেডিয়ো, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাধ্যম এবং সর্বোপরি টেলিভিশন, তথ্য সরবরাহ করতে পারে, সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে পারে এবং আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংগীত, নৃত্য বা সাহিত্যের মতো শিল্পকর্ম হতে পারে আবার আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস বা পৌরাণিক কাহিনিও হতে পারে। এমনকি বিভিন্ন ঐতিহ্য বা ধর্মীয় বিধিনিষেধ বিষয়ক তথ্যও সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে জানতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমগুলি সেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে রক্ষার বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। সাংস্কৃতিক পরিচয় অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের গর্ব আজ মানুষকে একসঙ্গে বেঁধে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই একই ধরনের মানসিকতা, আচার ব্যবহার বা উৎসবের মাধ্যমে আদিবাসী মানুষের ছোটো গোষ্ঠীতে ঘটতে পারে; আবার জাতীয় স্তরেও ঐতিহাসিক বন্ধন ও মূল্যবোধের ভাগীদারি থেকেও তা সম্ভব। বস্তুত গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে দেশের সঙ্গে একাত্মতা ও জাতীয় সংহতির বোধ গড়ে তোলা সম্ভব। মাধ্যমের সাহায্যে দেশের প্রতি আনুগত্যের উন্মেষ ঘটানো এবং তাকে গভীরতর করে তোলা যায়। তাই সংস্কৃতির সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য।

২৫.৬.১ গণমাধ্যম, ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতি

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। ভারতের রাজ্যগুলি প্রধানত এক একটি সাধারণ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আমাদের যে বিপুল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে এই পটভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চল তথা ভাষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে দাবি করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু একেবারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ যার কোন চিহ্ন অন্য অঞ্চলে পাওয়া যাবে না। আমাদের বহু উৎসব এবং সাহিত্যের পরম্পরা এই শ্রেণিভুক্ত। ভারতবর্ষের বহু উৎসবের মধ্যে হয়তো একটি অন্তর্লীন যোগসূত্র রয়েছে, কিন্তু মূলত সেগুলি আঞ্চলিক ও সামাজিক।

আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ধর্মীয় বিশ্বাসের থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধর্মগুলি ভিন্ন হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী একই পরিবেশে বাস করার ফলে এগুলির সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ওপরেও পারস্পরিক প্রভাব পড়েছে। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সমস্ত ধর্মেই মানবিকতা, সহনশীলতা, সুবিচার ও সুসভ্য মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। তাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এখানে সেখানে কিছু বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও মোটের ওপর ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, আমাদের এই মিশ্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশবিশেষ। তাই দূর-দূরান্তে এবং মানুষের একেবারে হৃদয়ে এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা যে গণমাধ্যমের রয়েছে তা ভারতবর্ষের ঐক্য ও প্রগতির লক্ষ্যে এক অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

২৫.৬.২ গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঐতিহাসিক কারণে ও অনবরত মেলামেশার ফলে গভীরতর মূল্যবোধের অংশীদার হওয়া ছাড়াও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত শ্রেণির মানুষের অবদানের কথা জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। গান্ধিজির নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। গান্ধিজি নিজে গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতা এবং ঐক্যবদ্ধ এক রাষ্ট্রের গঠনে অগাধ বিশ্বাসের প্রতীক। বস্তুত গান্ধিজি ছিলেন আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির এক প্রতীক। জওহরলাল নেহরু আধুনিক ভারতের যে চিত্র কল্পনা

করেছিলেন তাতে সমস্ত ভারতবাসী তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাদের ব্যক্তিজীবন এবং রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন (একক ৮ দ্রষ্টব্য)। একে অপরের বিশ্বাস সম্বন্ধে যাতে অবহিত হতে পারেন সে ব্যাপারে যোগাযোগ মাধ্যমগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ওই মাধ্যমগুলিকে জোর দিতে হবে ঐতিহাসিক বন্ধনগুলির উপর এবং এমন এক মানসিকতা গড়ে তোলায় যা হবে একপেশে না হয়ে বস্তুনির্ভর, জ্ঞান ও সংস্কারের বিরোধী না হয়ে যুক্তিবাদী এবং গোঁড়া ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে মুক্তমনা।

২৫.৬.৩ গণমাধ্যম ও সাধারণ সাংস্কৃতিক চেতনা

দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে তাদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর কাজে গণমাধ্যম কীভাবে সাহায্য করতে পারে? আজও বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষ পরস্পরকে কেবল গণমাধ্যমের সাহায্যেই জানতে পারেন। যেমন ধরা যাক, পাহাড় ঘেরা কাশ্মীর উপত্যকার কথা। সারা দেশের সঙ্গে ওই উপত্যকার যোগ রয়েছে কেবল সড়ক পথে আর বায়ুপথে কারণ এখনও সেখানে রেলপথ পৌঁছায়নি। রেলপথের অভাব এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়া ওখানকার জলবায়ুর জন্যও কাশ্মীরিরা উপত্যকা ছেড়ে বিশেষ বাইরে আসেন না। তাই এটা খুব আশ্চর্যের নয় যে দেশের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান এবং অন্য দিকে তাঁদের উপত্যকা সম্পর্কে দেশের অন্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের জ্ঞান, দুইই অত্যন্ত কম। তবে সত্তরের দশকের গোড়ায় উপত্যকায় টেলিভিশনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। কাশ্মীরিদের কাছে এখন দেশের সব অংশের কিছুটা চিত্রাভাস পৌঁছে গেছে এবং আমাদের দেশবাসীর সাংস্কৃতিক পটচিত্র সম্পর্কে তাঁদের কিছুটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এটা অনুমান করা খুব শক্ত নয় যে দুরদর্শনের অনুষ্ঠানের সাহায্যে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের কাছে সামগ্রিক ভারত সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তাই কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা দেশের দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন অংশে বসবাসকারী মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে।

২৫.৬.৪ মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ

আকাশবাণী, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র জাতীয় জাগরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। সম্প্রচার মাধ্যম, অর্থাৎ রেডিয়ো এবং টেলিভিশনে সংগীত, নৃত্য ও নাটকের জাতীয় কার্যক্রম যেমন আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির ধ্যানধারণার পরিপোষণ করে তেমনই বিভিন্ন অঞ্চলের মদ্যে শিল্পসাহিত্যশৈলীর বিনিময়ের পথও প্রশস্ত করে। মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষে গণমাধ্যমের ভূমিকাটি হয়ত প্রচ্ছন্ন কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে তা উপেক্ষণীয় নয়।

অনুশীলনী ৫

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করুন ঃ

১। গণমাধ্যম দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে।

....

....

....

২। পরস্পরের সংস্কৃতির উপলব্ধি ও মর্যাদাদানের মাধ্যমে আমরা এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি।

....

....

....

৩। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নানা ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

....

....

....

২৫.৭ সারাংশ

এই এককে আপনারা তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে পড়েছেন। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এখানে বলা হয়েছে সেগুলি হল,

- তথ্য সরবরাহ এবং গণততান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনার বিকাশ।
- শিক্ষার সুযোগের বিস্তার, শিক্ষার পরিবেশের সৃষ্টি এবং শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করে তোলা।
- পরস্পরের বোঝাপড়ার উন্নতি এবং পরস্পরের সংস্কৃতির মর্যাদাবোধের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ।

২৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। সমাজব্যবস্থায় যোগাযোগের ভূমিকা কী?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। শিক্ষার ক্ষেত্রে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করুন ঃ

(ক) ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(খ) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য মানুষের চাই তথ্য ও সংবাদ।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(গ) যোগাযোগ ব্যবস্থায় গণসংযোগের একটা নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২৫.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। গ্রামীণ ঃ ব্যাংক সংক্রান্ত কার্যকলাপ, ঋণসংগ্রহ প্রভৃতি; উপযুক্ত সারের ব্যবহার; সমবায়ের গঠন।

শহরবাসী ঃ ক্রেতার অধিকার; পরিবেশ সংরক্ষণ। উত্তরটিকে আপনি আরও বিস্তৃত করতে পারেন।

২। (ক) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (খ) বাক্‌স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ

(গ) ব্যক্তিগত যোগাযোগের (ঘ) রাজনৈতিক বিষয়ে, নিরপেক্ষ, বস্তুনির্ভর

৩। **উত্তরের সংকেত**

(ক) আলোচনা বা সংবাদপত্রের নিবন্ধের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে তুলে মহিলাদের তাঁদের শিক্ষা এবং কাজের সমানাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়।

(খ) জাতীয় সংহতির ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। বিভিন্ন ধর্মীয় এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ একই সূত্রে গাঁথা রয়েছেন।

৪। আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারেন, যেমন

(ক) দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগের বিস্তার, উদাহরণ, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

(খ) রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধীকরণ।

(গ) শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ এবং শিশুদের কাছে নানা বিষয়ে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া এবং এর মধ্যে দিয়ে একটি শিক্ষালাভের পরিবেশ গড়ে তোলা।

৫। **উত্তরের সংকেত**

(ক) যেমন, ভারতের একটি অংশের লোক টেলিভিশনে বহুধরনের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে দেখতে ও জানতে পারেন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরার বিশাল বৈচিত্র্য এবং ঐক্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

(খ) পরস্পরের সংস্কৃতিকে মর্যাদাদানের মধ্যে দিয়ে আমরা অবাঞ্ছিত জিনিসটুকু বাদ দিয়ে অন্য সংস্কৃতিক ভালো দিকগুলি গ্রহণ করতে পারি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাহিত্য ও শিল্পজাত শৈলীর বিনিময়ের মাধ্যমে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে।

(গ) যেমন, দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠী যদি পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা না করে তবে উভয় গোষ্ঠীরই অপরের রীতিনীতি সম্পর্কে বহু ভুল ধারণা তৈরি হয়। এর ফলে নানা ধরনের গুরুতর সংঘাত দেখা দিতে পারে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর

১। আপনার উত্তরে যে সব বিষয় আলোচনা করতে পারেন ঃ

টেলিভিশন, রেডিয়ো, সংবাদপত্র, জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য ও সংবাদের সম্ভার ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীসমূহের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ভূমিকা। গণমাধ্যমগুলি ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে কোনো কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে, বিনোদন পরিবেশন করে, জনমতকে প্রভাবিত করে, জনসাধারণকে তাদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করে।

২। যেমন, আকাশবাণী ও দূরদর্শন সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে আবার স্কুল কলেজের জন্য পাঠ্যসূচিভিত্তিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করে। গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ওই দুটি মাধ্যম বয়স্ক শিক্ষা এবং কৃষিকাজ ভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং এভাবে শিক্ষার বাতাবরণের উন্নতি ঘটায়।

৩। (ক) যেমন, যদি কোনও নাগরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করার সুযোগ না পান, এবং তাঁর বিচারে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম মানুষকে নির্বাচিত করার স্বাধীনতা না পান তাহলে গণতন্ত্র কাজ করবে কীভাবে?

(খ) নির্বাচন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ। এখন যদি আপনি কাউকে ভোট দিতে চান তাহলে তার অতীত কার্যকলাপ, নীতি এবং প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জেনে তবেই আপনি ভোট দিতে পারেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে ক্রিয়াশীল রাখার ব্যাপারে তথ্য ও সংবাদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(গ) যেমন, একটি বিশেষ ধরনের নৃত্য বা সংগীতের সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে কোনো সভায় বক্তব্যসহ প্রদর্শন উপস্থাপনা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি যোগাযোগের একটি উপযোগী কর্মধারা হতে পারে।

একক ২৬ □ যোগাযোগ পদ্ধতি

গঠন

২৬.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

২৬.২ গণসংযোগ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আজকের গণসংযোগ-মাধ্যম

ভারতের পটভূমিকায় কার্যকরী মাধ্যম

২৬.৩ গণযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

যোগাযোগ ব্যবস্থার অতীত

যোগাযোগ-বিপ্লব

২৬.৪ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

২৬.৫ নব্যবিশ্ব-তথ্য যোগাযোগ ধারা

প্রাচীন ধারা

নব্য ধারা সম্পর্কিত ধ্যানধারণার উন্মেষ কীভাবে হল?

নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক

আমাদের জাতীয় পটভূমিকায় নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগের প্রাসঙ্গিকতা

২৬.৬ সারাংশ

২৬.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

২৬.৮ উত্তরমালা

২৬.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে আপনারা পড়েছেন। এই এককে আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জনসংযোগের বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখব এই মাধ্যমগুলিকে দেশের বিপুল জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রযুক্তি কী ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথ্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তথ্য বিনিময় পরস্পরকে জানার এবং পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞানের আদানপ্রদানের এক

প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য তথ্যের সংগ্রহ এবং তার প্রচার এই দুটিই এখন মুষ্টিমেয় আন্তর্জাতিক সংস্থার কুক্ষিগত যার ফলে তথ্যের অসম বণ্টন ঘটছে। এজন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 'নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগধারা'র, যার ফলে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তথ্যের এক সুসমঞ্জস ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন সম্ভব হবে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'নব্য ধারার' প্রাসঙ্গিকতা মনে রেখে আমাদেরজাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার বিষয়টি আমরা আলোচনা করব, কারণ এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং অংশের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি সক্ষম হবেন :

- কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই মাধ্যমগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ভারতের পটভূমিকায় তাদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা কী তা বুঝতে।
- গণ-সংযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ভূমিকার বর্ণনা করতে।
- আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব উপলব্ধি করতে।
- তথ্যের সুসমঞ্জস ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের গুরুত্ব এবং নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগধারায় তার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে।

২৬.২ গণসংযোগ

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে তথ্যসংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়া ও 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যাস কমিউনিকেশন'-এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে উন্নয়নের কাজে গণমাধ্যমের ভূমিকার সুপরিচিত প্রবক্তা ডঃ উইলবার শ্রাম (Dr. Wilbur Schramm)-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞের দল যখন ভারতে এসেছিলেন তখন আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ডঃ শ্রামের একটি সাক্ষাৎকার হয়। পরে ডঃ শ্রাম এই সাক্ষাৎকারের বিষয়ে যা বলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক : "সে দিন অপরাহ্নে শ্রী নেহেরু বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আচ্ছা গণসংযোগ ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমার মনে হয় বিষয়টা আমি ভালো বুঝি না।' তখন আমি বললাম 'কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, ভারতে আপনিই তো মুখ্য গণসংযোগকারী।' তারপর আমি তাঁকে বললাম তাঁর বক্তৃতায় হাজার হাজার শ্রোতার কথা, তাঁর বইয়ের কথা, তাঁর বেতার সম্প্রচারের কথা। এবার তিনি মাথা হেলিয়ে হেসে উঠলেন, বললেন, 'ওঃ তাই বলুন। আমার মনে হয় ওই ব্যাপারটা কিছুটা আমি জানি। নেহেরু ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা নিয়ে কিছুটা ঠাট্টা করলেন, বললেন যে তাঁর লম্বা বক্তৃতার মাঝপথে হয়তো লাউড স্পীকার খারাপ হয়ে যাবে কিংবা হয়তো তা আদপেই কাজ করবে না। তারপর তিনি যা বললেন তা আমি কখনও ভুলব না। তিনি বললেন, "তার ফলে অবশ্য আমাদের পারস্পরিক বাক্যালাপে সুবিধা হবে।"

উইলবার শ্রাম পরে ওই শেষ বাক্যটি 'তার ফলে অবশ্য আমাদের পারস্পরিক বাক্যালাপে সুবিধা হবে' তলায় দাস দিয়ে রেখেছিলেন। কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজে পারস্পরিক যোগাযোগের অর্থ পরিস্ফুট হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে গণসংযোগের অর্থাৎ বৃহৎসংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে রেডিয়ো বা টেলিভিশানের মতো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই ভারতবর্ষে জনসংযোগের কাজ শুরু হয়েছিল। একই সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্য যোগাযোগের প্রক্রিয়া লক্ষ করলে এর সূত্রপাত খুঁজে

পাওয়া যাবে। যেমন ধরুন, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি সর্বদাই এক একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এসেছে এবং এখনও করছে। তেমনই কোনো ধর্মস্থানে অথবা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মীয় সমাবেশ চিরকালই যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এসেছে। তা ছাড়া রয়েছে অজস্র মেলা, যেখানে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে বহু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন, যোগাযোগ করেন। (চিত্র ২৬.১ দেখুন)।

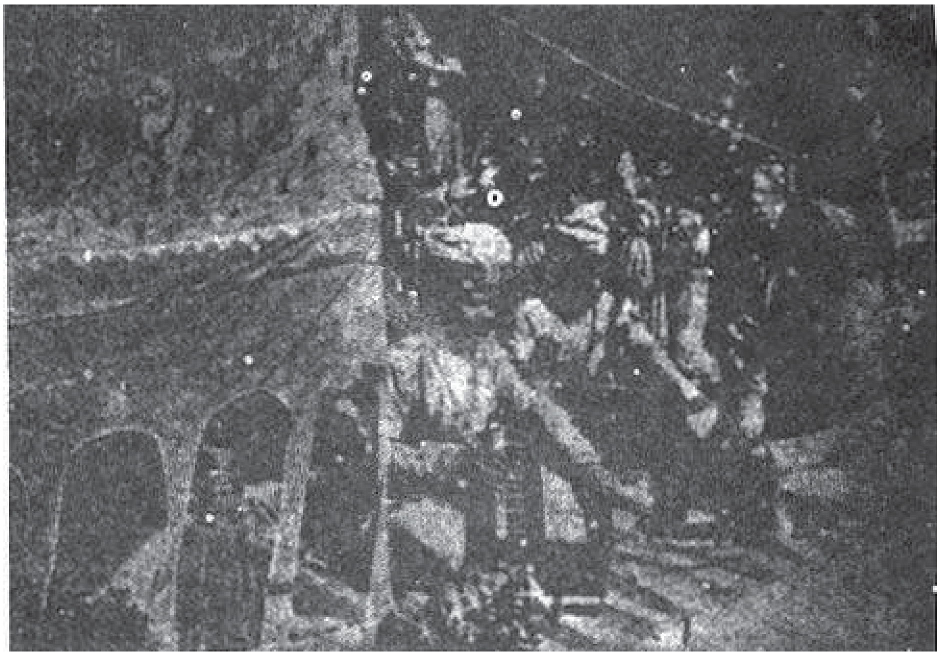

চিত্র ২৬.১ : পুতুল নাচ—যোগাযোগের এক প্রচলিত উপায়।

২৬.২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে পূর্ববর্তী এককে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এটা এখানে বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, গান্ধিজি ছিলেন এদেশের সেরা তথ্য প্রজ্ঞাপক। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রার্থনা সভাগুলিতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সম্ভবত মনে আছে যে ওই সব সভায় গান্ধিজির ভাষণ মানুষের মনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করত। প্রচলিত অর্থে, জনসাধারণের সামনে বক্তৃতায় তিনি একজন প্রভাবশালী বক্তা ছিলেন না। তিনি বিশেষ অলংকারময় ভাষা ব্যবহার করতেন না, কথা বলতেন সাদাসিধা ভাষায়। ভারতের সাধারণ মানুষের ভাষাই ছিল তাঁর ভাষা, তাদের বাগ্‌ধারায় তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। কখনও মনে হত না যে, তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, বরং তিনি ছিলেন জনতার চিন্তাভাবনারই শরিক। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি গভীর প্রত্যয় এবং মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকৃত দরদ দিয়ে কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যই ছিল সারল্য এবং আন্তরিকতা। গান্ধিজির বাণী দেশের সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, সত্যাগ্রহের সময় গান্ধিজি দেশের সর্বস্তরের সাধারণ নারীপুরুষকে আন্দোলনের সামিল করতে পেরেছিলেন। যেমন ধরুন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহের কথা। লবণ প্রতিটি গৃহেই ব্যবহৃত হয়। লবণ করের বিরুদ্ধে এবং সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরির জন্য গান্ধিজি যে সত্যাগ্রহ শুরু করেন তা ছিল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের এক অভিনব প্রয়াস, সারা পৃথিবীতে যার সমকক্ষ খুব কমই আছে। যখন এদেশের মানুষ ইংরাজদের তৈরি সামগ্রী বর্জন করতে শুরু করলেন তখন তাঁদের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল এবং তার ফলে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্পও মানুষের মধ্যে দৃঢ়তর হয়ে উঠল।

অনুশীলনী ১

নীচের বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ (ব) অথবা গণসংযোগ (গ) হিসেবে চিহ্নিত করুন

১। কোনো ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের খেলা নিয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা। [ ]

২। ছাত্রদের কাছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পঠন সামগ্রী পাঠানো। [ ]

৩। প্রার্থনা সভায় গান্ধিজির ভাষণ। [ ]

৪। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

২৬.২.২ আজকের গণসংযোগ-মাধ্যম

ব্যক্তিস্তরে পারস্পরিক যোগাযোগ এখনও আমাদের দেশে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে এখন এদেশে একটি উন্নত গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। গণসংযোগের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে, আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং চলচ্চিত্র। এখানে প্রত্যেকটি মাধ্যমের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

চিত্র ২৬.২ : রেডিয়ো আজও যোগাযোগের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকরী একটি মাধ্যম।

আকাশবাণী

আমাদের দেশে বেতার সম্প্রচার বেসরকারিভাবে শুরু হয় ১৯২৭ সালে, সরকারিভাবে ১৯৩০ সালে। তাই আকাশবাণীর ইতিহাস প্রায় ৭০ বছরের পুরানো। এখন ১৮৫টি সম্প্রচার কেন্দ্র ও ২৯৩টি সম্প্রচার যন্ত্রব্যবস্থার

(transmitter) সাহায্যে আকাশবাণী দেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেছে। বেতার সম্প্রচারের এই প্রসার ও কার্যকারিতার পেছনে ষাটের দশকের 'ট্রানজিস্টার বিপ্লব' নামে পরিচিত ঘটনাটির বড়ো ভূমিকা রয়েছে। কারণ এর ফলে বেতার গ্রাহক যন্ত্র বা রেডিয়ো সেট যথার্থই সস্তা এবং বহনযোগ্য হয়ে ওঠে। সমস্ত ট্রান্সমিটার থেকে সম্প্রচারিত সব কার্যক্রমের দৈনিক প্রসারকাল যুক্ত করলে তা দাঁড়াবে ১৫০০ ঘণ্টারও বেশি। এই অনুষ্ঠানে সবকটি জাতীয় ভাষা এবং বহু উপভাষা ব্যবহৃত হয়। মহিলা এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠান ৬০টিরও বেশি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। অনেকগুলি কেন্দ্র থেকে যুবক যুবতিদের বা শিশুদের কিংবা অন্য কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এখন যেহেতু রেডিয়ো-সেটের জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা নেই তাই দেশে রেডিয়ো-সেটের মোট সংখ্যা বলা শক্ত। সম্ভবত সারাদেশে রেডিয়ো সেটের মোট সংখ্যা হবে পাঁচ কোটির কাছাকাছি। আকাশবাণীর তরফে দাবি করা হয়েছে যে, সারা দেশে প্রায় কুটি কোটিরও বেশি লোক রেডিয়ো শোনেন (চিত্র ২৬.২ দেখুন)। রেডিয়ো সেট তুলনায় দামি নয় এবং বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াও, ড্রাইসেল দিয়ে তা চালনো সম্ভব। এই সমস্ত কারণে এদেশে গণমাধ্যম হিসেবে আকাশবাণীর ব্যাপ্তিই সর্বাপেক্ষ বেশি।

দূরদর্শন

দূরদর্শন পরীক্ষামূলকভাবে ছোটো আকারে শুরু হয় ১৯৫৯ সালে। তখন দৈনিক এক ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে মাত্র দুটি অনুষ্ঠান এতে দেখানো হত। ১৯৭২ পর্যন্ত দেশের একমাত্র টেলিভিশন কেন্দ্র ছিল নতুন দিল্লিতে। ওই কেন্দ্র তার চতুর্দিকের ৬০ কিমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট অঞ্চলে এই সম্প্রচার পৌঁছে দিতে পারত। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই (তৎকালীন বম্বে), শ্রীনগর এবং অমৃতসরে টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতে টেলিভিশনের প্রসারে ১৯৭৫-কে একটি যুগান্তকারী বছর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই বছর টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হল কলকাতা, চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) ও লখনউতে। তার চেয়েও বড়ো কথা, ওই বছরই ভারতে প্রথম টেলিভিশন কার্যক্রম সম্প্রচারিত হল উপগ্রহের সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পিছনে রয়েছে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকে এমন একটি উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন তার অক্ষের চারদিকে একপাক ঘুরতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয় ঠিক তেমনই এই উপগ্রহ একই দিকে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই উপগ্রহ পৃথিবী থেকে পাঠানো প্রচার তরঙ্গকে গ্রহণ করে আবার ফেরত পাঠায় এবং এর মধ্যে দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের এক বিস্তৃত অঞ্চলে ওই প্রচার তরঙ্গে ধরা সম্ভব হয়। যেহেতু ওই অনুষ্ঠানগুলি ছিল মূলত শিক্ষামূলক তাই সামগ্রিক ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছিল উপগ্রহ সহায়িত শিক্ষামূলক টেলিভিশন পরীক্ষা বা Satellite Instructional Television Experiemnt (SITE)। দেশের ছয়টি রাজ্যে এই অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য বিশেষ ধরনের গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং প্রতি রাজ্যে প্রায় ৪০০টি করে ওইরকম যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। যে রাজ্যগুলি এই কর্মসূচির আওতায় এসেছিল সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, ওড়িশা, গুজরাট ও রাজস্থান। সমস্ত প্রকল্পটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থাকে (ISRO) সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং গ্রাহক যন্ত্রগুলি বসানো ও দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই পরীক্ষামূলক কর্মসূচিটিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে, একেবারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মতো সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ রেখে চালানো হয়েছিল। তাই এটি থেকে অনুষ্ঠানের ভাষা, উপস্থাপনা বা উপাদান সম্পর্কে অনেক কিছু শেখা গিয়েছিল।

ভারতে টেলিভিশনের প্রসারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯৮২-র নভেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের সম্প্রচার। দেশের কয়েকটি বিভিন্ন অংশের মানুষকে এই খেলাধুলা দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য ২০টি স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল। সম্প্রচারের পরিধি বাড়ানোর জন্য একটি উপগ্রহের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। ওই একই বছরে দূরদর্শন প্রথম রঙীন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ভারতের নিজস্ব বহু উদ্দেশ্যসাধক উপগ্রহ ইনস্যাট-1B, ১৯৮৩-র আগস্ট মাসে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন 'আমরা টেলিভিশনের সুযোগ নিয়ে বিনোদনের ব্যবস্থা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যই উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করছি এবং টেলিভিশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছি। রেডিয়ো ও টেলিভিশন, বিশেষত, এগুলির দ্বারা একটি জাতীয় প্রচারজালিকা (network) তৈরি হলে, উভয়ই জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার আদর্শ মাধ্যম হতে পারে। একই সঙ্গে এগুলি আঞ্চলিক শিল্পধারাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি আমাদের কাছে একই সঙ্গে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ও বিশাল সম্ভাবনা। এর উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য আমাদের চাই কল্পনাশক্তি বিশিষ্ট মানুষ। এই বক্তব্যেই জাতীয় চেতনা সৃষ্টি ছাড়া টেলিভিশনের কাজ, অর্থাৎ তথ্য সরবরাহ, শিক্ষাদান ও বিনোদন সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

ইনস্যাট-1B উপগ্রহের সহায়তা, নিম্নক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটারের ব্যবহার এবং কিছু জায়গায় সরাসরি সম্প্রচার ধরবার মতো গ্রাহক যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এই সব কিছু মিলিয়ে টেলিভিশনের পরবর্তী সম্প্রসারণ নির্ধারিত হল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার টেলিভিশন প্রচারজালিকার সম্প্রসারণের জন্য ৬৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরে এক বিরাট প্রকল্প অনুমোদন করলেন। এই প্রকল্পের আগে টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫ এবং দেশের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৪ ভাগকে টেলিভিশন সম্প্রচারের আওতায় আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই নতুন সম্প্রসারণের প্রকল্পে ট্রান্সমিটারের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮০ করা হল আর ৭০ শতাংশের বেশি দেশবাসীকে ওই প্রচারের আওতায় আনা সম্ভব হল। বস্তুত নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে (১৯৯৮) ট্রান্সমিটারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০-য়, যার ফলে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ এগুলির আওতায় এসেছে।

চলচ্চিত্র

যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র। আমাদের দেশে বছরে আটশতের বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং এ ব্যাপারে বোধহয় আমরা বিশ্বে সবার আগে রয়েছি। ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশান সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা এবং তথ্যচিত্র তৈরি করেন এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র তৈরি হয় বেসরকারি উদ্যোগে। যদিও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে দাবি করা হয় যে, সেগুলিতে সামাজিক চিন্তাভাবনা পরিবেশিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির অধিকাংশই বিনোদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত এবং সেই বিনোদনের মানও খুব একটা উঁচু নয়। সে সব চলচ্চিত্রের মূল উপাদান হিংসা ও যৌনতার চিত্রায়ন। সেগুলি দর্শকমণ্ডলীকে হয়তো সাময়িকভাবে আকৃষ্ট করে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনো 'সামাজিক পরিবর্তন' বা চেতনার বিকাশ ঘটে না। এটা হয়তো একটা বিতর্কিত বক্তব্য এবং আপনার এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে। এ ছাড়া গণসংযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের কার্যকারিতা সীমিত হওয়ার আরও একটি কারণ দেশে প্রেক্ষাগৃহের অভাব। এদেশে প্রেক্ষাগৃহের মোট সংখ্যা ১২,০০০-এর কিছু বেশি যা এই দেশের প্রায় ১০০ কোটি জনসংখ্যার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র

যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১৯৯৫ সালে ছিল প্রায় ৩৭ হাজার এবং তাদের মোট প্রচার সংখ্যা ছিল আট কোটির কাছাকাছি। অবশ্য যোগাযোগের ব্যাপারে সংবাদপত্রের কার্যকারিতার মূল্যায়নের সময় দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, কেবলমাত্র সাক্ষর মানুষই সংবাদপত্র পাঠের সুবিধা পেতে পারেন যদিও কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষর মানুষেরা অন্যদের তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, দুর্গম ও দূরাঞ্চলে পরিবহণের অসুবিধার জন্য সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়া শক্ত।

তাই সংবাদপত্রের প্রচার মূলত বড়ো বড়ো মহানগীর ও শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তবে আমাদের সমাজে ছাপানো বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি। মানুষ এসব বিষয় বিশেষ বিবেচনা না করেই বিশ্বাস করে বসেন। তা ছাড়া সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের অধিকাংশই সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় মানুষের কাছে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। অবশ্য এই বক্তব্যের বিরোধিতাও করা যায় কারণ কিছু সংবাদপত্র চাঞ্চল্যকর সংবাদ ও মতামত প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পাঠককে আকর্ষণের চেষ্টা করে, কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সংবাদ ও মতামতকে বুঝতে বা বিচার করতে পাঠককে সাহায্য করে না। তাই মূল কথাটি হল, যিনিই রেডিয়ো শুনুন, টেলিভিশন দেখুন বা সংবাদপত্র পাঠ করুন না কেন তাঁকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে, নিজস্ব বিশ্লেষণ ও বিচারবোধ প্রয়োগ করতে হবে।

অনুশীলনী ২

এখানে আলোচিত যে-কোনো দুটি গণসংযোগের মাধ্যমকে বেছে নিয়ে তাদের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

২৬.২.৩ ভারতের পটভূমিকায় কার্যকরী মাধ্যম

ভারতের পক্ষে তথ্যের সম্প্রচার ও যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী এবং উপযুক্ত মাধ্যম কোনটি? এর সরল উত্তর সম্ভবত এই যে প্রতিটি মাধ্যমেরই সমানভাবে প্রসার ঘটা উচিত যাতে জনসাধারণের আরও বৃহত্তর অংশের কাছে সেগুলি পৌঁছাতে পারে এবং বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবেশনায় যেন সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের কারণ এই যে মাধ্যমের বর্তমান প্রসারের মধ্যে অসাম্য ও ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। কিন্তু অঞ্চল গণমাধ্যমের সুযোগ অন্য অঞ্চল থেকে বেশি পাচ্ছে। বিহার বা ওড়িশার মতো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাজ্যগুলি গণমাধ্যমের পরিষেবা থেকেও কিছুটা বঞ্চিত। গ্রাম ও শহরের মানুষের কাছে ওই পরিসেবা পৌঁছানোর ব্যাপারে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। গণসংযোগের মাধ্যমগুলি মূলত নগরকেন্দ্রিক। শহরেই রেডিয়ো, টেলিভিশন সেট বা সংবাদপত্রের সংখ্যার বেশি, চলচ্চিত্র দেখার সুযোগও সেখানে বেশি। গ্রামীণ জনসাধারণ অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ এই মাধ্যমগুলির সুযোগ তুলনায় অনেক কম পান। এর ফলে দেখা যায় অনুষ্ঠানের উপাদান এবং উপস্থাপনা উভয়ই শহরঘেঁষা হতে দেখা যায়। নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত অনুষ্ঠান, লেখালেখি বা ভাবনাচিন্তা শতকরা হিসেবে অনেকখানি বেশি।

অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার আদর্শ ব্যবস্থা সম্ভবত গণসংযোগের মাধ্যম এবং পারস্পরিক ব্যক্তিগত যোগাযোগের একটি সংমিশ্রণ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ইউনেস্কোর (UNESCO হচ্ছে United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organisation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) অর্থানুকূল্যে 'রেডিয়ো রুর‍্যাল ফোরাম' (Radio Rural Forum) নামে এক পরীক্ষা শুরু করে। এই প্রকল্পে কতকগুলি গ্রামে কিছু দল তৈরি হয়েছিল। এঁরা অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো, পুনে, দ্বারা চাষীদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত রেডিয়ো অনুষ্ঠান শোনার জন্য উৎসাহী কৃষকদের একত্র করতেন। অনুষ্ঠান শোনার পর শ্রোতারা অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। তারপর তাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত পাঠিয়ে দিতেন বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রে। সমগ্র পরীক্ষাটির একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, এই পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে এর মধ্যে দিয়ে ওই সাধারণ শ্রোতাদের মনে নাড়া দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁদের ভাষায় আন্তরিকতা ও জিজ্ঞাসু মনোভাব ফুটে উঠেছিল। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীই যেখানে সমানভাবে কথা বলার অধিকারী, এমন একটা সংগঠিত অন্তর্দলীয় আলোচনার অভিজ্ঞতা ওই গ্রামের মানুষদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাঁরা এক সুপ্রাচীন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, যেখানে আলোচনায় কেবল বয়োবৃদ্ধেরা এবং তথাকথিত মান্যগণ্যেরাই কথা বলে থাকেন। কিন্তু মাত্র প্রথম দু-তিনটি আলোচনাচক্রের পরে এই রীতিটি ভেঙে গিয়েছিল।

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শোনার সময় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তা সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সরব হওয়ার ক্ষমতা যুগিয়েছিল। অজস্র গৃহীত সিদ্ধান্ত, কূপ খনন, ভালো জাতের ষাঁড় ও লেগহর্ণ মুরগি ক্রয়, বিপণন সমবায় ও বালওয়াড়ির প্রতিষ্ঠা, এ সবই রেডিয়ো শ্রোতা গোষ্ঠীর কার্যকরী ভূমিকার সাক্ষ্য বহন করে।

ওই রেডিয়ো কার্যক্রম শোনার পরে আলোচনাচক্র ছাড়া একই বিষয়ের ওপর কিছু ছাপানো কাগজপত্র দেওয়া হত। সামগ্রিক পরীক্ষাটি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। এতে পরিষ্কার বোঝা গেছে যে একটি আধুনিক মাধ্যমের সঙ্গে যদি ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা এবং অন্য কিছু সহায়ক উপাদান যেমন পোস্টার, স্লাইড ইত্যাদি যোগ করা যায় তাহলে তা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী ৩

আমাদের দেশে গণসংযোগের কার্যকরী মাধ্যম নির্বাচনের জন্য যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে সেগুলি উল্লেখ করুন।

....

....

....

২৬.৩ গণযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত অগ্রগত

গণযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রধান অগ্রগতিগুলিতে প্রযুক্তির বিরাট অবদান রয়েছে। আমরা এখানে দেখব যোগাযোগ ব্যবস্থার অতীতের অবস্থাটা কেমন ছিল, আজকের নতুন সম্ভাবনাগুলিই বা কী।

২৬.৩.১ যোগাযোগ ব্যবস্থার অতীত

শহর থেকে দূরে কোনো দুর্গম গ্রামের জীবন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সেখানকার কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত। এগুলির মধ্যে রয়েছে খারাপ রাস্তাঘাট, বর্ষাকালে যা প্রায়ই অগম্য হয়ে ওঠে এবং অনিয়মিত ডাক ব্যবস্থা যার উপর একেবারেই নির্ভর করা যায় না। টেলিফোন কেউ চোখে দেখেনি, লেখাপড়া জানা লোকও দু'একজন। এমন একটা গ্রামের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কী? সম্ভবত এর উত্তর হচ্ছে

রেডিয়ো এবং তার পাশাপাশি প্রসারণ কর্মীদের আনাগোনা। কিন্তু রেডিয়ো আবার প্রতিটি বাড়িতে নেই, তাই এরকম একটা পরিস্থিতিতে, এটা মোটেই বিস্ময়ের নয় যে মানুষ কিছুটা অন্তর্মুখী, নিরাসক্ত এমনকি তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছুটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবেন। স্পষ্টতই আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই সুখকর নয়। এ ধরনের অবস্থা কি এখনও রয়েছে?

চিত্রটা এখন পালটাচ্ছে। দেশের বেশির ভাগ গ্রামেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলিও অনেক সময়ই সমাজ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে কয়েকটিতে টেলিফোন যোগাযোগ থাকতে পারে, আর যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে সেখানে সমাজকেন্দ্র, এমনকি কিছু বাড়িতেও টেলিভিশন থাকতে পারে। এসব সত্ত্বেও যোগাযোগের প্রথাগত পদ্ধতি, যেমন লোকসংগীত, লোকনাট্য এবং ব্যক্তিস্তরে পারস্পরিক যোগাযোগ, সেখানে যোগাযোগের প্রধান উপায়। এই ধরনের প্রথাগত মাধ্যমগুলিকেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক জাগরণের জন্য ব্যবহার করা যায়।

২৬.৩.২ যোগাযোগ-বিপ্লব

এইরকম একটি প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক বিপ্লব এদেশে ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিককালে গ্রামের যেসব মানুষের টেলিভিশন দেখার সুযোগ রয়েছে তাঁর সম্ভবত দূরদর্শনের সম্প্রচারে মানুষের চন্দ্রাবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। দূরদর্শন স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো যে সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান, সম্প্রচার করে সেগুলির সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত হয়েছিল। অর্থাৎ রাজধানীতে যে সব অনুষ্ঠান হচ্ছে তা তাঁরা অনুষ্ঠান চলাকালীন সরাসরি দেখছেন। কিন্তু এটি যে উপগ্রহের সাহায্যে সম্প্রচারের ফলেই সম্ভব হয়, সে ব্যাপারটি দর্শকরা খুব কমই খেয়াল করেন।

উপগ্রহ

উপগ্রহের সাহায্যে সম্প্রচারকে যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলা যায়। দূর দূরান্তে ছবি এবং শব্দ প্রেরক ছাড়াও উপগ্রহ সম্প্রচার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। দেশের অনেক শহর থেকেই এখন আমরা সরাসরি ডায়াল করে কেবল দেশের অন্য শহরের সঙ্গেই নয়, বিদেশের অনেক শহরের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করতে পারি। এক্ষেত্রে আগের মতো অপারেটারের উপর নির্ভর করতেই হয় না। সত্যি কথা বলতে কি পোর্টব্লেয়ারের মতো সাগরপারের শহর বা লে, আইজলের মতো দুর্গম শহরের ক্ষেত্রে উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাই একমাত্র সম্ভবপর ও সুবিধাজনক যোগাযোগের উপায়। ১৯৭৫-৭৬ এ দেশে যে উপগ্রহ সহায়িত শিক্ষামূলক টেলিভিশন পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তার পিছনে একটি মার্কিন উপগ্রহের সহায়তা ছিল। কিন্তু ১৯৭৮-এ ভারত সরকার তার নিজস্ব বহু উদ্দেশ্যসাধক উপগ্রহ

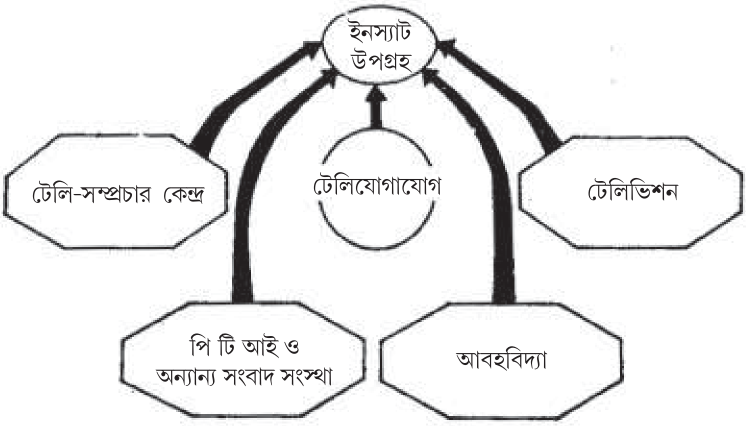

চিত্র ২৬.৩ : ইনস্যাট-১-এর সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগিতা।

নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঠিক হয়, এই ধরনের উপগ্রহ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হবে। এইরকম উপগ্রহ ইনস্যাট-1A ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এতে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি

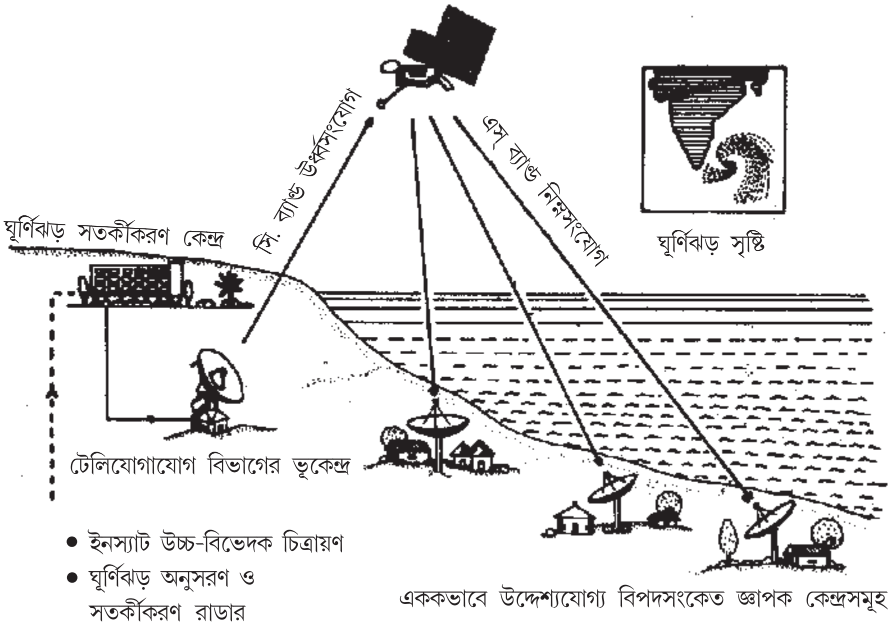

চিত্র ২৬.৪ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের সতর্কীকরণ ব্যবস্থা।

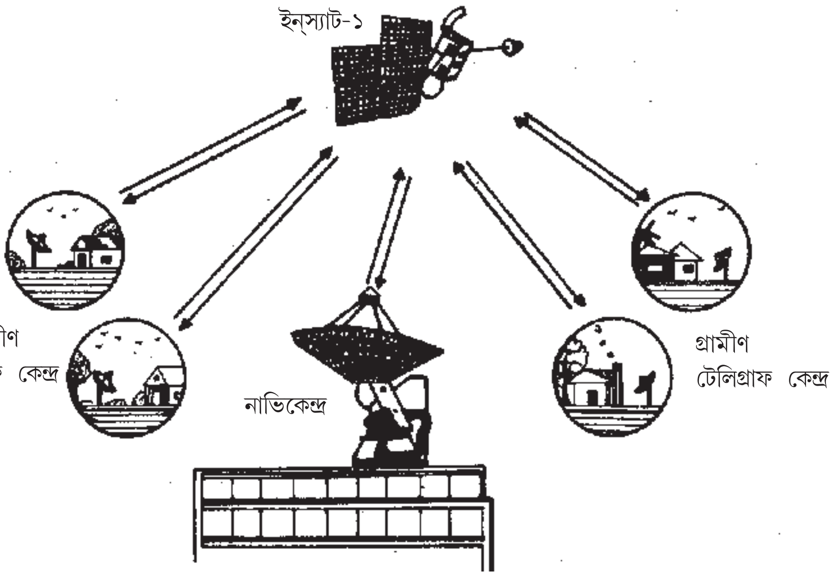

চিত্র ২৬.৪ : উপগ্রহ-ভিত্তিক গ্রামীণ টেলিগ্রাফ প্রচারজালিকা [Satellite Based Rural Telegraph Network বা SBRTN]

দেখা দেয়। এরপর ১৯৮৩-তে ইনস্যাট-1B এবং ১৯৮৮-তে ইনস্যাট-1C উৎক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলি উপগ্রহ এরকমভাবে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এই সমস্ত উপগ্রহগুলি আবহবিদ্যা, সম্পদ সমীক্ষা ও

গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমের সম্প্রচার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত করেছে। (চিত্র ২৬.৪, ২৬.৫)

কম্পিউটার

যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে কম্পিউটার। গণক যন্ত্র হিসেবে যে কম্পিউটারের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা 'ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক' নামে পরিচিত। এর ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে কম্পিউটার প্রায় যে-কোনো ধরনের এবং বিপুল পরিমাণের তথ্য নিয়ে তাকে ধরে রাখতে ও অসাধারণ দ্রুততায় বিশ্লেষণ করতে পারে। কম্পিউটারের খবরাখবর গ্রহণের, বর্জনের, তাকে সংক্ষিপ্ত বা বর্ধিত করার, গুছিয়ে রাখার এবং সূচীবদ্ধ করার ক্ষমতা তো আছেই। তা ছাড়া কম্পিউটার নিজস্ব বার্তাসহ জবাবও পাঠাতে পারে। বস্তুত যে কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহারের পুরো চিত্রটাই কম্পিউটার পালটে দিয়েছে। নতুন ধরনের নির্মাণ প্রযুক্তির জন্য কম্পিউটারের দাম নেমে এসেছে এবং তার ফলে এখন বিভিন্ন অফিস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমন কি বাড়িতেও কম্পিউটার জায়গা করে নিয়েছে।

বস্তুত টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে কম্পিউটার এবং উপগ্রহ ব্যবস্থা একত্রিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এই তিনটি একত্রে সম্প্রচার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা, ব্যাবসায়িক লেনদেন এমন কি মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকেও পাল্টে দিয়েছে।

ভবিষ্যতের যোগাযোগ প্রযুক্তি

গত দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের মতো দেশে প্রবর্তিত হলেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সব আধুনিক পরিসেবা ক্রমশ বিশ্বের অন্যত্রও লভ্য হয়ে উঠছে তা হল :

- কথার সঙ্গে ছবিও পৌঁছে যায় এমন ফোন, যার নাম ভিডিও ফোন।
- হোম কম্পিউটার, যার সাহায্যে ঘরে বসে বিভিন্ন দোকানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসের দরদাম ও জোগানের অবস্থা জেনে নিয়ে কেনাকাটার কাজ সেরে ফেলা যায়। তা ছাড়া টাকা পয়সার হস্তান্তর, শেয়ার কেনাবেচা, আবহাওয়ার সর্বশেষ সংবাদ, রেল ও বিমানের সময়সূচি, যানবাহনের খবর বা হোটেলে স্থান সংরক্ষণও এই ধরনের কম্পিউটারের সাহায্যে সহজেই করা যায়।

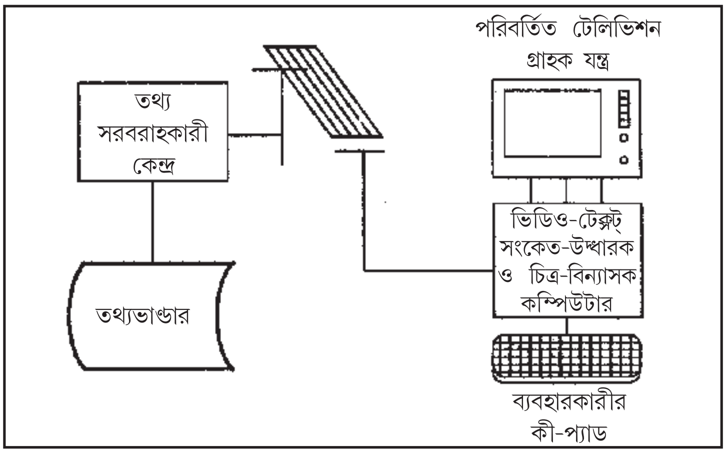

চিত্র ২৬.৬ : ভিডিওটেক্সট হচ্ছে একটি দ্বিমুখী ব্যবস্থা। ব্যবহারকারীরা টেলিফোনের কেব্‌ল্ বা কেব্‌ল্‌টিভির বা উভয়ের সাহায্য নিয়ে এই ব্যবস্থায় তথ্য পেতে পারেন। তাঁরা একটি হোম কম্পিউটারের মাধ্যমে জবাবও দিতে পারেন।

- টেলিটেক্স (Teletex) নামক ব্যবস্থা যার সাহায্যে অনেক গতিসম্পন্ন টেলেক্স পরিসেবা পাওয়া যাবে এবং পুরো বিষয়টিকে ছোটো ও বড়ো হাতের ইংরাজি হরফে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।
- ভিডিওটেক্সট নামের এক ব্যবস্থা যার সাহায্যে কিছুটা পরিবর্তিত টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র এবং টেলিফোন লাইনের সাহায্যে দুটি কম্পিউটারের দু'প্রান্ত থেকেই তথ্যের আদানপ্রদান করা বা উদ্ধার করা সম্ভব। (চিত্র ২৬.৬)।
- টেলিটেক্সট নামে পরিচিত একটি একমুখী ব্যবস্থা। এর সাহায্যে সীমিত পরিমাণ তথ্যাদি (কয়েক পাতা)

টেলিভিশন কেন্দ্রের সাহায্যে সম্প্রচার করা হয় এবং সাধারণ টেলিভিশন যন্ত্রে তা ধরা যায়। তবে এই টেলিভিশনের সঙ্গে একটি বাইরে থেকে লাগানো উপযোজক (Plug-in adaptor) প্রয়োজন (চিত্র ২৬.৭)।

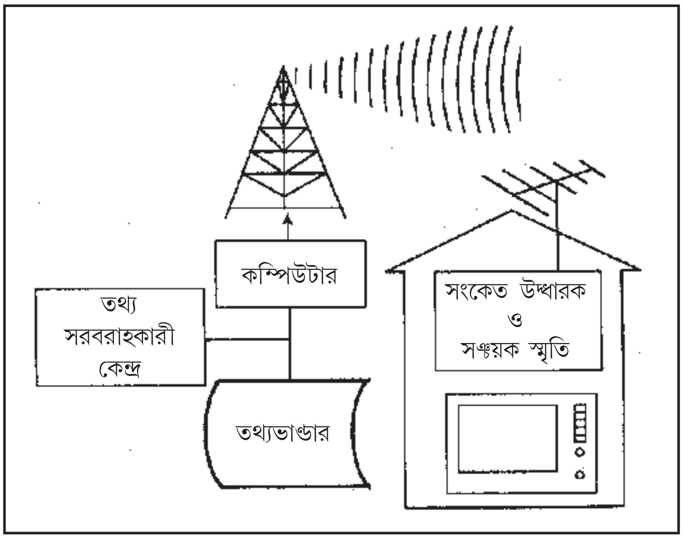

চিত্র ২৬.৭ : টেলিটেক্সট নামক পরিসেবাতে গ্রাহককে একটি উৎস থেকে টেলিভিশন সংকেতের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হয়। গ্রাহক তাঁর টেলিভিশান সেটে ওই তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।

- টেলিফ্যাক্স (Telefax) ব্যবস্থাটি ইলেকট্রনিক মেল নামে পরিচিত এবং এর সাহায্যে কোনো কাগজের লেখা বা ছবি অর্থাৎ কাগজে যা রয়েছে তার প্রতিরূপ একটি কম্পিউটার ব্যবস্থা থেকে অন্য আরেকটিতে, টেলিফোন লাইনের সাহায্যে পাঠানো সম্ভব।
- ডেটাফ্যাক্স (Datafax), যেটি হল উচ্চ গতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাধারণের ব্যবহার্য তথ্য প্রচার জালিকার মাধ্যমে তথ্য পাঠানোর পরিসেবা। এর মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে এবং এটি স্বয়ংক্রিয় ভাবেও কাজ করতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলির সবই উন্নয়নশীল দেশের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। ইতিমধ্যে এর অনেকগুলিই ব্যাপক বা সীমিত ভাবে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনুশীলনী ৪

১। এমন দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করুন যেখানে ইনস্যাট-1B আপনাকে তথ্য সরবরাহ করেছে যা আপনার পক্ষে অন্যভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

....

....

....

২। ভবিষ্যতের যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলির মধ্যে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কোনটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে এবং কেন?

....

....

....

....

২৬.৪ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

আমরা এখানে যে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছি যে সমাজ তা কাজে লাগাবে স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাজ এক ভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সম্পূর্ণ পরিবর্তিত জীবনধারা নিয়ে তা

হবে এক নতুন সমাজ। কেবল শিল্পে, প্রশাসনে, সরকারি বা সামাজিক পরিসেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকবে না, পারিবারিক জীবনও এর ফলে পরিবর্তিত হবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখনই সংবাদপত্র একযোগে বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ট্রেন বা বিমানের স্থান সংরক্ষণের কাজ চলেছে কম্পিউটারে, যেখানে এ সম্বন্ধে শেষতম তথ্য রক্ষিত থাকছে। এক দেশের চিকিৎসক অন্য দেশের রোগীর চিকিৎসা করছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, যে যার অফিসে বসেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিচ্ছেন—সন্দেহ নেই এগুলো সবই অসাধারণ উন্নতির নিদর্শন। আমরা তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছি, কীভাবে যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির দূর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে চাঁদের মাটিতে এক বিশেষ ধরনের যান নামিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উপায়ে চাঁদের মাটির নমুনা তুলে নেওয়ার পর সেটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। উন্নত দেশে সম্পূর্ণ কারখানা পর্যন্ত চলছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়, রোবটের সাহায্যে। সন্দেহ নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ এক বিপ্লব, কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে অত্যাধুনিক এই যোগাযোগ প্রযুক্তি সমানভাবে সব দেশের উপকারে লাগবে কিনা বা তা সমাজের সব অংশের কাছে সমানভাবে কাজে আসবে কিনা। এখনই এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে উন্নত দেশগুলি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে একাধিপত্য স্থাপন তো করেছেই তার ওপর তথ্য বিকৃতির এবং নিজেদের পছন্দমতো তথ্য-পরিবেশনার ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। তা ছাড়া একটি দেশের মধ্যে আবার যাদের তথ্য সংগ্রহের বেশি সুযোগ রয়েছে তারা অধিকতর লাভবান হতে পারেন এবং এর ফলে ধনী দরিদ্র ভেদটি বোধহয় আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এর একটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে, টেলিভিশন বা অন্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন আমাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা তৈরি করে এবং একটি মেকি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করে। অবশ্যই এর ফলে বড়ো সংস্থা ছোটো সংস্থাকে বাণিজ্যিক দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারে, কারণ ছোটো সংস্থা বিজ্ঞাপনে সমানতালে ব্যয় করতে পারে না।

আমাদের প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবও বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের পরম্পরা এবং সংস্কৃতির ওপর এই নব্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? আমাদের দেশে প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যেই কুসংস্কার বা অচল ধ্যানধারণা বা অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা দূর করার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু এগুলির সঙ্গে মানুষ পরিচিত তাই লক্ষ করা গেছে যে এগুলি যথেষ্ট কার্যকরী ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। যাঁরা এই প্রথাগত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন তাঁর যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কোন একটি বিষয় শিল্পসম্মত অথচ অতি পরিচিত ঢং-এ পরিবেশন করেন। মানুষকে প্রচ্ছন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে নাচ, গান বা নাটকের সাহায্যে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে বা কৃষিকাজ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি, অপুষ্টি নিবারণ বা পরিবার কল্যাণের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়েছে।

আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু কর্তব্য প্রথাগত মাধ্যমের যথোপযোগী ব্যবহার। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় লোককথা, পালাগান, গল্প বলা, এমনকি আমাদের পুরাকথা থেকে আসা কিছু বাগ্‌ধারাও। সামাজিক ব্যাধির নিরসনে বা উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রথাগত পদ্ধতির প্রতিটিই ব্যবহার করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা, তরজা, ঝুমুর, টুসু, গম্ভীরা প্রভৃতি লোকগীতি, অন্ধ্রপ্রদেশের বড়ো কথা, তামিলনাড়ুর ভিল্লুপাট্টু, মহারাষ্ট্রের তামাশা বা উত্তরপ্রদেশের আল্‌হা ও কাওয়ালির মতো প্রথাগত মাধ্যম এই কাজের খুবই উপযোগী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতীয় চেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যে এর কোনও কোনওটি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।

এই সমস্ত প্রথাগত পদ্ধতি কেবল কার্যকরীই নয়, সেগুলি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলির ওপর অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ঠিক কী ধরনের ছাপ ফেলেছে এবং তার তাৎপর্যই বা কী দাঁড়িয়েছে তা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অনুশীলনী ৫

জন বিনোদন ব্যতীত প্রথাগত মাধ্যমগুলির অন্য কোন্ ভূমিকা রয়েছে?

....

....

....

....

....

....

....

২৬.৫ নব্যবিশ্ব-তথ্য-যোগাযোগ ধারা (New World Information and Communication Order)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথ্যাদি যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যাদি পারস্পরিক বোঝা পড়া ও জ্ঞানের অংশীদারির সহায়ক হতে পারে। বিভিন্ন সমাজে বসবাসকারী মানুষের সমস্যাগুলির পারস্পরিক অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক। আর এই ভূমিকা পালনের জন্য তথ্যের প্রসার হওয়া চাই সুষম, বহুমুখী এবং বহু ক্ষেত্রীয়। অন্যভাবে বলা যায় যে রেডিয়ো, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই বা চলচ্চিত্রের মতো গণমাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশিত তথ্যাদি যেন সারা পৃথিবীতে অবাধে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে প্রবাহিত হতে পারে।

কিন্তু যদি মাত্র কয়েকটি আন্তর্জাতিক বা বহুজতিক সংস্থা তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রচারকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিংবা যদি বিশ্বের কয়েকটি ক্ষমতাশালী রেডিয়ো ও টেলিভিশন প্রচারজালিকা সংবাদ ও তথ্যের নির্বাচন ও সম্প্রচারের অধিকারী হয়, তাহলে স্বভাবতই তথ্যের প্রবাহ সুষম ও ন্যায়সংগত হয় না। ফলে যাঁরা প্রচারের ওই চ্যানেলগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন শুধু তাঁদের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

২৬.৫.১ প্রাচীন ধারা

বর্তমান অবস্থার দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। বর্তমান বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ সংবাদের উৎস কতকগুলি বড়ো বহুজাতিক সংবাদ-সংস্থা যেমন, রয়টার্স (Reuters), আসোসিয়েটেড প্রেস (AP), ইউনাইটেড প্রেস ইনটারন্যাশনাল (UPI), এবং এজেন্স-ফ্রান্স প্রেস (AFP)। ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের এই সংবাদ

সংস্থাগুলির খবরে উন্নয়নশীল দেশগুলি ২০ শতাংশের বেশি জায়গা পায় না, অথচ ওই দেশগুলিতে বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বাস। তার ওপর ব্রিটিশ, আমেরিকান বা ফরাসিদের চোখে কোন খবর যেভাবে প্রতিভাত হয় তারা সেভাবেই সেটি পরিবেশন করে। তথ্যের অন্যান্য উৎসেও ভারসাম্যের অভাব সমানভাবেই প্রকট। বেতার সম্প্রচার তরঙ্গের বণ্টনের ক্ষেত্রেও উন্নত দেশের তুলনায় কিছু উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা যথেষ্ট পীড়াদায়ক। ওই সম্প্রচার তরঙ্গের সম্পূর্ণ বর্ণালীর শতকরা ৯০ ভাগই রয়েছে উন্নত দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। তার ফলে যেসব দেশ বেতার সম্প্রচার ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত পরে কাজে নেমেছে তারা দেখছে যে, আগে আসা দেশগুলি সম্প্রচার তরঙ্গসীমার প্রায় সবটুকুই দখল করে বসে আছে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের এই দখলকারী আরেকভাবে প্রতিফলিত হয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশ নিজেরা টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি করার মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি। ফলে সেই সব দেশ বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যে তৈরি প্রচুর অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বাধ্য হয় অথচ এই অনুষ্ঠানগুলি তাদের সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে মেলে না। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও চিত্রটি একইরকম। এমনকি প্রচুর বাস্তব উপাদান ও মননশীলতায় সমৃদ্ধ কোন কোন দেশেও দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত অধিকাংশ বই এবং পত্রপত্রিকার ভাষা ইংরাজি। স্বভাবতই সেগুলি বাস্তব সম্পর্কে একটি বিশেষ ধরনের দৃষ্টিকোণ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে। যদি আপনি ভেবে থাকেন যে ভাষা পালটে কোনো ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করলেই সুবিধা হবে তবে আপনার আবার ভেবে দেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের প্রয়োজন তা হল আমাদের নিজস্ব সমস্যাদি, আমাদের সমাজ বা পরিবেশ নিয়ে উচ্চমানের চিন্তাভাবনা ও গবেষণা। তবেই আমাদের নিজস্ব ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক রচনা সম্ভব হবে।

২৬.৫.২ নব্য ধারা সম্পর্কিত ধ্যানধারণার উন্মেষ কীভাবে হল?

পাশ্চাত্য মাধ্যমের আধিপত্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তৃতীয় বিশ্বকে পাশ্চাত্য মাধ্যমে যেভাবে দেখানো হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অনুভূতি এই দুটিই 'নব্যবিশ্ব-তথ্য যোগাযোগধারা'র দাবির ভিত্তি রচনা করল।

এই নব্য ধারার আহ্বান সত্তরের দশক থেকেই গতি পায়। অবশ্য খুঁজলে এর উৎস পাওয়া যাবে 'তৃতীয় বিশ্ববাদ' এর সূত্রপাতের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রাচীন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে একধরনের সচেতনতা জাগ্রত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের বান্দুং সম্মেলনে বহু অংশগ্রহণকারী দেশ প্রথম একটি মঞ্চ থেকে কিছু পাশ্চাত্য বৃহৎ শক্তির তথ্য ও সংস্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। এই সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসে যে শক্তিশালী এবং ব্যাপক প্রসারক্ষমতা-সম্পন্ন পাশ্চাত্য মাধ্যম প্রচণ্ডভাবে উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের বিরোধী এবং তাদের আচরণ খুবই পক্ষপাতদুষ্ট। এই দেশগুলির কিছু হয়তো সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, আবার কিছু হয়তো ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। পাশ্চাত্য মাধ্যমের সংবাদ পরিবেশন যে এইসব দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নঞর্থক ও সহানুভূতিহীন মনোভাব প্রকাশ করে তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশ্চিমী মাধ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশিত হয়। এই সব মাধ্যম বিভিন্ন মাধ্যম-সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা এবং বৃহৎ শক্তিগুলির বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন এই উভয় লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হত।

> বান্দুং শহরটি ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত। এই সম্মেলনেই সহাবস্থানের পাঁচটি বিখ্যাত নীতি ঘোষিত হয়। 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত এই নীতিগুলির পিছনে ছিল পাঁচটি দেশের নেতাদের উদ্যোগ। এই নেতা এবং তাদের দেশগুলি হল নেহেরু (ভারত), সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া), চৌ এন লাই (চিন), নাসের (মিশর) এবং টিটো (যুগোস্লাভিয়া)।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হল। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে দ্রুত এবং সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সম্মেলনে বলা হল যে, দেশগুলি যদি পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং প্রচারের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে তাহলে তারা বিদেশি সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা পুরোপুরি দূর করতে, বা অন্তত কমাতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমি মাধ্যমগুলির আধিপত্যের বিরুধে তৃতীয় বিশ্বে যে গভীর ক্ষোভ জমা ছিল এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সেটাই কিছুটা নরমভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই সেই সময় পশ্চিমের শক্তি মাধ্যমগুলির নিয়ন্ত্রণকারীরা বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়নি।

কিন্তু জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি তাদের এই মতবাদে ক্রমশ আরও সরব হল। পারস্পরিক সহযোগিতার আরও সুস্পষ্ট ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটল। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি তাদের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য একটি সংস্থা গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন দিল্লিতে প্রথম জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির তথ্যমন্ত্রীদের এবং সেই সব দেশের সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনা ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণের এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সমেত সব ধরনের তথ্য ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কার্যকরী সহযোগিতার জন্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে তথ্যাদির একচেটিয়া আধিপত্যের যে যোগসূত্র বিদ্যমান, এই প্রথমবার তা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নেওয়া হল। সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে সুরক্ষিত রাখতে এক নতুন আন্তর্জাতিক তথ্যাদির ধারা গড়ে তোলার দাবিও উপস্থাপিত হয়। পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলম্বোতে এবং সেখানে নতুন দিল্লির সম্মেলনের সুপারিশগুলি গৃহীত হয়। এই সম্মেলন সমস্ত জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির উদ্দেশ্যে ওই বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের কাজকর্ম সংগঠিত করার আহ্বান জানায়।

নব্যবিশ্বে-তথ্যযোগাযোগধারার রূপরেখা নির্ণয়ের ব্যাপারে ইউনেস্কোর (UNESCO) ভূমিকা ও প্রয়াস এই প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। ১৯৭৬-এ নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ঊনবিংশতিতম সাধারণ সভায় তার মহানির্দেশককে বলা হল "প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে এবং সেগুলির বিশালত্ব ও জটিলতাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সমসাময়িক সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাগুলি পরীক্ষা করে দেখা হোক।" ১৯৭৭-এ মহানির্দেশক শ্রীআমদ্-মাহ্তার এম' বো একটি মস্তিষ্ক নিধি (brain-trust) স্থাপন করলেন। এটি হল 'যোগ-সমস্যা পর্যালোচনার জন্য-আন্তর্জাতিক কমিশন' (International Commission for the Study of Communication Problems)। এর সভাপতি হলেন শ্রীসিয়ান ম্যাকব্রাইড (Sean MacBride)। পরবর্তীকালে ওই কমিশনের রিপোর্ট, যা ম্যাকব্রাইড রিপোর্ট নামে পরিচিত, ১৯৮০-তে ইউনেস্কোর মহানির্দেশকের কাছে পাঠানো হয়। অবশ্য তার আগে ১৯৭৮-এ একটি অন্তবর্তী রিপোর্ট ইউনেস্কোর বিংশতিতম সাধারণ সভায় পেশ করা হয়েছিল। এই অন্তবর্তী রিপোর্ট কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু যে কারণে ইউনেস্কো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হল ১৯৭৮-এর গণমাধ্যম বিষয়ক ঘোষণা—"শান্তির সুপ্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমের অবদানের মূল নীতি ঃ মানবাধিকারের বিকাশ; বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিরোধ ও যুদ্ধের প্ররোচনার বিরোধিতা।"

এই ঘোষণার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল "নতুন এক সাম্যাবস্থা এবং উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানে আরও বেশি উভতোমুখী ধারার প্রতিষ্ঠা প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি এবং উন্নতিশীল দেশগুলির রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে। এই উদ্দেশ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে তথ্য প্রেরণ, সেগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং এই দেশগুলির মধ্যে তথ্যের বিনিময়ে অসাম্যগুলির সংশোধন প্রয়োজন। এজন্য এই সব দেশের গণমাধ্যমগুলির এমন অবস্থা ও সম্পদ প্রয়োজন যাতে সেগুলি শক্তিশালী ও প্রসারিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলির গণমাধ্যমের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

আরেকটি গৃহীত সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং কিছু পশ্চিমি দেশ এই বিষয়ে জোরালো আপত্তি প্রকাশ করেছিল। তবে ১৯৮০-তে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ম্যাকব্রাইড কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদিত হয়। নব্য-বিশ্ব-তথ্যযোগাযোগধারা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি দীর্ঘ একটি কঠিন আলোচনার পর গৃহীত হয়। এর মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার কয়েকটি হল :

- তথ্য প্রবাহে ভারসাম্যের অভাব দূরীকরণ,
- একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষতিকর প্রভাবের দূরীকরণ,
- তথ্যপ্রবাহের ধারাকে মুক্ত ও ব্যাপকতর করার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বাধার অপসারণ,
- সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব,
- নিজস্ব পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি।

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য এবং বিশ্বের অধিবাসীর স্বপরিচয় বজায় বাধার দিকটিও উল্লেখ করা হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন মাধ্যমে কর্মরত পেশাদারদের স্বাধীনতার বিষয়টি যেমন তুলে ধরা হয়েছিলষ তেমনই সেখানে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অনুশীলনী ৬

নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারার দাবির পিছনে দুটি যুক্তি দেখান।

....

....

....

....

....

২৬.৫.৩ নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক

নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারার যে সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে পশ্চিমের কিছু দেশ আপত্তি তুলেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। তাঁরা ওই সিদ্ধান্তটি যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল যে ওই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে সাংবাদিকদের কাজকর্মে বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এর ফলে তথ্যের প্রচলিত "মুক্ত গতি" ব্যাহত হবে এবং তথ্য ও সংবাদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৈধতা পাবে। কট্টরপন্থীদের মতে এটি "অবাধ তথ্য লাভের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ।"

স্বভাবতই এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতে নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগের এই ধারা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমি মাধ্যমগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য ও শান্তি, ঠান্ডা লড়াই, জাতিগত পক্ষপাত ও প্রচার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলির সাফল্যের দিকে না তাকিয়ে এবং সেখানকার মানুষের অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে ওই দেশের ঘটনাবলি যেমন বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার বিষয়ে কদর্থক ও বিদ্বেষপূর্ণ চিত্র তুলে ধরছে।

> ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সময় নামেডিয়ার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী গান্ধি। এই সংস্থাটি ভারতসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগের সমস্যাবলি নিয়ে কাজকর্ম করে। এই সংস্থা বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং যোগাযোগের সমস্যা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা চালিয়েছে।

নতুন তথ্যযোগাযোগধারা এগুলি বন্ধ করতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩-তে অনুষ্ঠিত নামেডিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ভাষণের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছিলেন "পশ্চিমের মাধ্যম, এমনকি আমাদের নিজেদের সংবাদমাধ্যমেও দুর্যোগ বা গোলযোগের খবর ছাড়া উন্নয়নশীল দেশের আর কোনো খবর থাকে না। উন্নয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞ, আমাদের গ্রাম ও শহরে বা মহিলাদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা যেন কিছুই নয়। সম্পাদক ও মাধ্যমগুলির পরিচালকেরা সম্ভবত নর্থক্লিফ সূত্র অনুসরণ করেন, যে সূত্র অনুযায়ী শুধু ক্ষমতা, পদ, অর্থ বা যৌনতাই খবরের উপজীব্য হয়ে উঠতে পারে, সততা, স্বাভাবিক পরিস্থিতি, কঠোর শ্রম বা সুবিনীত আচরণ খবরে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। শান্ত ও ভীরু প্রকৃতির মানুষ হয়ত একদিন পৃথিবীর ভার পেতে আর কিন্তু সংবাদপত্রের শিরোনাম তাদের জুটবে না।"

নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগধারা নিয়ে বিতর্ক এতটাই জোরালো হয়ে উঠল যে ১৯৮৪-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যখন ইউনেস্কো ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা যে তিনটি কারণ দেখিয়েছিল তার মধ্যে এটিও ছিল। এই ধারার উত্থাপন ও প্রবর্তনের জন্য তারা ইউনেস্কোকে দায়ি করেছিল। একই কারণে, এক বছর বাদে গ্রেট ব্রিটেনও ইউনেস্কোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের সদস্যপদ প্রত্যাহারের ফলে ইউনেস্কো তার ব্যয়ানুমোদনের ৩০ শতাংশেরও বেশি অর্থ হারিয়েছে। কিন্তু এসব থেকে বোঝা যায় সামাজিক পরিবর্তন বা প্রগতির জন্য তথ্যাদি কত শক্তিশালী হাতিয়ার।

নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারার রূপায়ণ অবশ্য অত্যন্ত ধীরগতিতে চলেছে। ইউনেস্কোর সাহায্য করার ক্ষমতাও অনেকখানি কমে গিয়েছে। অন্যান্য পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির কয়েকটি ওই ধারার বিরোধিতার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি কিছুটা উন্নত হয়েছে। পশ্চিমি মাধ্যমের একটি অংশ তাদের সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের তীব্র ক্ষোভ অনুধাবন করতে পেরেছে। এর মধ্যে দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে।

২৬.৫.৪ আমাদের জাতীয় পটভূমিকায় নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগ ধারার প্রাসঙ্গিকতা

সারা বিশ্বে তথ্যের প্রবাহ বা বণ্টনে ভারসাম্যের অভাব দূরীকরণ যদি নব্য ধারার মূল লক্ষ্য হয় তবে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরীক্ষা করে তার উন্নয়নের চেষ্টাও করা উচিত। ভারতবর্ষে যে অবস্থা রয়েছে তা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ এবং এ ধরনের অন্য দেশগুলিতে কমবেশি মাত্রায় একই অবস্থা দেখা যায়। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার

৫২ শতাংশ থেকে অনেক কম। তা সত্ত্বেও মাধ্যমগুলির ঝোঁক শহরাঞ্চলের মানুষের দিকেই বেশি। এখন হয়ত রেডিয়ো সেটের সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশি। কিন্তু এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশই শহরাঞ্চলে। টেলিভিশন সেটের বণ্টনে এর থেকেও বেশি ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে। এ ছাড়া রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের একটা বড়ো অংশই শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সংবাদপত্রের প্রচার এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রেক্ষাগৃহের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্ত লক্ষ করা যাবে। সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্র মূলত শহরবাসীদের চাহিদার দিকেই দৃষ্টি রাখে।

এই ভারসাম্যহীনতা দূর করে সব মানুষের জন্য মাধ্যমগুলির সুষম বন্টন সৃষ্টি করার জন্য একটি নতুন যোগাযোগ নীতি তৈরি করা প্রয়োজন। এই নীতির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে সমাজের সমস্ত অংশ বিশেষত কম সুযোগ সুবিধার অধিকারী অংশগুলির চাহিদা মেটাতে হবে। উচ্চমানের শিল্প চেতনা বজায় রেখে শিক্ষামূলক তথা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই সব মানুষের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁদের সামনে তুলে ধরতে হবে। অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত ধ্যানধারণা দূর করার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মানুষের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে কর্মযজ্ঞে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করার মতো অনুষ্ঠানকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের মতো জাতীয় লক্ষ্যগুলি নানারূপে প্রতিনিয়ত উপস্থাপিত করতে হবে। তবে তা সোজাসুজি বা অমার্জিত হলে চলবে না; তা হতে হবে প্রচ্ছন্ন এবং শিল্প সুষমামণ্ডিত যে পদ্ধতি লেখক ও শিল্পীরা আয়ত্ত করেছেন। এভাবে আমাদের নিজস্ব যোগাযোগের ধারা ভারতবর্ষের নবজাগরণে এক বিরাট অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

২৬.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা যা করেছি তা হল :

- গণসংযোগের সংজ্ঞা দিয়ে গণসংযোগের বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা করেছি।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কী ভূমিকা পালন করেছে তা বর্ণনা করেছি। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা যেন কেবল নগরাঞ্চলের স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং ধনী-দরিদ্র, গ্রাম্য ও শহুরে জীবনের মধ্যে পার্থক্য না বাড়ায় সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীকস্বরূপ প্রথাগত যেসব যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে প্রযুক্তি যেন সেগুলি নষ্ট না করে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।
- উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের মধ্যে সুষম ও ভারসাম্যযুক্ত তথ্যপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নব্যবিশ্ব-তথ্যযোগাযোগধারা গড়ে তুলবার দাবি এসেছে। এই নব্যধারা কীভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে সক্ষম তাও আলোচনা করা হয়েছে।

২৬.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কীভাবে ব্যক্তিবিশেষের এবং সামাজিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করে?

....

....

....

....

২। আপনার মতে, আমাদের দেশে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির দায়িত্ব ও অধিকারগুলি কী কী?

....

....

....

....

৩। সুষম ও ভারসাম্যবিশিষ্ট তথ্যপ্রবাহ কেন গুরুত্বপূর্ণ? সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাচীন ধারাটি উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কেন?

....

....

....

....

২৬.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। (১) ব, (২) ব, (৩) গ, (৪) গ

২। যেমন ধরুন, আপনি যদি সংবাদপত্রকে গণসংযোগের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেন তাহলে সুবিধা হচ্ছে যে তা বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়। সচরাচর এখানে যেসব তথ্যসংবাদ থাকে তা সরকার-নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বেশি। তবে অসুবিধা এখানেই, যে এই মাধ্যম কেবলমাত্র সাক্ষর মানুষের উপযোগী এবং দুর্গম বা দূর অঞ্চলে তা পৌঁছায় না। তাই এর প্রচার অন্য কিছু মাধ্যমের মতো ব্যাপক নয়।

৩। (ক) যোগাযোগের মাধ্যমটি সমাজের সমস্ত গোষ্ঠী এবং শ্রেণির কাছে পৌঁছানোর উপযোগী হওয়া চাই।

(খ) জিনিসটি স্বল্পমূল্যের হওয়া চাই, যাতে তা সকলের নাগালের মধ্যে থাকে, যেমন রেডিয়ো।

৪। (ক) (১) যেমন কোনো ঘটনার বা অনুষ্ঠানের টেলিভিশনের সাহায্যে তৎকালীন (Live) সম্প্রচার।

(২) অপারেটারের সাহায্য ছাড়া দূরবর্তী অঞ্চলে টেলিফোনের সাহায্যে যোগাযোগ।

(৩) দুর্যোগ-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা।

(খ) আমার মতে হোম কম্পিউটার কিংবা টেলিফ্যাক্স খুবই উপযোগী। তবে এবিষয়ে আপনার ভিন্নমত থাকতেই পারে।

৫। আপনি এই কাজগুলোর বিষয়ে ভাবতে পারেন, যেমন সামাজিক জাগরণ, সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচার, বয়স্ক শিক্ষা।

৬। পশ্চিমি মাধ্যমে আধিপত্য এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে পশ্চিমের মাধ্যমে যেভাবে তুলে ধরা হয় তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর

১। **উত্তরের ইঙ্গিত :** কোনো ব্যক্তি তাঁর অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার লভ্যতার বিষয়ে তুলনায় অধিক ওয়াকিবহাল, যেমন 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' চাকরির সুযোগ বিষয়ক খবর ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। রেডিয়ো, টেলিভিশানে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞাপন গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে। এর মধ্যে দিয়ে এমন সব চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে যে তাদের ঘরোয়া অর্থনীতির পক্ষে তা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

২। **উত্তরের ইঙ্গিত :** নতুন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টিতে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবাধ ও পক্ষপাতহীন তথ্যের প্রবাহ বিশেষ সহায়ক হয়।

৩। ২৬.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

পাঠ উপকরণ

এফ. এস. টি.-১

পর্যায়-৭ ও ৮

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.-১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
৭

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন

একক ২৭	শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৯৩-২০৭
একক ২৮	প্রযুক্তি ও আর্থিক উন্নয়ন	২০৮-২২৬
একক ২৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—প্রথম ভাগ	২২৭-২৪৯
একক ৩০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—দ্বিতীয় ভাগ	২৫০-২৭৫

একক ২৭ □ শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

গঠন

২৭.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২৭.২ ভারতবর্ষের পটভূমিকা
২৭.৩ শিল্পে প্রযুক্তি
২৭.৪ অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্বনির্ভরতা
২৭.৫ শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
২৭.৬ সারাংশ
২৭.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২৭.৮ উত্তরমালা

২৭.১ প্রস্তাবনা

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে স্মরণাতীত কাল থেকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়নি। বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব অন্যান্য দেশেও শিল্পবিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের উন্নয়নে আকৃষ্ট হয়ে বাকি সব দেশেও শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়। ব্যাপক বিজ্ঞানচর্চা এবং দেশের প্রয়োজনে এর প্রয়োগই হল আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘটনা। একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এসে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলেই সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুখ সমৃদ্ধি তথা সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাব বিজ্ঞান ও শিল্প একে অন্যের ওপর কতটা নির্ভরশীল। আমরা আরও দেখব এই দুয়ে মিলে কিভাবে সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই অনুচ্ছেদটি পড়ার পর আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে সমর্থ হবেন।

- বর্তমান ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবস্থা।
- উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রযুক্তির ভূমিকা।
- দেশীয় শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির আধুনিকীকরণ।
- জাতীয় সমৃদ্ধি এবং শিল্প প্রসার ঘটাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যসূচীর প্রয়োজনীয়তা।
- জাতীয় উন্নতি সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সম্যক পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে এই ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশ করা।

২৭.২ ভারতবর্ষের পটভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ, তার ব্যবস্থা, দূরভাষ, বেতারযন্ত্র, দূরদর্শন কিছুই ছিল না। চিকিৎসা তথা শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মানুষের আয়ুষ্কাল ৫০/৬০ বৎসরের বেশি বাড়ানোর পক্ষে উপযোগী উন্নতিসাধন হয় নি। সেই সময়কার জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এনেছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার উন্নতির সাহায্যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং অসংখ্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনই এটাকে সম্ভব করে তুলেছে। ১৯৫৮ সালে সরকারি বিজ্ঞান বিষয়ক নীতিতে বলা হয়েছে যে সকলের জীবনযাত্রার মানকে একটা যথোপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর বিরাট উৎপাদনের ফলেই সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবা গেছে, যে রাষ্ট্রে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ভোগ্য সামগ্রীকে সকলের উপকারে লাগানো সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সংবিধান সমাজতন্ত্রের কথা বলে। তাহলে থাকতে হয় ন্যায্য বণ্টন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়া আমরা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সমর্থ হব না। যেমন, একজন কৃষকের পক্ষে বলদ চালিত লাঙলে যতটা জমি চাষ করা সম্ভব, যন্ত্রচালিত হালে তার চেয়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যায়। যন্ত্রের ব্যবহার এইভাবে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

দেশজ সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির একটা দিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ব্যতীত আমাদের নদী সমূহে প্রবাহিত জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। স্থলভূমি বা সমুদ্রের তলায় অবস্থিত বিশাল তৈল ভাণ্ডার থেকে তৈল উৎপাদনও সম্ভব হত না। এমনকি অরণ্য সম্পদ আহরণ করে তা থেকে কাগজ তৈরি করে পুস্তক বা সংবাদপত্রও ছাপাতে পারতাম না। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার থেকে আহরণের চাবিকাঠিই হল বিজ্ঞান।

আমরা যখন বিজ্ঞানচর্চা করি তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জীবন ধারণের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে আবার এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই আমাদের সাহায্য করে। কেবলমাত্র পথ দেখানোই কিন্তু যথেষ্ট নয়, সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য হাতে কলমে কাজ করাও দরকার এবং সেখানেও বিজ্ঞান আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। বিদ্যুৎশক্তি এবং কাজ করবার যন্ত্রপাতির আবিষ্কার বিজ্ঞানেরই দান। যন্ত্রপাতি নানা ধরনের। কেবলমাত্র পেশিশক্তি লাগে এমন কাজের জন্য যন্ত্র, দক্ষতা লাগে এমন নিপুণ কাজের জন্য আর বর্তমান যুগে তো বুদ্ধিবৃত্তির কাজেও লাগছে এমন যন্ত্রও রয়েছে (চিত্র ২৭.১), এইসব যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কখনই উৎপাদন হার বাড়ানো যাবে না এবং দেশের পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানকার

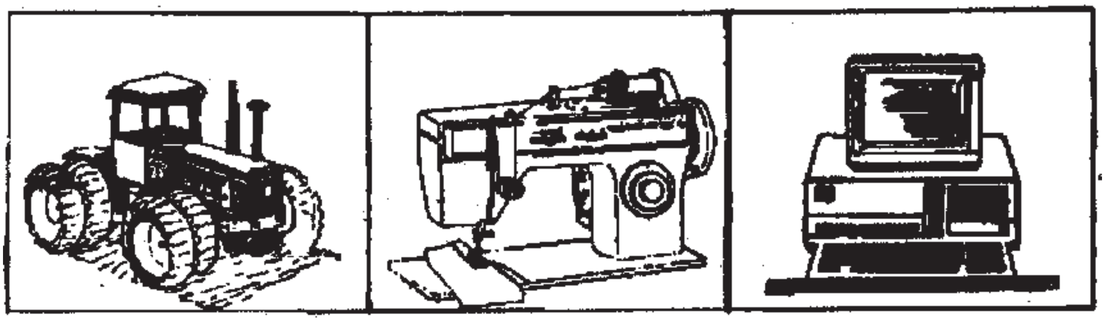

(a) (b) (c)

চিত্র ২৭.১ : কাজ করার যন্ত্র : (ক) পেশি শক্তি চালিত (খ) দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত (গ) মস্তিষ্ক চালিত

কেউ নিজের জন্য দৈনিক ১৫০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য সংস্থান করতে না পারলে তিনি দারিদ্রসীমার নীচে আছেন বলা হয়। ৪০% সংখ্যাকে অনেকে বেশি বলে মনে করেন, তাঁদের মতে সংখ্যাটি ৩৬%-এ নেমে এসেছে।

শতকরা ৪০ ভাগ লোকই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। জনগণের এই দারিদ্র্যের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী বলে মনে করা হয়—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার, যদিও অধুনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

(২) কৃষি এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ২/৩ ভাগই নিরক্ষর, ফলে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা খুবই সীমাবদ্ধ, যা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়।

(৩) যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোকই কৃষিনির্ভর সেখানে জমিতে অধিক ফসল ফলানো বা শস্যরক্ষার ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

(৪) কৃষিকার্যে নিয়োজিত মানুষের অর্থের অভাব এবং জোতের ক্ষুদ্রতা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অসম্ভব করে তোলে।

(৫) সব শিল্পেই, বিশেষত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পে, আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য পুঁজি বিনিয়োগের অনীহা। এর বড় দৃষ্টান্ত পাটশিল্প যা আজ চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

(৬) ১৯৫৮ সালে একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক নীতি গৃহীত হয়, কিন্তু বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক বাধার দরুন শিল্প সংক্রান্ত নীতির সঠিক প্রয়োগ হয় নি।

এ ছাড়াও যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে আমাদের অনেক পণ্যেরই উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি, যেমন ইস্পাত শিল্প। এর কারণ অবশ্য আমাদের শিল্পে দক্ষতার অভাব এবং পরিচালনগত ত্রুটি। জাপান এবং অন্য কয়েকটি দেশ ভারতবর্ষ থেকে আকরিক লোহা আমদানি করে, অথচ শ্রমিক বাবদ খরচ অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের উন্নত দক্ষতার উৎপাদন ব্যবস্থার একক প্রতি উৎপাদন খরচ আমাদের থেকে অনেক কম। আর একটা আশ্চর্যের বিষয় লক্ষণীয়। আজ থেকে ৩০ বৎসর পূর্বে আমরা মিশ্র ইস্পাত (এ্যালয় স্টিল) তৈরি করার জন্য কারিগরি কৌশল আমদানি করেছি। কিন্তু মিশ্র ইস্পাত উৎপাদনে আধুনিক অগ্রগতির সাথে দেশজ প্রচেষ্টা তাল রাখতে না পারায় এখনও আমাদের উন্নত দেশ থেকে বিশেষ ধরনের ইস্পাত আমদানি করতে হয়।

এই পর্যায়ে যে সব আলোচনা করা হল সেগুলি ঠিকভাবে বুঝে থাকলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবেন।

অনুশীলনী ১

উন্নত রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় আমরা জেনেছি। নীচের কোন কোন রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্র বলব? সঠিক জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। ☐

খ) যে দেশের জনপ্রতি আয় অধিক। ☐

গ) যে দেশে উন্নত স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প আছে। ☐

ঘ) যে দেশে জনপ্রতি উৎপাদনশীলতা খুব বেশি। ☐

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং তাকে কাজে লাগানোর মধ্যবর্তী সময়

আমরা যদি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একে শিল্প প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যবহার করার ব্যাপারে বর্তমান অবস্থাটা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তাকে কার্যে প্রয়োগের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান উন্নত দেশগুলিতে অনেক কম। এর কারণ হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নতির জন্য সেইসব দেশগুলির গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। অবশ্য এটা মানতে হয় যে বিভিন্ন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই সময়ের ব্যবধান উন্নত দেশগুলিতেও বেশি-কম হয়। কখনও এটি খুব বেশি, কখনও খুব কম। যেমন—প্রথম বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া গেছে ১৮২৫ সালে, যদিও বৃহৎ হারে এর উৎপাদন শুরু হয়েছে ১৮৮৬ সালে। আবার বনস্পতি উৎপাদনের জন্য তেলের সংপৃক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯০৫ সালে আর ১৯১১ সালের মধ্যেই আমেরিকার 'প্রোক্টর ও গ্যাম্ব্ল' কোম্পানি বনস্পতির মতো হাইড্রোজেনযুক্ত কার্পাস বীজ তেল বাজারে ছাড়ে। কাজেই এক্ষেত্রে মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই এর প্রয়োগ ঘটল।

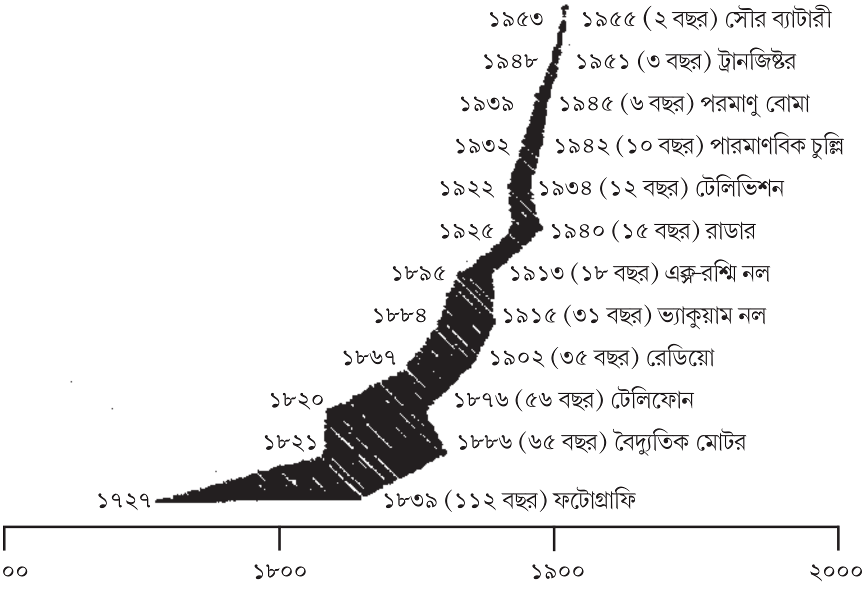

চিত্র ২৭.২ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর তার প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়। (এলী গিন্‌জ্‌বার্গ; "প্রযুক্তি আর সামাজিক পরিবর্তন", কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৪ অনুসরণে)

যে সব ক্ষেত্রে এই সময়ের ব্যবধান সবচেয়ে কম, কম্পিউটার বিজ্ঞান তার অন্যতম। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ পরিস্থিতির প্রয়োজন ও পরিস্থিতি কতটা বাধ্য করছে তারই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটাও সত্যি যে, বিষয়টা অনেকখানিই নির্ভর করে দেশে শিল্পোন্নতির পরিবেশ এবং ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তার ওপর। ভারতবর্ষে আমরা বলতে পারি যে, কিছু অত্যাধুনিক ক্ষেত্র যেমন পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরমাণু শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের প্রয়োগ করতে সময় লেগেছে খুব কম। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং একটিমাত্র সংস্থাকে পরিপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার ফলেই এটি সম্ভব হতে পেরেছে। অন্যদিকে, কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নত

দেশগুলির একটি অথচ ভারতে ৭০ শতাংশ লোক কৃষি নির্ভর এবং আমাদের প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত (অর্থাৎ কৃষিজাত, খনিজাত) দ্রব্যগুলিই বিদেশি মুদ্রার এক বিরাট অংশ দেশে নিয়ে আসে।

অনুশীলনী ২

আমরা কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছি? (আপনার উত্তর ৪-৫ টি বাক্যের মধ্যে কারণসহ লিখুন)

২৭.৩ শিল্পে প্রযুক্তি

প্রযুক্তির একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো যা নির্ভর করে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক লোকবলের উপস্থিতির ওপর। এর পরবর্তী পাঠে আমরা দেখতে পাব বিদেশি প্রযুক্তি ক্রয় করা বা দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারটা কত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি ক্রয় করে তাকে নিজের দেশে উৎপাদনের কাজে লাগানো আপাতদৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও আদপে যে ব্যাপারটা তা নয় সেটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যে দেশ থেকে প্রযুক্তি কেনা হচ্ছে তারা এমন কাঁচামাল ব্যবহার করছে যা আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। ফলে বিকল্প কোন কাঁচামাল ব্যবহার করা অথবা পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে অতি পরিচিত রান্নার ভোজ্য তেল বনস্পতি ৯৫ শতাংশ বাদাম তেল আর ৫ শতাংশ তিল তেলে উৎসেচকের সাহায্যে হাইড্রোজেন যোজন করে তৈরি হত। ত্রিশ বছর আগেও বাদাম তেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু গত প্রায় এক দশক ধরে সরবরাহ কমে যাওয়ায় এবং চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় বনস্পতি উৎপাদনকারীরা অন্য তেল ব্যবহার করতে শুরু করল, যার অনেকটাই বিদেশ থেকে আনতে হয়। আমরা জানি যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা এবং মালয়েশিয়া থেকে আমদানিকৃত সয়াবিন তেল, কানাডার রেপসিড তেল (ক্যানোলা) এবং পাম তেলই বর্তমানে বনস্পতি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল, ফলে সরকারি নিয়মানুসারে এর চেহারা ও গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের (R & D) বিজ্ঞানীদের সাহায্যের প্রয়োজন হল।

একইভাবে একদা সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরির প্রধান উপাদান জান্তব চর্বি, 'ট্যালো'-র ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একই মানের সাবান তৈরি করতে অন্য তেলের সাহায্য নিয়ে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হল, যেমন—আমদের শিল্পে ব্যবহৃত ক্যাস্টর তেল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্টিয়ারিন আর ট্যালো'র বিকল্প তৈরি হল। অন্যান্য শিল্পেও অনেক এইরকম উদাহরণ আছে। আবার কখনও কখনও বিদেশ থেকে আনা প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা বিভাগগুলি চালানো বা বজায় রাখার যথেষ্ট গুরুত্ব দেখা গেছে।

আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও বেশি লোক নিয়ে আসার চেষ্টা চলে আসছে এবং এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগ খোলা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৩০০ বা তারও বেশি এরকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে স্বাধীনতার পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ২১।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব বিভাগ খোলা ছাড়াও উন্নত দেশগুলি যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও জার্মানির সহায়তায় শুধু এই উদ্দেশ্যেই পাঁচটি আই. আই. টি. খোলা হয়েছে খড়্গপুর, কানপুর, মুম্বাই, চেন্নাই আর দিল্লিতে। স্বাধীনতার আগে থেকেই অবশ্য কলকাতা, মুম্বাই আর চেন্নাইয়ের তিনটি সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (IISC) জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল (যা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শিবপুর বি. ই. কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিও অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিল্প এখনও বহুল পরিমাণে বিদেশি প্রযুক্তির ওপরই নির্ভরশীল। এখন শিল্পগুলি অনেকক্ষেত্রে 'চাবি ঘোরানো' প্রযুক্তি পছন্দ করছে অর্থাৎ যেখানে প্রযুক্তি তথা যন্ত্রপাতি বসিয়ে কেবলমাত্র একটি চাবি ঘুরিয়ে বা একটি বোতাম টিপেই উৎপাদন শুরু করা যেতে পারে। শিল্প বিকাশের এই গতিপ্রকৃতির ফলে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী তথা প্রযুক্তিবিদগণের কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে, এঁদের চলে যেতে হচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে (ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি) শুধুই কাজের জন্য। এজন্যই মস্তিষ্ক নির্গমন বা ব্রেন ড্রন হয়ে যাচ্ছে এবং এঁদের পেছনে খরচ করা কোটি কোটি টাকার তো অপচয় হচ্ছেই উপরন্তু অতি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিজানা মানুষও হারাচ্ছি।

ক্ষুদ্র শিল্পে প্রযুক্তি

অনেকে অজ্ঞাতবশত মনে করে থাকেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্পেই প্রয়োজন কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা ৬ লক্ষের বেশি তাই এইসব গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না। এরা আমাদের দেশের জনসংখ্যার সেই বিরাট অংশকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে, যাঁরা এখনও কৃষিক্ষেত্রে পুরানো পদ্ধতিই প্রয়োগ করে থাকেন। কারুশিল্প এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সমান গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাক্টর, যন্ত্রচালিত হলকর্ষক, ফসল কাটার যন্ত্রের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রও এখন আধুনিক হয়ে উঠেছে, তবে এইসব প্রচেষ্টা খুব ফলদায়ী হচ্ছে না গ্রামের শিক্ষা ও আর্থিক ব্যাপারে নানা বাধা, জোতের মাপ এবং সামাজিক কাঠামোর জন্য। উন্নত প্রযুক্তি, পুঁজি বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি অনেক লোকেরই কাজের সুযোগ কমিয়ে দেয়। ফলে আমরা এখন একটা দ্বৈত সংকটের মধ্যে আছি। একদিকে যেমন আমাদের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যক কর্মহীন লোকেদের জন্য কর্মসংস্থান করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক যন্ত্রচালিত ও স্বয়ংক্রিয় শিল্পে কম কর্মী কাজে লাগবে। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করা যায়। এর একটা রাস্তা অবশ্যই ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প তথা গ্রামজ শিল্প স্থাপন। বৃহৎ শিল্পের কাঁচামাল ও মাঝামাঝি স্তরের মালমশলা জোগানের জন্য এদের ব্যবহার করা যেতে পারবে।

বিদ্যুৎশক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স-এর ব্যবহার ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে উন্নত মানের উৎপাদনে সাহায্য করেছে, জাপানে এটি পরীক্ষিত। আসলে গ্রামীণ শিল্পে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নয়ন করা ও উৎপন্ন দ্রব্যকে বৃহৎ শিল্পে জোগানের মাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভারতে কিছু পরিমাণে এটি করা হয়েছে পাঞ্জাব-হরিয়ানার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং আংশিকভাবে অন্য কয়েকটি রাজ্যে। উৎপাদনশীলতার উন্নতি সাধনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এজন্য দক্ষ কর্মীরাও প্রয়োজন থাকবে। কিন্তু এঁদের একটা অংশকে গ্রামীণ শিল্পের উপযুক্ত ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি তৈরি, সেগুলি চালানোর উপযোগী ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার এবং গ্রামীণ শিল্পে কর্মী প্রশিক্ষণ দেবার কাজেও লাগানো যেতে পারে।

এইসব শিল্পে এমনকি বৃহৎ শিল্পেও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটা আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব পায়না। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সাবধান হতে হবে। আমাদের উন্নত এবং দক্ষ কর্মী তৈরি করার পরিকাঠামো আছে আই.টি.আই., পলিটেকনিক ও বিভিন্ন শিল্পের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে। এগুলিকে আরও মজবুত করা প্রয়োজন এবং যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এদের দিশারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

পুঁজি বা মূলধনের অপ্রতুলতাই শিল্প স্থাপনের একটি প্রধান বাধা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে। অবশ্য ব্যাংক জাতীয়করণ এবং ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (আই ডি বি আই), রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন সংস্থাগুলি (এস আই ডি সি), শিল্পে অর্থ ও ঋণদানের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (আই সি এফ সি), ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে বর্তমানে শিল্প স্থাপনের কোনো যোগ্য প্রচেষ্টায় ঋণ পাওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এইসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহী শিল্পোদ্যোগী প্রকল্পের (এস টি ই পি) মাধ্যমে নতুন শিল্পোদ্যোগীদের ছোটো হারে নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা করতে সাহায্য করা হচ্ছে, যাতে এঁরা নিজেরা অধিক মাত্রায় উৎপাদনে নামার আগে প্রত্যয় লাভ করতে পারেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই প্রকল্পগুলি ব্যাংকের সহায়তায় গঠিত হয়েছে। সঠিক দিকে একটি সূচনা হয়েছে বলে মনে করা যায়।

উৎপাদন পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়তা এবং রোবটের ব্যবহারের মতো উন্নতির ফলে প্রভূতভাবে উৎপাদন মূল্য হ্রাস এবং গুণগত মানের উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, অধিক হারে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন সৃষ্টি করা ছাড়াও এই বিষয়গুলি শিল্পে অধিক হারে কর্মী বিনিয়োগের বিপক্ষে কাজ করে, ফলে কর্ম সংস্থান হয় কম হারে। তাই আমাদের দেশে এই দুটি বিপরীত বিষয়ের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। এদেশে শিল্পে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ব্যবহার কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে, বিশেষত রপ্তানিমূলক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং অন্য সব ক্ষেত্রে পুরানো কিন্তু এখনও দক্ষ এমন উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রাখা দরকার, যার বেলায় অধিক হারে কর্মী নিয়োগ করতে হয়। সুতরাং স্বয়ংক্রিয় ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের পটভূমিতে এর প্রয়োগের বিষয়টা মনে রাখা দরকার এবং অতি-যান্ত্রিকীকরণ বা অতি-স্বয়ংক্রিয়করণ আমাদের বিকাশের এখনকার স্তরে না নিয়ে আসাই মঙ্গল।

এই অনুচ্ছেদে আমরা শিল্পকে আধুনিকীকরণের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এইসব যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নীচের প্রশ্নটির উত্তর দিন।

অনুশীলনী ৩

"আমাদের দেশের ব্যাংকগুলির কাজকর্ম কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত"—আপনি কি এই বক্তব্য সমর্থন করেন? কারণ সহ ৪-৫টি বাক্যের মধ্যে উত্তর লিখুন।

২৭.৪ অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্বনির্ভরতা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়। উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন এবং অন্য দেশগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা যায়।

সব সময় আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ প্রযুক্তির উন্নতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সারা দেশকে কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক করার পরিবর্তনটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এজন্য অনেক মূলধনের প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই সঞ্চয় ক্ষমতা খুব অল্প বলে মূলধন গড়ে উঠতে সময় লাগবে।

সমস্যাটি আরও জটিল হয়েছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলে, যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে মূলধন বাড়িয়ে আয় ক্ষমতা বাড়িয়ে যাওয়া আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলবে। যদি প্রথমটির জয় হয় তাহলে আমরা ধনীই হয়ে চলব আর দ্বিতীয়টির জয় হলে আমরা ক্রমশ আরো গরিবই হতে থাকব। যদি কোনোটিরই জয় না হয় তাহলে এখনকার মতো গরিবই থাকব, শিল্পে উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও। যদি এটা ধরে নেওয়াও যায় যে, মূলধন ক্রমাগত জমছে বা তৈরি হচ্ছে এবং বিনিয়োগ হচ্ছে, তবুও পরিবর্তনের ব্যাপারটা সুপরিকল্পিতভাবে হওয়া দরকার। কৃষি, বিভিন্ন পুঁজি উৎপন্নকারী শিল্প, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের শিল্প, শক্তি উৎপাদন ও সমাজ কল্যাণের মতো নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে যে একটির উন্নতি অন্যটির উন্নয়নের সহায়ক হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের দ্রুততম উন্নতির পথকে প্রশস্ত করবে। এজন্য দরকার সার্বিক পরিকল্পনা।

এ পর্যন্ত নয়টি যোজনা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের কোন ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে, কোন ক্ষেত্রে এসেছে ব্যর্থতা, তথাপি আমাদের উদ্দেশ্য হবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছড়িয়ে দিয়ে আরও সাফল্য লাভ, এ ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতেই হবে কারণ তা না করতে পারলে এই একটা কারণেই আমাদের সব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। একক ১৬ তে আপনি এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই পড়াশুনা করেছেন।

এটা ঠিক যে কোনো দেশেরই সবদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়, তবে যত বেশি বিষয়ে স্বনির্ভর হওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিশেষত প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং খাদ্য সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যত বেশি স্বনির্ভর হওয়া যায়, ততই জাতির মঙ্গল।

যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক কোন বিপর্যয়ের মতো সংকটের মুহূর্তে একমাত্র স্বনির্ভরতাই আমাদের জাতীয় সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সামরিক বাহিনীতে দরকার অত্যন্ত আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন, আর একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে জাতীয় সুরক্ষা কেবলমাত্র দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপরই নির্ভর করে না, সাধারণ জনগণের মনোবলও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে দরকার সুস্থির একটা রাজনৈতিক কাঠামো। একদিকে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই উচ্চারিত হয় ও পূরণ হয়। অপরদিকে যেন থাকে শক্তিশালী সরকার যা আমাদের দেশকে বিদেশি শত্রুদের আঘাত থেকে বাঁচাতে এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম। প্রযুক্তি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক চাবিকাঠি, তেমনই আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের সুস্থিরতা বজায় রাখার এবং সমগ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার যথোপযুক্ত মান সুনিশ্চিত করার এক চাবিকাঠি। স্ব-নির্ভরতা এবং জাতীয় সুরক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

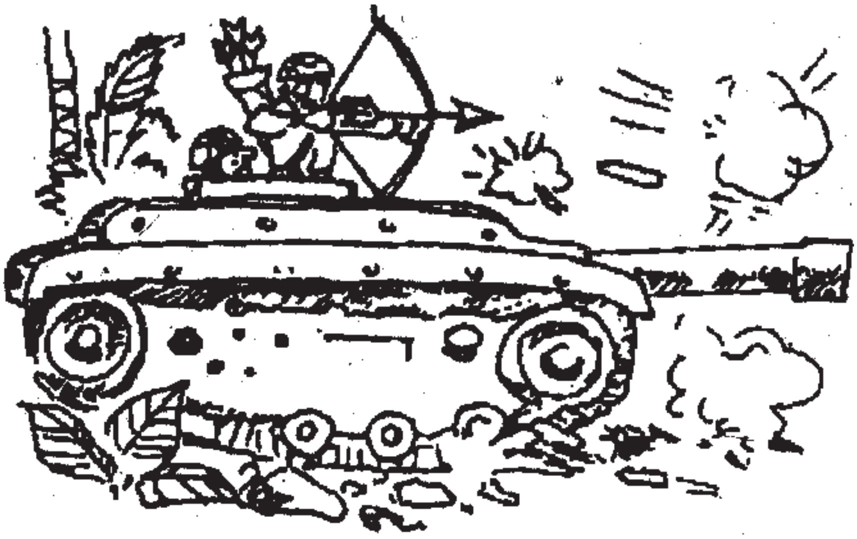

চিত্র ২৭.৩ : অস্ত্র তথা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভর হতেই হবে, এই অনিশ্চিত আমদানির ওপর নির্ভর করা চলবে না।

২৭.৫ শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় কাঁচামাল বা শ্রমিক বাবদ খরচ অন্যান্য দেশের চেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বেশি হচ্ছে, ফলে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারা যাচ্ছে না। ইস্পাতের কথাই ধরা যাক। যদিও আমাদের দেশে সর্বোত্তম লৌহ ভাণ্ডার মজুত আছে এবং শ্রমিক মজুরিও অনেক কম, তবু এদেশের ইস্পাতের এককপ্রতি উৎপাদন মূল্য আমেরিকা, জাপান বা ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি। আংশিকভাবে এর কারণ হচ্ছে আমাদের ইস্পাত প্রকল্পগুলির অধিকাংশই পুরানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছে এবং আমাদের দেশের শ্রমিকদের শিক্ষারও অভাব রয়েছে।

আগেও আমরা দেখেছি শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, কারণ আমাদের তৈরি জিনিস যদি অন্য দেশের তুলনায় বেশি দামের বা নিম্নমানের হয় তাহলে সেগুলি বাজারে চলবে না। কোন নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রকল্পে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে ব্যাপারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নিম্নলিখিত বিষয় দুটি জরুরি—

- নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতিবিধান।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ ফলের প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে শিল্পোন্নয়ন এবং এর ফলেই সম্পদ বৃদ্ধিকারী নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করা গেছে। এইসব উৎপন্ন সম্পদের একটা অংশ সর্বদা ফিরে আসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং গবেষক ও প্রযুক্তিবিদগণের প্রশিক্ষণের কাজে, ফলে গবেষণামূলক কাজকর্মের প্রাবল্য বাড়ে এবং আরও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ঘটে যা প্রযুক্তির নতুন উন্নতি ঘটায়, ফলে আবার সমৃদ্ধির নতুন নতুন রাস্তা খুলে যায়। এই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত দেশগুলি যথা জাপান, পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ায়।

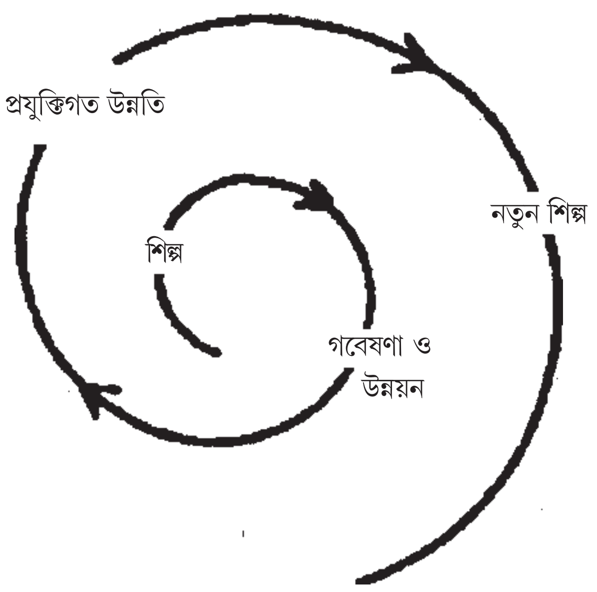

চিত্র ২৭.৪

ভারতের প্রসঙ্গে দেখা যায় আমাদের মহাকাশ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞান শিল্পে চলে এসেছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সহায়তায় ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকগুলি উৎপাদন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যেমন ইসরো এবং জাতীয় দূর সন্ধান নিগম (এন. আর. এস. এ.) দেশে ৫৬টি পণ্যদ্রব্য এবং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যেগুলি ব্যবহারের লাইসেন্স ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ২৭টি শিল্পে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আঠা জাতীয় ও সীলবন্ধ করার সামগ্রী, বিমান বাহিনীতে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য, দুরদর্শন স্টুডিওতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির লাইসেন্সও বিভিন্ন শিল্পে দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণা প্রকল্পগুলি কীভাবে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি ঘটাচ্ছে এটি তারই একটা দৃষ্টান্ত। বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নতুন আবিষ্কার বর্তমান শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন শিল্প স্থাপনের পথও প্রশস্ত করে।

এই ব্যাপারে জাপানই অনেকাংশে আমাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে। এই শতাব্দীর শুরুতে জাপান ছিল তুলনায় অনুন্নত একটি রাষ্ট্র। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে তারা যে নিজেদের আধুনিক করে তুলেছে তাই নয়, আমদানিকৃত প্রযুক্তিকে আরও উন্নতও তারা করেছে নিম্নোক্ত উপায়ে—

- আমদানিকৃত প্রযুক্তিকে খাপ খাওয়ানো ও আরও উন্নত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ তৈরি করেছে।
- প্রাথমিকভাবে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিজেদের লোকজনকেই প্রযুক্তির সৃষ্টি এবং অব্যাহত উন্নয়নের কাজে লাগিয়েছে।
- শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক মানব সম্পদের একটি বুনিয়াদি কাঠামো সৃষ্টি করেছে।

প্রয়াত স্যার উইনস্টন চার্চিল ১৯৪৬ সালে একটি বহুল প্রচারিত বক্তৃতায় বলেছিলেন ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব শক্তি হিসাবে আবির্ভাবের পেছনে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা থাকলেও প্রধানত কাজ করেছে লোক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি।’ এরকম ভাবেই আবার জাপান দেখিয়েছে কীভাবে তুলনামূলকভাবে

অনগ্রসর প্রযুক্তির ভিত থেকে শুরু করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক জাতিগুলির একটি হয়ে ওঠা যায়। কেবল অনগ্রসর বা উন্নয়নশীল দেশই নয়, আমেরিকা, ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশও তাদের তৈরি প্রযুক্তি গ্রহণ করছে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হতে বা এমনি টিকে থাকলে গেলেও শিল্পে আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা তথা নিজস্ব গবেষণাসংস্থাগুলির সহায়তায় আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগ (সি এস আই আর) দ্বারা সংগঠিত সরকারি গবেষণাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলির গবেষণা বিভাগের মধ্যে নিকট সহযোগিতার চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে আমাদের সরকার লাভজনকতা তথা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য বৃদ্ধির বিষয়ে দেশজ গবেষণার গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরেছেন। শিল্পগুলিকে তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ খোলার জন্য নানারূপ সুবিধা দেওয়ার বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এইসব কর্মসূচির ফল যে আশাব্যঞ্জক তা নিম্নের লেখচিত্রের সাহায্যে বোঝা যাবে।

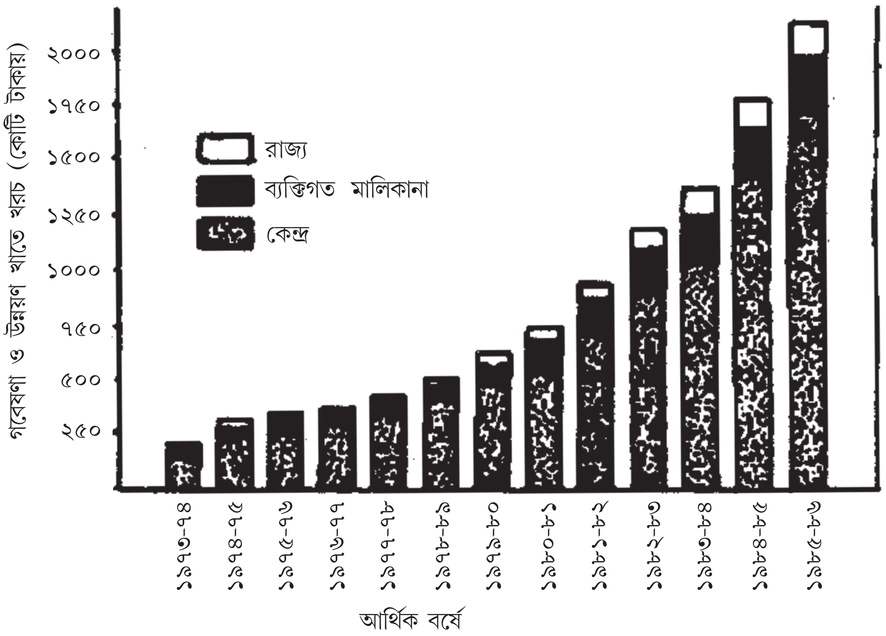

চিত্র ২৭.৫ : গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য জাতীয় ব্যয় (R & D পরিসংখ্যান, ১৯৮৪-৮৫ ; ডি. এস. টি.)

দেখা যাচ্ছে অতীতে ও বর্তমানে উন্নয়নমূলক গবেষণার জন্য খরচের একটা বৃহৎ অংশই সরকার বহন করেছে। এই চিত্রটি অবশ্য উন্নত দেশগুলির থেকে আলাদা। সেখানে এই খরচের একটা বড়ো অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পগুলি বহন করে থাকে। দেখা গেছে যে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের পেছনে যে খরচ করা হয় তা ওই শিল্পের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়। ভারতে গবেষণার পেছনে খরচের একটা সামান্য অংশই আমাদের দেশের শিল্পগুলি বহন করে থাকে। এখানে প্রদত্ত সারণী (২৭.১) থেকে বোঝা যাবে যে আমাদের শিল্প কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়িত অর্থের ৮৬ শতাংশই খরচ হয়েছে দেশের মাত্র এগারোটি অগ্রণী শিল্পক্ষেত্রে।

সারণি ২৭.১ : ১৯৮৪-৮৫ বর্ষে গবেষণা ও উন্নয়ন বাবদ খরচ (লেখা টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	শিল্পক্ষেত্র	সরকারি উদ্যোগ		বেসরকারি উদ্যোগ		সমগ্র শিল্প উদ্যোগ	
		এককের সংখ্যা	খরচ	এককের সংখ্যা	খরচ	এককের সংখ্যা	খরচ
১.	বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিকস	১৫	৫০৫০.৪০	১২০	৩৩১০.০২	১৩৫	৮৩৬০.৪২
২.	প্রতিরক্ষা শিল্প	৭	৫৭৭২.৬৩	—	—	৭	৫৭৭২.৬৩
৩.	জ্বালানি	৫	৫৬৪২.১২	৮	৯২.২৭	১৩	৫৭৩৪.৩৯
৪.	রাসায়নিক শিল্প (সার ব্যতীত)	৭	৬৭১.২২	১২৪	৩০৭৪.১৭	১৩১	৩৭৪৫.৩৯
৫.	ধাতু নিষ্কাশন	১৪	১৯২২.৬২	৫১	১২২২.০৪	৬৫	৩১৪৪.৬৬
৬.	ঔষধ ও ভেষজ	৩	২৩.৮৮	৬২	২৪৩৭.৯৬	৬৫	২৪৬১.৮৪
৭.	শিল্প যন্ত্রাংশ	৪	২১৮.৫৫	৫৯	২১৬০.০৩	৬৩	২৩৭৮.৫৮
৮.	দূর সংযোগ	৬	২০৩৪.১৮	১৭	১৬৯.৭২	২৩	২২০৩.৯০
৯.	পরিবহণ	১	১৬.৮৭	২৯	১৯০৩.৯০	৩০	১৯২০.৭৭
১০.	সার	১	৮০২.৭০	২	১৩০.৪০	৭	৯৩৩.১০
১১.	বস্ত্রশিল্প	১২	১৪১৪.৭৩	১৮৩	৪৭২৩.৭৪	১৯৫	৬১৩৮.৪৭
১২.	অন্যান্য	৮০	২৩৫৭৫.৫০	৬৮২	২০১০৬.৬৭	৭৬২	৪৩৬৮২.১৭
	মোট	৮০	২৩৫৭৫.৫০	৬৮২	২০১০৬.৬৭	৭৬২	৪৩৬৮২.১৭

বর্তমানে আমাদের দেশে অবশ্য অনেকগুলি সমবায় শিল্পভিত্তিক গবেষণা সংস্থা আছে। প্রথম এমনটি তৈরি হয় ১৯৫০ সালে আমেদাবাদে, বস্ত্রশিল্পের জন্য। এখন এই রকমই অনেক সমবায় ভিত্তিক সংস্থা তৈরি হয়েছে পাট, রবার, চা, পশম, কাজুবাদাম প্রভৃতি শিল্পে। ছোটো ছোটো শিল্প সংস্থাগুলির পক্ষে গবেষণা ও উন্নয়নের স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র স্থাপনের খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। এইসব ক্ষেত্রে ওই সমবায় সংস্থাগুলি অত্যন্ত কার্যকর।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্য দেশের ওপর নির্ভরতা কমানো। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রসার দ্বারাই তা সম্ভব। দেশে উদ্ভাবিত দ্রব্য ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যাতে কাঁচামালগুলি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার (যেমন আবহাওয়া) ওপর সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও আরও উন্নত করার জন্য যে লোকবল দরকার তা হাতের কাছেই থাকবে। এই গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে চলতে হবে দেশের মূল উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সরকারি গবেষণাগারগুলি ছাড়াও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক শিল্পগুলিকেও গবেষণার কাজে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। যদি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি আরও সহজে এবং অধিক পরিমাণে বাণিজ্যক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। শিল্পসংস্থাগুলির নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ থাকলেই এটি আরও ভালো করে সম্ভব হবে।

আমাদের দেশজ শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগগুলির চেষ্টা করা উচিত উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পরিবেশের ক্ষতি কমানো। উন্নত দেশগুলিতে শিল্পের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আপনারা জানেন জ্বালানি তেলের দাম ১৯৭৩ সালে আকাশ ছোঁয়ার আগেই আমাদের বৃহৎ শিল্পের বেশিটা স্থাপিত

হয়। ফলে জ্বালানি তেলের ওপর তাদের নির্ভরতা খুবই বেশি। তেলের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি এবং বিশ্বে তৈল সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করে আমাদের বিকল্প শক্তি উৎসের কথা ভাবতে হবে যা দূর ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে চলছে অচিরাচরিত শক্তির উৎস হিসাবে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করার পরীক্ষা নিরীক্ষা। কিছু কিছু জায়গায় এর সফল প্রয়োগও ঘটেছে। কিন্তু এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহার এখনও হয় নি।

আমাদের মনে রাখতে হবে পদ্ধতি আর উৎপাদিত সামগ্রীর মান উন্নয়নের সঙ্গে আধুনিকীকরণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু শুধুমাত্র চটকের জন্য আধুনিকীকরণ, যেমন অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার, দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি কেবলমাত্র সামগ্রিক খরচের পরিমাণই বাড়িয়ে দেয় ও বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই মুহূর্তে তাই আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়াসে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এজন্য আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

দেখুন এবার নীচের অনুশীলনীর প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারেন কিনা।

অনুশীলনী ৪

এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে পারেন যেখানে আমদানিকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ ভারতীয় পরিবেশে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে? ব্যর্থতার কারণগুলি কী বলে আপনার মনে হয়?

২৭.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা শিল্প উন্নয়ন তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। শিল্পে আধুনিকীকরণ এবং বড়ো মাপের গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগসুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। স্বনির্ভরতা ও জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টির উপরও আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে।

২৭.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। আমাদের শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার কি অবশ্য প্রয়োজনীয়? শিল্পক্ষেত্রে অতি পুরাতন পদ্ধতির ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার ফল কী হতে পারে অন্তত দুইটি উদাহরণের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

২। প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলে? (১০০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।)

৩। দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত দেশগুলি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে থাকে।

ভূটান বহির্বিশ্বের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগ রাখার এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কয়েক বছর আগে জাপান কিছু বিদেশি প্রযুক্তি আমদানি করে এবং নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেগুলির উন্নতি বিধান করে।

এই তিনটি দেশের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বলে আপনার মনে হয়?

এদের মধ্যে কোন্ দৃষ্টান্তটি স্বনির্ভরতা লাভ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারতের গ্রহণ করা উচিত? (১০০টি শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।)

৪। আমাদের দেশের এক শিল্পমন্ত্রী বলেছিলেন, 'অনেকগুলি ক্ষেত্রেই ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদনশীলতা আন্তর্জাতিক মানের বিচারে গ্রহণযোগ্যতার চেয়ে অনেক নীচে। এর পেছনে কী কারণ আছে আপনার মনে হয়? (১০০টি শব্দের মধ্যে লিখুন)।

২৭.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনীর উত্তর :

১। (ঘ)

২। একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যে, প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতির জোগাড় থাকা দরকার যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ-বিনিয়োগ। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ কৃষিনির্ভর মানুষের অধিকাংশেরই এই বিনিয়োগের জন্য আলাদা ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য নেই। আমাদের দেশের কর্মীদের এক বড়ো অংশের নিরক্ষরতাও আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের পথে অন্তরায়। মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপকারের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগে তাঁদের প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে এর সুবিধাগুলি তাঁরা পেতে পারেন।

৩। অবশ্যই আমাদের দেশের ব্যাংকে কাজ কম্পিউটার পরিচালিত হওয়া উচিত। এর ফলে সুষ্ঠু কাজকর্ম চলার পথে নানা জট খুলে যাবে। যেখানে বাইরের চেকগুলি ভাঙাতে ৭-৮ দিন সময় লাগে সেখানে লাগবে মাত্র দু-একদিন। গ্রাহকগণ তাঁদের অ্যাকাউন্টের সঠিক এবং নিয়মিত হিসাব পাবেন। তবে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার চালিত করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং এর ফলে কাজের সুযোগও কমে যাবে। এই সবের জন্যই হঠাৎ এবং সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটার প্রয়োগের পথে যাওয়া যাবে না। পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে এটি করতে হবে।

৪। আমদানি করা টেপ রেকর্ডারে অনেকক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ এমন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় যা তাপাধিক্যে বিকৃত হয়ে যায়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর :

১। আমাদের শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো একটি মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। সাবেকি পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকলে একটি নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। এই সীমায় আমাদের পৌঁছালেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা-কে খাদ্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই আমাদের উন্নতির ক্ষেত্রে একটা লাভ দিতে হবে।

২। আমাদের গতরে খাটা শ্রম বাহিনীর যন্ত্রের নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই উৎপাদিত দ্রব্যে উচ্চ গুণগতমান আনার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হবে। কারণ উচ্চমানের জিনিস তৈরি করতে না পারলে আমরা বিদেশে তথা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। প্রযুক্তি

ব্যবহার করে উৎপাদনের হারও বাড়ানো যায়, ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের একক প্রতি মূল্য হ্রাস পায়। কম হলে অবশ্যই আমাদের তৈরি জিনিস আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হবে।

৩। ভারতের উচিত জাপানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা। যদি আমরা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগুলি শুধু আমদানিই করে যাই, আমাদের গবেষণা ও উন্নয়নের ভিত মজবুত না করি, তাহলে সব সময়ই আমাদের উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। স্বনির্ভর হতে না পারলে আমাদের সেইসব উন্নত দেশগুলির সঙ্গো আদর্শগত মিল না থাকলেও তাদের মতে মত দিয়ে চলতে হবে। আবার আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও চলবে না। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার তথা দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে কারণ আমরা যদি সেইসব প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে দেশীয় প্রয়াসের দ্বারা গড়ে তুলতে চাই তবে তা হবে অনেক সময় সাপেক্ষ এবং অন্য জাতিগুলিকে তাহলে আমরা আর ধরে ফেলতে পারব না।

কিছু দেশ যদি এখনই আধুনিক প্রযুক্তি গড়ে তুলে থাকে আমাদের উচিত হবে সেগুলি আমদানি করে আমাদের শিল্পকে নব কলেবর দেওয়া। তবে আমদানিকৃত প্রযুক্তিগুলিকে বহমান সময়ের সঙ্গো তাল মিলিয়ে আধুনিক করতে থাকার লাগাতার কাজটির জন্য আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।

৪। আমাদের দেশে উৎপাদনশীলতা গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে কম হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। একটি হল, আমাদের শিল্পগুলি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগায় না, কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য অনেক টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। এমনকি আধুনিক যন্ত্র বসানো হলেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে সেগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হয় না।

কখনো কখনো শিল্প মালিকেরা প্রযুক্তিকে সময়ের সঙ্গো সর্বদা খাপ খাইয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন না, যেজন্য তাঁরা গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে চান না। এর ফলে যখন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প সংস্থাগুলি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে নেয় তখন তাঁদের উৎপাদনশীলতা পিছিয়ে পড়ে।

একক ২৮ □ প্রযুক্তি ও আর্থিক উন্নয়ন

গঠন

২৮.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
২৮.২ প্রযুক্তি-নীতি
২৮.৩ প্রযুক্তি হস্তান্তর
২৮.৩.১ প্রযুক্তির আমদানি
২৮.৩.২ গবেষণাগার থেকে প্রয়োগক্ষেত্রে
২৮.৩.৩ প্রযুক্তির রপ্তানি
২৮.৪ সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
২৮.৪.১ শক্তির ক্ষেত্র
২৮.৪.২ কয়েকটি প্রধান শিল্প
২৮.৫ প্রযুক্তিতে সীমিত অধিকার
২৮.৬ সারাংশ
২৮.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
২৮.৮ উত্তরমালা

২৮.১ প্রস্তাবনা

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গো সঙ্গো বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। যে সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে রত ছিল, তাদের সামনে একটা সুযোগ এল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশ স্বাধীনতালাভের পর ছোটো বড়ো অনেক দেশই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ঔপনিবেশিকদের শোষণ ও বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ সব দেশ অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল। স্বাধীনতালাভের পরেই যে প্রশ্নটি তাদের সামনে দেখা দিল, তা হল কীভাবে তারা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে মৌলিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে। ভারতেও দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য কোন্ মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে।

এই বিতর্কের ফলে ১৯৫৮ সালে দেশের বিজ্ঞান-নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং সেটি ভারতের সংসদে গৃহীত হয়। ২৭নং এককে আমরা এই নীতির কোন কোন দিক নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এই সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "কোন জাতির সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে শিল্পায়নের মাধ্যমে তার মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহারের উপর।" এতে আরও বলা হয়েছে যে "জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি তিনটি বিষয়ের উপযুক্ত সংযোগের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি হল প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও মূলধন। এগুলির মধ্যে প্রযুক্তিই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" সিদ্ধান্তে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা হল "নূতন বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির

সৃষ্টি এবং সেগুলি গ্রহণ করতে পারা যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি পুষিয়ে দিতে পারে, তেমনি মূলধনের প্রয়োজনও কিছুটা কমায়। কিন্তু একমাত্র বিজ্ঞানের চর্চা ও তার প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রযুক্তির উদ্ভব হতে পারে।" আমাদের দেশে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান-নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরো পঁচিশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আমাদের প্রযুক্তি-নীতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট বিবৃতি ঘোষিত হয়েছে।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যা বাস্তব পরিস্থিতি, প্রযুক্তি-নীতির বিবৃতিটি তারই একটি সুস্পষ্ট সূত্রবদ্ধ রূপ। কেননা, প্রযুক্তি যেমন দেশের শিল্পায়ন এবং প্রকৃত আর্থিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, তেমনি এটি বিভিন্ন দেশের স্বার্থের সংঘাতেরও জন্ম দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের বিদেশে উদ্ভূত কোন প্রযুক্তির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত উন্নত দেশ তাদের প্রযুক্তির ভিত্তিতেই তাদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে তারা তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি থেকে কেন আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেবে? আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সমস্যাগুলিকে তলিয়ে বুঝতে হলে আমাদের প্রযুক্তি-নীতির প্রধান দিক্‌গুলি বুঝতে হবে এবং কোন্ অবস্থায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘটে তাও জানতে হবে।

২৮.২ অংশে আমরা ভারতের প্রযুক্তি-নীতির পর্যালোচনা করব। ২৮.৩ অংশে আমরা প্রযুক্তি হস্তান্তরের সমস্যার কথা বলব। ২৮.৪ অংশে বলা হবে ভারতে কয়েকটি শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা। ভারতের প্রকৃত ও সার্বিক অগ্রগতির জন্য এবং ভবিষ্যতে উন্নত দেশগুলির অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য প্রযুক্তিকে সমাজের সকল স্তরের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। ২৮.৫ অংশে আমরা এই অভিমতের সপক্ষে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি

- আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তির উন্নতিসাধন কেন প্রয়োজনীয় তার কারণ দর্শাতে পারবেন।
- আমাদের প্রযুক্তি-নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিভিন্ন দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে সম্প্রতি যে সব প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে সেগুলি তালিকাবদ্ধ করতে পারবেন।
- প্রযুক্তিগত উন্নতির সুফল কেন আমাদের সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায় না তার কারণ দেখাতে পারবেন।

২৮.২ প্রযুক্তি-নীতি

সপ্তম এককে আমরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের কথা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি কেমনভাবে শাসক রাষ্ট্র ব্রিটেন তার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পোদ্যোগের উন্নতি ঘটিয়ে আজ 'উন্নত' জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আর অন্যদিকে ভারত অনুন্নত ও আর্থিক দিক দিয়ে ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে।

অন্য ঔপনিবেশিক দেশগুলিও একই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর তারা আবিষ্কার করেছে যে তাদের অর্থনীতি তাদের পূর্বতন শাসকদের অর্থনীতির সঙ্গে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ থেকে গেছে। তাদের উৎপন্ন

দ্রব্য বিক্রয় বা পণ্যসামগ্রী ক্রয়, উভয়ের জন্যই তারা বিশ্বের বাজারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের কোন ক্ষমতা তাদের হাতে নেই, উপরন্তু সেখানে আছে নানা বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ। যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে তারই সাহায্যে শিল্পোন্নত দেশগুলি উৎকৃষ্ট পণ্য অপেক্ষাকৃত কম দামে বাজারে ছাড়তে পারে। কিন্তু পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলি যখন নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে অথবা বিদেশি প্রযুক্তি ক্রয়ের দ্বারাও তাদের প্রযুক্তির মানোন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছে তখন অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্রই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। বোঝা শক্ত নয় যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষই যখন বাজারের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সুনিশ্চিত করে, তখন ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রয়োজন আছে বলেই তাদের সেই প্রযুক্তি দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। অপর পক্ষে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির প্রযুক্তির ঘাটতি তাদের কাছে উৎপাদন বৃদ্ধির ও এমন কি জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে এই সব দেশের সরকার প্রায়ই দুর্বল ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে।

সমস্ত উন্নতিশীল দেশের কাছেই প্রযুক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নের একটিই উত্তর আছে এবং সেটি হল আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো, যা আমাদের প্রয়োজন মেটাবে, আবার আমাদের যে মানবসম্পদ রয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাবে। এর জন্য আমাদের অগ্রাধিকারের লক্ষ্যগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলিতে পৌঁছানোর জন্য অবিচলভাবে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট জাতীয় প্রযুক্তি নীতি। উন্নত দেশগুলি থেকে যতই চাপ আসুক অথবা আমাদের দেশে তাদের যে সব ব্যাবসায়িক সহযোগী আছে তারা যতই দুর্নীতিপ্রসূ প্রভাব খাটাক না কেন, এই জাতীয় প্রযুক্তি নীতি থেকে সরে আসা চলবে না।

অনুশীলনী ১

নীচের উক্তিগুলি সত্য হলে তাদের পাশে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

(i) আমাদের প্রযুক্তি-নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রয়োজন মেটে। ☐

(ii) অপরিহার্য বস্তু ও পরিসেবার জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার প্রথম ধাপটি হল একটি প্রযুক্তি-নীতি। ☐

(iii) কোন জাতির প্রযুক্তি-নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে মানব-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। ☐

(iv) ভারতের প্রযুক্তি-নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে আমরা শীঘ্রই অন্য দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো অবস্থায় পৌঁছাতে পারি। ☐

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার প্রযুক্তি-নীতি সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এর প্রথম বাক্যটিই ছিল "রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই দেশকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও দারিদ্র্যের বোঝা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।" নীচে যে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি দেওয়া হল তাতে প্রযুক্তি-নীতির প্রধান কয়েকটি দিক সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

"প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশ অবশ্যই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। প্রযুক্তির দিক দিয়ে স্বনির্ভরতায় পৌঁছোনো, জনসাধারণের দুর্বলতম শ্রেণির অবস্থার দ্রুত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি এবং অনগ্রসর অঞ্চলগুলির দ্রুত উন্নয়ন—এগুলিই ভারতে অবিলম্বে প্রয়োজন। ভারত তার বৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত।

প্রযুক্তিকে তাই আঞ্চলিক চাহিদা মেটাতে হবে এবং সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলতে হলে, যে সমস্ত ছোটোখাটো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশজ উপাদান ও প্রচলিত কর্মপদ্ধতির সবচেয়ে ভালো ও অর্থ-সদ্‌ব্যয়কারী ব্যবহার সম্ভব হয় তাদের প্রতি সর্বদা নজর রাখতে হবে। আমাদের উন্নয়ন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের ওপর ভিত্তি করেই হতে হবে। বাতিল হয়ে যাওয়া অথবা আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিহীন প্রযুক্তি, কিংবা আমাদের চেয়ে অন্যের সুবিধা সৃষ্টি করে এমন পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে দেয় এমন সব নীতিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা রুখতে আমরা কতটা সক্ষম হই এবং আমাদের সরকারি, আর্থিক, সামাজিক, এমন কি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠানেও যে সব কায়েমি স্বার্থ আমাদের সেকেলে পদ্ধতি ও বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখে সেগুলির প্রতিরোধে আমরা কতটা সক্ষম তার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।”

এই অনুচ্ছেদে “প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন” আমাদের আশু প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের যোগ্যতার কথা এসে যায়। এঁদের আধুনিক জ্ঞান ও প্রকৌশলের সঙ্গে সুপরিচিত থাকতে হবে। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটাতে হবে এবং নুতন প্রযুক্তির সৃষ্টি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁদের এদেশে সহজলভ্য সৌরশক্তির মতো বিভিন্ন শক্তির উৎসকে কাজে লাগাতে হবে। অথবা যে সব কাঁচামাল আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বলতে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের পরিকাঠামো ও দক্ষ কর্মীদের দ্বারা প্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করার ক্ষমতাও বোঝায়। স্বনির্ভরতার অর্থ, আমাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজন আমরা পূর্বেই অনুমান ক'রে সেইমতো উপযুক্ত কেন্দ্রে বিকাশের কাজ শুরু করতে পারব। এর অর্থ, আমরা বিদেশে বিকাশমান নূতন প্রযুক্তির অসহায় দর্শক হয়ে থাকব না। আর যদি নূতন প্রযুক্তি আমদানি করাই স্থিরীকৃত হয়, তবে আমরা যেন সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নীত করার ক্ষমতা রাখি, যাতে কয়েক বছর পরে আবার একই ধরনের প্রযুক্তি আমদানি করা থেকে দেশকে বাঁচানো যায়। আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করার মতো শিল্পও আমাদের আছে, এটাই হল স্বনির্ভরতা।

বুঝতেই পারছেন, স্ব-নির্ভরতা কথাটি শুনতে সহজ হলেও বাস্তবে এর অর্থ পরিকল্পনা, সমন্বয়ন, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশসাধন।

প্রযুক্তি নীতির বিবৃতি থেকে আর একটি উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল। প্রযুক্তি নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি এখানে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

“প্রযুক্তি নীতির মূল উদ্দেশ্য হবে দেশজ প্রযুক্তির উন্নতিসাধন এবং জাতীয় সম্পদ ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী আমদানি করা প্রযুক্তির কার্যকর আত্মীকরণ ও অভিযোজন। এর লক্ষ্যগুলি হল ঃ

(ক) দেশজ সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত যোগ্যতা ও স্বনির্ভরতায় পৌঁছানো এবং বিশেষত যুদ্ধকৌশলগত ও সংকটময় ক্ষেত্রগুলিতে দুর্বলতা হ্রাস করা।

(খ) সমাজের সকল স্তরে সর্বাধিক লাভ ও সন্তুষ্টিজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে নারী ও সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া।

(গ) পরম্পরালব্ধ দক্ষতা ও ক্ষমতার ব্যবহার করা এবং সেগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগী ক'রে তোলা।

(ঘ) সর্বনিম্ন মূলধন বিনিয়োগে যাতে সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটানো যায় তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) চালু প্রযুক্তির মধ্যে পুরাতন ও বাতিলযোগ্য প্রযুক্তিগুলিকে চিহ্নিত করা এবং যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উভয়েরই আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা।

(চ) আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার যোগ্য এবং বিশেষ করে রপ্তানির সম্ভাবনাযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

(ছ) অধিকতর কর্মদক্ষতা এবং বিদ্যমান ক্ষমতার সর্বোচ্চ সদ্‌ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, কাজের ও উৎপন্ন বস্তুর গুণগত মান ও নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন।

(জ) শক্তির, বিশেষত নবীকরণযোগ্য নয় এমন উৎস থেকে পাওয়া শক্তির চাহিদা হ্রাস করা।

(ঝ) পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সুনিশ্চিত করা, বাস্তুসংস্থানের (ecology) ভারসাম্য বজায় রাখা এবং স্বাভাবিক বসতির মান উন্নয়ন করা।

(ঞ) বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও উপজাত বস্তুসমূহের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করা।”

স্পষ্টই বোঝা যায় প্রযুক্তি-নীতি প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দেশজ প্রযুক্তিতে আমাদের নিজস্ব সম্পদের সদ্‌ব্যবহারের ওপরই জোর দিয়েছে। প্রযুক্তি-নীতির লক্ষ্যগুলি থেকে পরিবেশ সম্বন্ধে সরকারের আগ্রহও প্রমাণিত হয়।

পরিবেশ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার মধ্যে যে বিষয়গুলি পড়ে তার কয়েকটি হল—

(i) **বায়ুদূষণ হ্রাস :** বিভিন্ন দহনপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এটি করা সম্ভব। কয়লা বা অন্য জ্বালানির সম্পূর্ণ দহন সুনিশ্চিত করতে হবে। দহনের জায়গায় চিমনিগুলিকে এমন উঁচু করতে হবে যাতে দহনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে। এই চিমনিগুলিতে দূষণ হ্রাস করার যন্ত্রপাতিও লাগাতে হবে।

(ii) **কঠিন বর্জ্য পদার্থের অপসারণ :** তাপীয় শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রের ছাই বা সিমেন্ট কারখানার বর্জ্য পদার্থ ঠিকমতো অপসারিত করতে হবে।

(iii) **শিল্পজাত বর্জ্য তরলের শোধন :** রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত যে তরল নদীতে বা সমুদ্রে ফেলা হয় তা আগেই উপযুক্তরূপে শোধন করে বিষাক্ত দ্রব্য থেকে মুক্ত করতে হবে। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার উপযুক্ত শোধন-ব্যবস্থার দ্বারা গঙ্গানদীকে সমগ্র প্রবাহ বরাবর পরিষ্কার করার জন্য ‘গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা’ (Ganga Pollution Control Authority) স্থাপন করেছেন।

(iv) **ভূমিক্ষয় রোধ :** ভূমিক্ষয়ের অনেকগুলি কু-প্রভাব আছে। সামাজিক বনসৃজন, খামার-বনসৃজন, তৃণভূমি ও পতিত জমি উন্নয়নের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তর স্থাপিত হয়। এই দপ্তর গবেষণা পরিচালিত করে, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রযুক্তি-নীতি বিবৃতিকে রূপায়িত করার জন্য সরকার একটি প্রযুক্তি-নীতি রূপায়ণ কমিটি (Technological Policy Implementation Committee) গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাছাই করা কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করার একটি বিশেষ প্রকল্পও চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবচেয়ে আধুনিক শাখাগুলিতে কাজ করার জন্য তাদের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে পারে সেটা দেখাই এর উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বহুবিষয়ক (multi-disciplinary) গবেষণার সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। অনেক রাজ্যও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষৎ স্থাপনে সম্মত হয়েছে। মার্চ, ১৯৮১ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটিকে কর্মসম্পাদনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে। এই বিভাগ যে সমস্ত গবেষণা প্রকল্পে সহায়তা করেছে, সেগুলি আসল উৎপাদন পদ্ধতিগুলিকে আরও উন্নত করতে কাজে লাগানো হচ্ছে।

সরকারি প্রযুক্তি-নীতি সম্বন্ধে এতক্ষণ অনেকটাই জানলেন। দেখুন নীচের অনুশীলনীটি করতে পারেন কি না।

অনুশীলনী ২

নীচের প্রতিটি বাক্যকে সেটি আমাদের প্রযুক্তি-নীতির যে লক্ষ্যটিকে সূচিত করে তার সঙ্গে মেলান। পাশে দেওয়া চতুষ্কোণে (ক), (খ) প্রভৃতি হরফ বসিয়ে উপযুক্ত লক্ষ্যটি নির্দেশ করুন।

(i) আমাদের সমগ্র মানবসম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। ☐

(ii) বর্জ্য পদার্থের উপযুক্ত ব্যবহার খুঁজে বার করতে হবে। ☐

(iii) নিম্নতম ব্যয়ে সর্বাধিক উন্নয়ন করতে হবে। ☐

(iv) বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট না করে উন্নয়ন করতে হবে। ☐

(v) উপযুক্ত বিকাশসাধনের মাধ্যমে বর্তমানের অনুপযোগী প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কর্মপদ্ধতি বদলাতে হবে। ☐

২৮.৩ প্রযুক্তি হস্তান্তর

উপরের অংশে আমরা আমাদের প্রযুক্তি-নীতির আলোচনা করেছি। স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে আমরা বলেছি যে কখনও কখনও অন্য দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করাও জরুরি হয়ে পড়ে। প্রযুক্তির আমদানি প্রযুক্তিহস্তান্তরের একটি রূপ। এই অংশে আমরা এটির ব্যাখ্যা দেব।

প্রযুক্তির হস্তান্তর তিনটি পদ্ধতিতে হতে পারে। এগুলি হল :

- প্রযুক্তি আমদানি,
- গবেষণাগার থেকে প্রয়োগক্ষেত্রে প্রযুক্তির স্থানান্তর এবং
- ভারত থেকে প্রযুক্তি রপ্তানি।

প্রযুক্তির দিক দিয়ে স্বনির্ভর হওয়া ভারতের লক্ষ্য হলেও বিকাশের প্রাথমিক স্তরে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি ক'রে আমদানি করা প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হতে পারে।

আমাদের যেমন নিজস্ব প্রযুক্তি তৈরি করতে হবে, তেমনি আমদানি করা প্রযুক্তি আত্মীকরণের ও দ্রুত অগ্রগতির জন্য সেই প্রযুক্তির উন্নতিসাধনের ক্ষমতাও আমাদের থাকতে হবে। প্রযুক্তি আমদানির বিভিন্ন দিকগুলি এবার আলোচনা করা যাক।

২৮.৩.১ প্রযুক্তির আমদানি

এ ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তরের অর্থ, উন্নততর দেশের বিশেষ জ্ঞানলব্ধ সামর্থ্য, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন হলে জোগান দেওয়া। এটি নানা উপায়ে সংঘটিত হতে পারে, যথা অনুজ্ঞাপত্র (license) দেওয়ার মাধ্যমে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের দ্বারা, ইত্যাদি। এটির কার্যকারিতা নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন প্রযুক্তির জোগানদারের ক্ষমতা ও হস্তান্তরের সদিচ্ছা, গ্রহীতার সামর্থ্য ও প্রযুক্তি গ্রহণের আগ্রহ, গ্রহীতার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা।

স্পষ্টতই, প্রযুক্তি আমদানির কয়েকটি সুবিধা আছে। এর একটি বড়ো সুবিধা এই যে অন্য দেশগুলি উন্নয়নের বতমান স্তরে পৌঁছতে যে সময়, অর্থ ও শক্তিব্যয় করেছে এর মাধ্যমে তা অনেকটাই এড়ানো যায়। কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্তি আমদানির অনেক সমস্যা ও অসুবিধা আছে। এখানে আমরা তার কয়েকটি উল্লেখ করব।

প্রযুক্তি-ক্রয় খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স থেকে আধুনিক প্রতিরক্ষা বিমান ক্রয়ের কথাই ধরুন। এটা ঠিক, যে আমরা গবেষণা ও উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে অর্থের সাশ্রয় করেছি। তবু ওই বিমান সরাসরি কিনতে আমাদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে কেননা এর দামের মধ্যে ফ্রান্স এই ব্যাপারে উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় করেছে তাও ধরা আছে। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং সেটিও বিদেশি মুদ্রায়। এ ছাড়া এর ফলে দেশের গবেষণা ও উন্নয়নের কাঠামোরও উন্নতি হয় না।

২৮.১ সারণি থেকে আপনি বিদেশি প্রযুক্তি কত ব্যয়সাপেক্ষ তার কিছুটা ধারণা পেতে পারেন। এখানে দেখা যাবে যে রয়্যালটি (প্রযুক্তির মালিককে দেয় অর্থ) ও প্রযুক্তিগত ব্যাবহারিক জ্ঞানের মূল্য প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। এগুলি আবার দিতে হয় বিদেশি মুদ্রাতে।

২৮.১ সারণি : ভারতীয় উদ্যোগগুলির দ্বারা বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরিত অর্থ

বৎসর	রয়্যালটি (কোটি টাকায়)	ব্যাবহারিক জ্ঞানের মূল্য (কোটি টাকায়)
১৯৭৯-৮০	৯.৫৩	৪৩.৯৭
১৯৮০-৮১	৮.৮৮	১০৪.৯৩
১৯৮১-৮২	১৫.৯৯	২৭০.৭০
১৯৮২-৮৩	৩৯.৭২	২৫৮.৫৮

- আমদানি করা প্রযুক্তির সঙ্গে তার জোগানদার অনেক সময়ই কিছু বাধ্যবাধকতা বা রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত এক সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভাজন-চুল্লিতে ব্যবহারের জন্য সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আমদানি করত। একসময় মার্কিন সরকার জিদ ধরলেন যে হয় ভারতকে নিউক্লিয় প্রসার-রোধ

চুক্তিতে (Nuclear Non-Proliferation Treaty) সই করতে হবে, নয়ত তাঁরা সরবরাহ বন্ধ করবেন। ভারত এটি না মেনে যুক্তি দেখায় যে এটি মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু ভারতের যুক্তি কোন কাজেই লাগেনি, মার্কিন সরকার সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন।

- যোগানদার অনেক সময় গ্রহীতার ওপর পুরানো প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়, অনেকসময় অতি উচ্চ মূল্যেও। গ্রহীতা দেশের সেই প্রযুক্তি না থাকায়, তারা জানতেও পারে না বিক্রি করতে চাওয়া প্রযুক্তি কতটা সেকেলে। এর একটা উদাহরণ হল মোটরগাড়ি শিল্প। এক্ষেত্রে এমন সব মডেল আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে, উন্নত দেশে বা তাদের উৎপত্তির দেশে যাদের কোন চাহিদা নেই। এ ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে প্রধানত যে সব ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে তার একটি হল এয়ার-কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিশন, ভি-সি আর ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মতো গৃহস্থালির প্রয়োজনের জিনিসপত্র। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্পৃক্ত হওয়ার পর বিকাশশীল দেশগুলিতে প্রথম তৈরি অবস্থায় এই সব জিনিসপত্র এবং পরে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বাজার গড়ে তোলা হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল হওয়ায় উন্নতিশীল দেশগুলিকে যে প্রযুক্তি দেওয়া হয় তা হল পুরানো হয়ে যাওয়া প্রযুক্তি।
- গ্রহীতা দেশকে, বিশেষ ক'রে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পাকাপাকিভাবে জোগানদার দেশের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে। জোগানদার দেশ হয়তো আধুনিক প্রতিরক্ষা বিমান বিক্রি করল, কিন্তু এই শর্তে যে গ্রহীতা দেশ সবসময়েই তার কাছ থেকেই বাড়তি যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম কিনবে। এর ফলে গ্রহীতা দেশ কখনই স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবে না।
- কোন দেশ যখন একটি শিল্পের জন্য একাধিক দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে, তখন কোন একটি যন্ত্রাংশ বিভিন্ন মডেলে লাগানো যায় না। আপনি হয়তো জানেন যে মারুতি, ফিয়াট ও অ্যামব্যাসাডর গাড়ির প্রযুক্তি যথাক্রমে জাপান, ইটালি ও ব্রিটেন, এই তিনটি বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এগুলির একটির যন্ত্রাংশ অন্য কোনটিতে লাগানো যায় না। এর ফলে বাড়তি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের পরিমাণে তারতম্য হয়, উৎপাদনের খরচও বাড়ে।

উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থা যখন কোন উন্নতিশীল দেশকে প্রযুক্তিগত ব্যাবহারিক জ্ঞান প্রদান করে, তখন তারা এই শর্ত আরোপ করে যে ওই জ্ঞান অন্য উন্নতিশীল দেশের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেওয়া চলবে না। এর ফলে বিভিন্ন দেশের ওপর তাদের সরাসরি আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়।

নিচের সারণিতে কয়েকটি প্রধান শিল্পে আমদানিকৃত প্রযুক্তির পরিমাণ দেখানো হল।

২৮.২ সারণি : কয়েকটি শিল্পে বিদেশি সহায়তার অনুমোদনের সংখ্যা

শিল্প	বৎসর			
	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	১০৭	১২৯	১৫৭	২০৫
শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	১০৭	১১৫	১৩৮	১৫২
রাসায়নিক দ্রব্য (সার ব্যতীত)	৫৩	৬২	৬৯	৬৯
পরিবহণ	২৮	৩৯	৬৩	১০১
টেলিযোগাযোগ	৭	৭	৩	১৩

এই সারণি থেকে বোঝা যায় বিদেশি মুদ্রায় ব্যয় কীভাবে বাড়ছে।

এই অংশে যে সব মতামত উপস্থাপিত হল তার ভিত্তিতে এখন আপনি নিচের অনুশীলনীটি করতে পারবেন।

অনুশীলনী ৩

অনুচ্ছেদের শেষে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

প্রযুক্তি আমদানির সময় গ্রহীতা দেশকে নিশ্চিত হতে হবে যে সেটাই .... প্রযুক্তি; তাদের পক্ষে মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যেই সবকটি অংশই .... তৈরি করা সম্ভব হবে; জোগানদার দেশ কোন .... শর্ত যোগ করেনি বা তাদের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করছে না। এতে শেষ পর্যন্ত .... দেশ .... হতে পারবে।

(রাজনৈতিক, সর্বাধুনিক, স্বনির্ভর, নিজদেশে, গ্রহীতা)

এবার আমরা প্রযুক্তি হস্তান্তরের দ্বিতীয় রূপটি নিয়ে আলোচনা করব।

২৮.৩.২ গবেষণাগার থেকে প্রয়োগক্ষেত্রে

স্বাধীনতালাভের পর থেকেই, যতগুলি শিল্পে সম্ভব দেশজ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনই ভারত সরকারের নীতি। এর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে একগুচ্ছ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণাগার থেকে প্রয়োগক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরকে সুগম করতে 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় গবেষণা ও উন্নয়ন নিগম' (National Research and Development Corporation of India) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাবসায়িকভাবে কাজে লাগানোর জন্য তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলি নিগমের হাতে অর্পণ করে।

বিভিন্ন মন্ত্রকের নীতি-নির্ধারণকারীরা দেশীয় প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট মনে না করলে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের ও উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানির নূতন নীতি নির্ধারণ করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা আয়োগ (Planning Commission), বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পর্ষৎ (Science and Engineering Research Council) এবং মন্ত্রকগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি দেশের প্রযুক্তির প্রয়োজনের ওপর নজর রাখে।

নীচের অনুশীলনী আপনাকে ব্যাপারটি বুঝতে সাহায্য করবে।

অনুশীলনী ৪

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পর্ষৎ (Indian council of Agricultural Research) কৃষি বিজ্ঞান প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পের একটি অঙ্গ গ্রামের মহিলাদের খাদ্য-প্রযুক্তি, ফসল কাটার পরের প্রযুক্তি, অপ্রচলিত শক্তির উৎসের ব্যবহার প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

একে কি আপনি প্রযুক্তি হস্তান্তর বলবেন? ৫০টি শব্দের মধ্যে আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

ভারত থেকে প্রযুক্তি রপ্তানি সম্বন্ধে একটি ছোটো অনুচ্ছেদ দিয়ে আমরা এই অংশটি শেষ করব।

২৮.৩.৩ প্রযুক্তি রপ্তানি

ভারত প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছে। এর ফলে আমরা অনেক বিকাশশীল দেশকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে সহায়তা দানের ক্ষমতা লাভ করেছি। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই ভারত প্রযুক্তি রপ্তানি করে। কখনও তা প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আবার কখনও বা যন্ত্রপাতির রূপে। নীচের সারণিতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

২৮.৩ সারণি : ভারত থেকে প্রযুক্তি রপ্তানি

গ্রহীতা দেশ	প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্র	প্রযুক্তি
মায়ানমার	সুইচগীয়ার ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের সরঞ্জাম, বাড়ির জন্য ইস্পাতের কাজ।	জোগান দেওয়া ও স্থাপন
কুওয়েট	আলোক তন্তুর কেব্‌ল ও সরঞ্জাম,	স্থাপন ও তদারকি।
মালয়েশিয়া	কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ ও সফ্‌ট্‌ওয়্যার	জোগান, যথাস্থানে মাল পৌঁছানো, স্থাপন, যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের তদারকি।
ইথিওপিয়া	মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্ক।	নির্মাণ, যথাস্থানে স্থাপন ও চালু করা।
কেনিয়া	সিমেন্ট, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও পিভিসি শিল্প।	প্রকৌশলগত সহায়তা, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণদান।
ব্রাজিল	ছোটো ও মাঝারি শিল্প	কৃৎকৌশল ও পরামর্শ।
মেক্সিকো	কম্পিউটারের জন্য ডিস্ক ও চৌম্বকফিতা।	কৃৎকৌশল ও পরামর্শ।
আর্জেন্টিনা	জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি।	কৃৎকৌশল ও পরামর্শ।

এ পর্যন্ত আমরা যে সব উপায়ে গবেষণা ও বিকাশের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানো যায় তার আলোচনা করেছি। পরের অংশে এমন কিছু শিল্পের উদাহরণ দেওয়া হবে যেগুলিতে সম্প্রতি প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তার আগে একটি অনুশীলনী করা যাক।

অনুশীলনী ৫

নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

প্রযুক্তির .... ঘটাতে ইচ্ছুক অনেক বিকাশশীল দেশ ভারত থেকে প্রযুক্তি .... করে। যথাসম্ভব .... প্রযুক্তি উন্নয়নের দ্বারা স্বনির্ভরতা অর্জনই ভারত সরকারের লক্ষ্য। .... গবেষণাগারে সৃষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার প্রযুক্তি .... একটি রূপ।

ভারত দক্ষিণ আমেরিকার .... ও .... দেশগুলিতে কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তি .... করেছে। [রপ্তানি, আমদানি, ব্যাবহারিক, স্বনির্ভর, হস্তান্তরের, উন্নয়ন, দেশজ, প্রয়োগক্ষেত্রে, ব্রাজিল, কুওয়েট, আর্জেন্টিনা।]

২৮.৪ সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

সম্প্রতিকালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় গবেষণা ও বিকাশপ্রচেষ্টা আমাদের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে আছে কৃষিভিত্তিক শিল্প, ভারী শিল্প, রাসায়নিক, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি, ঔষধ, ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধাতুবিদ্যায় উন্নতি ঘটেছে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার নীতিগুলির প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে। রাসায়নিক, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি ও ঔষধশিল্পে অনেক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তি রাসায়নিক রূপান্তর। ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটারের উন্নতি গড়ে উঠেছে বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও উৎপাদন-কারিগরি বিদ্যার সহায়তায় মৌলিক পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ওপর ভিত্তি করে। উপাদান বিজ্ঞানে গবেষণা থেকেই শুরু হয়েছে কাচতন্তুর (fibre glass) ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হালকা এরোপ্লেন থেকে শুরু করে হালকা বাক্স, স্যুটকেস প্রভৃতি মালপত্র তৈরিতে এটি ব্যবহার করা যায়।

মনে রাখতে হবে প্রযুক্তি মানেই হল কাঁচামাল থেকে ব্যবহারযোগ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করা। এসব সামগ্রী ভোগ্যপণ্যও হতে পারে। আবার সেগুলি রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তনের দ্বারা ভোগ্যপণ্যে পরিণতও হতে পারে। যেমন, রাসায়নিক শিল্পে, মোট রাসায়নিক উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশই অন্য রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষৎ (Council of Scientific and Industrial Research, CSIR) জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রায় সব ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করেছে। এই ক্ষেত্রগুলি হল জ্বালানি, কাচ ও সেরামিক, রাসায়নিক, ধাতব ও তড়িৎ-রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি। মুম্বাইতে রেশম ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনী গবেষণা সমিতি (Silk & Art Silk Manufacturing Industries Research Association, SASMIRA) এবং কলকাতায় ভারতীয় পাটশিল্প গবেষণা সমিতি (Indian Jute Industries Research Association, IJIRA) তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয়। এগুলি চলে সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের যৌথ সহযোগিতায়। এ ছাড়া তিরুঅনন্তপুরম, জম্মু, হায়দ্রাবাদ, ভুবনেশ্বর, জোড়হাট প্রভৃতি জায়গায় CSIR যেসব আঞ্চলিক গবেষণা সংস্থাগুলি পরিচালনা করে, সেগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজন মেটায়।

কতকগুলি শিল্পে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনার আগে শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নের ওপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারটি জেনে নেওয়া যাক।

২৮.৪.১ শক্তির ক্ষেত্র

শক্তির ক্ষেত্রে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে তার লক্ষ্য শক্তি সংরক্ষণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন শক্তির উৎসের অনুসন্ধান।

হিসাব করে দেখা গেছে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কয়লা, প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস বিশ্বের ব্যবহৃত শক্তির মাত্র ৫ শতাংশ সরবরাহ করেছে। বাকি ৯৫ শতাংশ পাওয়া গেছে মানুষ ও পশুর শ্রম থেকে। বর্তমানে বিশ্বে ব্যবহৃত শক্তির প্রায় ৯৪ শতাংশ আসে কয়লা, প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস এবং নিউক্লিয় উৎস থেকে, ১ শতাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে আর বাকি ৫ শতাংশ মানুষ ও পশুর শ্রম থেকে। এটি বিশ্বের সামগ্রিক চিত্র হলেও আমাদের দেশে চিত্রটি বেশ কিছুটা আলাদা। ভারতে মোট শক্তির অনেক বেশি অংশ পাওয়া যায় মানুষ ও পশুর শ্রম থেকে আর কাঠ ও ঘুঁটে পুড়িয়ে। নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন হালে আমাদের দেশে কিছুটা গতিলাভ করেছে। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে উৎপন্ন

মোট ৩৫.১ হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তির প্রায় ৭৩ শতাংশ এসেছে তাপীয় শক্তি কেন্দ্র থেকে, প্রায় ২৫ শতাংশ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আর বাকি প্রায় ২ শতাংশ উৎপন্ন হয়েছে নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্রে।

১৭ এককে দেখেছেন, শক্তির যে সব উৎস ভারতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে জীবাশ্ম-জ্বালানি (যেমন, লিগনাইট, কয়লা, পেট্রোলিয়াম), সূর্য, বায়ু, ভূ-তাপীয় শক্তি (যেমন উষ্ম-প্রস্রবণ) জল (জলবিদ্যুৎ শক্তি) এবং মানুষ ও পশুর শ্রম। শক্তির দামে বেশ কমবেশি হয়। জৈববস্তু (Biomass) আর পীটের (ভিজে, আংশিকভাবে পটা জৈব পদার্থ) সরাসরি দহনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে কম। জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রেও শক্তির দাম মোটামুটিভাবে কম। তামিলনাড়ুতে লিগনাইটের বিশাল ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু এতে কয়লার চেয়ে বেশি খরচ পড়ে, কেননা ব্যবহারের জন্য এটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গোলা পাকাতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা কোক-চুল্লি গ্যাস, ওয়াটার-গ্যাস বা প্রডিউসার গ্যাসের মতো তৈরি করা জ্বালানি গ্যাসের খরচ অনেক বেশি। জৈববস্তুকে রূপান্তরিত করে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরির বা গাঁজানর দ্বারা মিথেন তৈরির চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি ডিজেলের পরিবর্ত হিসাবে উদ্ভিজ্জ তেলও ব্যবহার করা হচ্ছে।

শক্তির অন্যান্য উৎসের মধ্যে নিউক্লিয় শক্তিকে একটি প্রমাণিত বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে দেখা হচ্ছে। ফ্রান্সের মতো কোন কোন দেশে মোট শক্তির ৭০ শতাংশই এখন নিউক্লিয় উৎস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম ছাড়াও, কেরল উপকূলের মোনাজাইট বালি থেকে প্রাপ্ত থোরিয়াম সাফল্যের সঙ্গে নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের প্রথম নিউক্লিয় চুল্লিটি চেন্নাই-এর কাছে কলপক্কমে চালু হয়েছে। সারা বিশ্বে প্রায় ৫৫০ নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে ভারতে বর্তমানে (১৯৯৬) আছে দশটি, যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশি।

শক্তির অন্য যে সব উৎস বেশ কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে সেগুলি হল ভূ-তাপীয় শক্তি, তরঙ্গ ও জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, সৌরশক্তি, মহাসাগরীয় তাপশক্তি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী তড়িৎ-রাসায়নিক কোশ। এখানে জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনেরও উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতে বর্তমানে যে শক্তির উৎসগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি হল জীবাশ্ম-জ্বালানি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, জৈববস্তুর রূপান্তরণ এবং নিউক্লিয় শক্তি। বাস্তব সদ্ব্যবহারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্য উৎসগুলি এখনও পরীক্ষাস্তরে রয়েছে বলা যায়।

২৮.৪.২ কয়েকটি প্রধান শিল্প

এবার আমরা আমাদের প্রধান কয়েকটি শিল্পে সম্প্রতি যে সব উন্নতি ঘটেছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, ভেষজশিল্প, ইস্পাতশিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও ইলেকট্রনিক শিল্প।

বস্ত্রশিল্প : বস্ত্রশিল্পে সাম্প্রতিক উন্নতির মধ্যে একটি হল কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। মানুষের তৈরি তন্তু ক্রমশ প্রাকৃতিক তুলা, পশম ও রেশমের জায়গা নিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে উৎপন্ন তন্তুর অর্ধেকেরও বেশি কৃত্রিম তন্তু। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বে ৪৪০ লক্ষ টন মানুষের তৈরি তন্তু উৎপন্ন হয়েছিল, যেখানে প্রাকৃতিক তন্তু তৈরি হয়েছিল ১৭০ লক্ষ টন। রেয়ন এর মতো যে সব তন্তু আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল সেলুলোজ। সম্পূর্ণ মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম তন্তু বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে প্রথম হল নাইলন। রসায়নের দিক দিয়ে এটি পলিঅ্যামাইড শ্রেণিভুক্ত। এরপর যে তন্তুটি সৃষ্ট হয়েছিল সেটি হল পলিএস্টার, যার সাধারণ নাম টেরিলিন।

কৃত্রিম তন্তুর এলাকা বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। কাচতন্তুও এখন এর মধ্যে পড়ে। দুটি বা আরও বেশি পলিমার একসঙ্গে পেঁচিয়ে এখন যেসব বহু-উপাদান তন্তু তৈরি হয় সেগুলি একটিমাত্র উপাদান থেকে তৈরি তন্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট। যে কোনও কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন শুরু হয় খুব লম্বা অণুর শৃঙ্খল দিয়ে বানানো একটা পলিমার তৈরি দিয়ে। অণুশৃঙ্খলের গড় দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে একই পলিমার দিয়ে এমন সব কৃত্রিম তন্তু তৈরি করা যায় যাদের যান্ত্রিক ধর্ম একেবারেই আলাদা। সেগুলিকে ইচ্ছামত দুর্বল আর প্রসারযোগ্য অথবা শক্তিশালী ও দৃঢ় করা যায়।

এসব কৃত্রিম তন্তু ছাড়াও তুলার মতো সেলুলোজ বিশিষ্ট কাঁচামাল থেকে যে সব তন্তু তৈরি হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এধরনের উপাদান থেকে তৈরি তন্তুর উদাহরণ হল ভিসকোজ (viscose)। ভিসকোজ তৈরি হয় কাঠের মণ্ড থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। পলিমারের পর্দা, যেমন সেলোফেন, সেলুলোজ থেকেই এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। কার্বন-তন্তুর উৎপাদন একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। রেয়ন বা পলি-অ্যাক্রিলন থেকে এটি তৈরি করা যায়। কার্বন-তন্তু খুব বেশি উষ্মতা সহ্য করতে পারে। এজন্য এই উপাদানটি রকেটের, বিশেষ করে যে মহাকাশযান যাত্রাশেষে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তার নাসিকা-শঙ্কুর (nose-cone) তাপ-বর্ম তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। কয়লার আলকাতরা বা পেট্রোলিয়াম পিচ থেকেও এ ধরনের তন্তু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যে সব প্লাস্টিক কারিগরি ক্ষেত্রে ও খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় সেগুলির শক্তিবৃদ্ধি করতে কার্বন-তন্তু ব্যবহৃত হয়।

সূতি ও পশমের বস্ত্রশিল্প ভারতের প্রধান ঐতিহ্যগত শিল্পের অন্যতম। সম্প্রতি এই শিল্পে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে সুতা কাটা, রং করা, বিরঞ্জন (bleaching) ও মুদ্রণ (printing) পদ্ধতিতে উন্নতি ঘটানো হয়েছে। সেইসঙ্গে ভাঁজ-নিরোধক, মাপের দিক দিয়ে স্থায়ী, জীবাণু ও অতিবেগুনি রশ্মির আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ ও অগ্নি নিরোধক করার পদ্ধতিগুলিরও উন্নয়ন ঘটেছে। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বস্ত্রের ধর্মের পরিবর্তন করে তার উপযোগিতা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু রাসায়নিক পদার্থ যথাযথভাবে প্রয়োগ করে অগ্নিনিরোধক করা সম্ভব। কিছু জৈব ও অজৈব যৌগের প্রয়োগ করে ছত্রাক ও পচন রোধ করা যায়। কিছু বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহার করে জল প্রতিহত করার ক্ষমতা দেওয়া যায়। পশমের ওপর নানারকম ক্লোরিন প্রয়োগের প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অথবা তন্তুগুলিতে একটি মেলামিন ফরম্যালডিহাইড রজন মাখিয়ে পশমের সংকোচন রোধ করা যায়। সম্প্রতি তুলার মতো তন্তুর উপাদানের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তার প্রক্রিয়াকরণ শেষ করা হয় যাতে তন্তুর ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে।

চিনি শিল্প : ভারতে চিনিশিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিনি যে শক্তি দেয় তার জন্যই এটি প্রয়োজনীয়। অবশ্য এর মিষ্টি স্বাদের জন্যও আমরা চিনি ভালোবাসি। ভারতে চিনির প্রধান উৎস হল আখ। যে সব রাজ্য চিনি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু।

ভারতে চিনি উৎপাদনের পদ্ধতিতে বহু বছর কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে আখের রস বার করে নেওয়ার পর যে ছিবড়া পড়ে থাকে তার ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। আগে এটি কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি এই ছিবড়া গাঁজিয়ে অ্যালকোহল তৈরি হচ্ছে। অশোধিত চিনিকে বর্ণহীন করতে অস্থি-অঙ্গার বা সক্রিয়ীত (activated) কাঠকয়লা ব্যবহার করা হয়। এখন একটি বর্ণনাশক রাসায়নিকও বেরিয়েছে। অজৈব লবণ বিয়োজনের জন্য সম্প্রতি আয়ন বিনিময়কারী রজনের ব্যবহার চালু হয়েছে।

চিনি তৈরির জন্য অন্য যে কাঁচামালটির ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত হচ্ছে সেটি হল সুগারবিট। সুগারবিট সাধারণ বিটের থেকে আলাদা। এটি আকারে অনেকটা বড়ো, রংও লাল নয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও অন্য কোন কোন অঞ্চলে সুগারবিট শিল্প চালু করার চেষ্টা চলেছে। তবে আখই ভারতে চিনির প্রধান উৎস থাকবে বলে মনে হয়।

ভেষজ শিল্প : এটি ভারতের একটি প্রধান শিল্প হলেও এ পর্যন্ত বাজারের ৭০ শতাংশের বেশি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই রয়েছে। উৎপন্ন ভেষজগুলি সাধারণত তাদের রাসায়নিক গঠন, অথবা তাদের উৎপাদনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া অথবা তাদের উপযোগিতা অনুযায়ী শ্রেণিবন্ধ করা হয়। সাধারণভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় এমন প্রায় ৫০টি ঔষধ আছে।

এসব ভেষজের কোন কোনটি প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে পৃথকীকরণের দ্বারা তৈরি হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সার্পাসিল (Serpasil) নামের ঔষধ দেওয়া হয় তা পাওয়া যায় সর্পগন্ধা (Rauwolfia Serpentina) থেকে। রক্তের ক্যানসার রোগের প্রতিষেধক ঔষধ ভিনক্রিষ্টিন (Vincrystine) পাওয়া যায় সাধারণ একটি উদ্ভিদ নয়নতারা (Vinca-Rosea) থেকে। হৃদ্‌যন্ত্রের রোগীদের একটি ঔষধ ডিজিটালিস (Digitalis) পাওয়া যায় শিয়ালকাঁটা থেকে।

তবে অনেক ভেষজই তৈরি হয় সংশ্লেষণের দ্বারা। যেমন, বেদনানাশক হিসাবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত অ্যাসপিরিন (Aspirin) পাওয়া যায় স্যালিসিলিক অ্যাসিড থেকে। পেনিসিলিন বা স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিকগুলি আগে সন্ধান (Fermentation) বা জৈব সংশ্লেষণ (Biosynthesis) পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি হত। এখন সেগুলি সংশ্লেষণ করে তৈরি হয়। আইসোনিয়াজিড্ নামে রাসায়নিক যৌগটি যক্ষ্মা রোগের একটি অতি শক্তিশালী ও বাছাই করা ঔষধ। মধুমেহ (diabetes) রোগের ঔষধ ইন্‌সুলিন (insulin) উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। এটি আগে পশুর অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে তৈরি হত। এখন এটি জিনের একত্রীকরণের (splicing) মাধ্যমে তৈরি হয়। এ সম্বন্ধে ২৯.৬.১ অংশে আপনি আরও জানতে পারবেন।

ভারতের পক্ষে সবেচেয়ে সাম্প্রতিক উন্নয়নের ঘটনা হল সোভিয়েট সহযোগিতায় ‘ইন্ডিয়ান ড্রাগ্‌স্ অ্যান্ড ফারমাসিউটিক্যাল্‌স্ লিমিটেড’-এর প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান সচরাচর ব্যবহৃত ৫০টি ঔষধের অনেকগুলিই সংশ্লেষণ এবং/অথবা গাছপালা বা প্রাণী থেকে পৃথকীকরণের দ্বারা উৎপন্ন করে।

ইস্পাত শিল্প : স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে ইস্পাত শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে এটি ‘স্টিল অথরিটি অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড’ (SAIL) নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে। কোন কোন ইস্পাত কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন, যেমন দুর্গাপুর, বার্নপুর, বোকারো, ভিলাই, রৌরকেলার কারখানাগুলি। আবার জামসেদপুরের ‘টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি’র মতো কয়েকটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একাধিক উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের বহুমুখী প্রচেষ্টা। টাটার প্রথম কারখানাটি অ্যামেরিকান প্রযুক্তি নিয়ে গড়া হয়েছিল। এখন আমরা বোকারো আর ভিলাইতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, জার্মান প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে রৌরকেলায়। টাটারা নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করছেন।

রাসায়নিক শিল্প : কস্টিক সোডা, ক্লোরিন, সিমেন্ট, কার্বন, ইউরিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, সুপার ফসফেট এবং হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের মতো গ্যাসের উৎপাদন এই শিল্পের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে বড়ো কাচ ও সেরামিক শিল্প, পৃষ্ঠ-প্রলেপন (Surface-coating) শিল্প, খাদ্য ও খাদ্য-উপজাত শিল্প রয়েছে। আমাদের কৃষি-

রাসায়নিক শিল্পগুলি কীটনাশক উৎপাদনের দেশজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। সাবান, ডিটারজেন্ট (detergent), গ্লিসারিন, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তেল ও চর্বিজাতীয় বস্তু আমাদের শিল্পে উৎপাদিত হচ্ছে। পেট্রোলিয়াম-রসায়নের (Petro-chemical) ক্ষেত্রে বেশ বড়ো রকম অগ্রগতি ঘটেছে। আমাদের দেশে বেশ কিছু পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং পেট্রো-রসায়ন শিল্প আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি আছে বরোদায়। ভারত তার প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়ামের দুই-তৃতীয়াংশ নিজে উৎপন্ন করে। বাকিটা আমদানি হয় মধ্যপ্রাচ্য, স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ (Common-wealth of Independent States), পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে। ভারতে মুম্বই, বিশাখাপত্তনম, আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বেশ কয়েকটি তৈল শোধনাগার আছে।

ইলেকট্রনিকস শিল্প : সম্প্রতি সারা বিশ্বে এক ইলেকট্রনিকস-বিপ্লব ঘটে গেছে। প্রায় প্রত্যেক শিল্পে তো বটেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ, শিক্ষা ও বিনোদনের মতো মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের অনেক ক্ষেত্রেই ইলেকট্রনিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যানালগ্ (analogue) থেকে ডিজিট্যাল (digital) প্রযুক্তিতে চলে যাওয়ার ফলে কম্পিউটার শিল্পে এখন এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তিতে একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যানালগ ও ডিজিট্যাল প্রযুক্তির মিশ্রণের দ্বারা যন্ত্রপাতির দূর-নিয়ন্ত্রণ (remote control) সম্ভব হয়েছে।

কম্পিউটারের ব্যবহার কারিগরি বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। আগেকার দিনে যান্ত্রিক, পূর্ত ও রাসায়নিক কারিগরিতে কোন কাজের প্রথম পরিকল্পনার স্তর থেকে শেষ অর্থাৎ নির্মাণের স্তরে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগত। কম্পিউটারের উদ্ভব হওয়ার পর থেকে কম্পিউটার-সহায়িত পরিকল্পনার সাহায্যে এ ব্যাপারে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় অনেকটাই কমানো গেছে। তা ছাড়া কম্পিউটারের সাহায্যে কোন একটি বিশেষ ডিজাইনের সংবেদনশীলতা, সূক্ষ্মতা ও নির্ভরযোগ্যতা সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিকসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্পে মোট কর্মীর ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশই গবেষণা ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে। কেননা এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় এগিয়ে থাকতে হলে নতুন উপাদান এবং নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি। প্রতি ২ থেকে ৩ বছরেই কম্পিউটারের একটি নতুন ডিজাইন বার হয়।

ভারতে ইতিমধ্যেই যে সব জিনিস উৎপন্ন করছে সেগুলি হল :

- ইলেকট্রনিক সুইচ-ব্যবস্থা।
- অতি বৃহৎ অখণ্ড বর্তনী (Very Large Scale Integrated Circuit), যেগুলি আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাদির মূল ভিত্তি।
- অখণ্ড বর্তনী তৈরি ও সৌরশক্তি কাজে লাগানোর জন্য বহুকেলাসিত সিলিকন (Polysilicon)।
- উচ্চশক্তির মাইক্রোওয়েভ টিউব, যা রাডার ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ।
- কম্পিউটার।

কিছুদিন আগে 'বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সাক্ষরতা ও অধ্যয়ন' (Computer literacy and Studies in Schools, CLASS) নামে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে সারা ভারতের ২৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার স্থাপন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার ব্যবহার করতে ও বুঝতে শেখানো হচ্ছে।

সাধারণভাবে ইলেকট্রনিকস শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয়। কম্পিউটার, অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার (software) রপ্তানিতে বেশ কিছুটা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা গেছে। আগামী দিনে যোগাযোগের ক্ষেত্রটিতেও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

আমরা এই অংশটি এই বলেই শেষ করব যে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটলেও আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে। আমাদের প্রায়ই সমসাময়িক প্রযুক্তি আমদানি করতে হচ্ছে। একটি হিসাবে দেখা গেছে ভেষজের ৩৫%, কৃষি-যন্ত্রপাতির ৭০%, ইলেকট্রনিকসে ৭৫% এবং পেট্রো-রসায়ন ও সারের ক্ষেত্রে প্রায় সবটাই বিদেশি প্রযুক্তির ফসল। সচেতন নীতিপ্রণয়ন, সযত্ন পরিকল্পনা আর তার সঙ্গে শিক্ষা, গবেষণা ও বিকাশে ক্রমবর্ধমান সাহায্য দানের মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে।

অনুশীলনী ৬

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(i) .... শিল্পে একটি সাম্প্রতিক উন্নয়নের ঘটনা হল প্লাস্টিকের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য .... তন্তুর উৎপাদন। এগুলি তৈরি হয় .... থেকে।

(ii) মধুমেহ রোগের ঔষধ .... এখন সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি হয়।

(iii) ইস্পাত শিল্পে আমরা এখনও অনেক .... দেশ থেকে প্রযুক্তি .... করছে।

(iv) রাসায়নিক শিল্পে .... উৎপাদনই হল সবচেয়ে বড়ো সাম্প্রতিক উন্নয়নের ঘটনা।

২৮.৫ প্রযুক্তিতে সীমিত অধিকার

স্বাধীনতার পর ভারত প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নতি করেছে। অনেক নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এখানে ঘটেছে। কিন্তু নানা কারণে, আমাদের সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিগুলি এসব প্রযুক্তি থেকে কোনভাবেই উপকৃত হয়নি। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের একটি হল চেতনার অভাব আর অন্যটি হল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগের অভাব।

প্রথমেই সচেতনতার অভাবটি আলোচনা করা যাক। এর একটি বড়ো কারণ প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮% অর্থাৎ মোট প্রায় ৪২ কোটি লোক নিরক্ষর (১৯৯১ আদমশুমারি অনুযায়ী)। সকলের জন্য সুবিধাজনক দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয় নেই। তার ওপর ভারতীয় সমাজের এক বিরাট অংশের চরম দারিদ্র্য কাছে বিদ্যালয় থাকলেও যথেষ্ট সময়ের অভাবে তাদের বিদ্যালয়ে যেতে দেয় না। দরিদ্র পরিবারের সব সদস্যকে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তাগিদে পরিশ্রম ও সংগ্রাম করতে হয়।

আবার, অবগতির অভাবের ফলে অশিক্ষিত মানুষ মনে করেন যে প্রযুক্তির অগ্রগতি তাঁদের জানা-বোঝার বাইরে এবং সেটি তাঁদের কোন কাজেই লাগবে না। রেডিয়ো ও টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমের সাহায্যে দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবার এবং তাঁদের কাছে ভারতে যে সব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সুফল লাভকরা গেছে সেগুলির কথা বলা চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়।

অকে সময় মানুষ প্রযুক্তির অগ্রগতির কথা জানলেও সেগুলি কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করেন। ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার ও প্রাচীন রীতিনীতির জন্য প্রতিকূল চিন্তাধারাই এর কারণ। যেমন, টিকাদানের সুযোগ আমাদের প্রায় ১০০ বছর আগে থেকেই রয়েছে। তবু আমাদের সমাজে, এমন কি শহরাঞ্চলেও এমন অনেকে আছেন যাঁরা শিশুদের ডি-পি-টির (ডিপথেরিয়া, পাটুসিস বা হুপিং কাশি, টাইফয়েড) টিকা দেওয়ার বিরুদ্ধে। তেমনি, জল যে দূষিত হ'য়ে রোগের কারণ হতে পারে তা জানাই আছে। জল ফুটিয়ে নিলে সহজেই নানা জলবাহিত রোগ

প্রতিরোধ করা যায়। তবুও গ্রামের বেশির ভাগ লোক, বিশুদ্ধ পানীয় জল যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে জল ফুটিয়ে নেওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করেন না। এর কারণ প্রাচীন রীতি আর সেইসঙ্গে জ্বালানির অভাব।

দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে একদিকে রয়েছে শহুরে জনসমাজ, যার সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় ঘটেছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনাগুলিকে এঁরা অগ্রগতির উপায় বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে অধিকাংশ ভারতবাসীই এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ বা বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের ঘটেনি। এই ভুলকে ঠিক করার একমাত্র পথ প্রাথমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার। রেডিয়ো ও টেলিভিশনের মাধ্যমে এটি করা যায়। কিন্তু গ্রামীণ জনসাধারণের সকলের কাছে এগুলির সুযোগ নেই। তাঁদের নিজস্ব সমাজের প্রধানদের, বা গ্রামস্তরের পঞ্চায়েতের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁদের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন হতে পারে। বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা যদি তাঁদের বোঝাতে হয় তবে আমাদের জনশিক্ষার কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের এই দিকটি আমাদের মনে রাখতে হবে। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি ও গ্রামীণ বিজ্ঞান কর্মসূচির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে কেমন ক'রে সরল শ্রমসাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রামের মানুষের রোজকার কাজের বোঝা কমাতে পারে অথবা কেমন ক'রে সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তি দ্বারা আলো জ্বালা বা জলসেচ সম্ভব হতে পারে। আমাদের জনসাধারণের বঞ্চিত অংশের মধ্যে চেতনার বিস্তারের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে তাঁরা প্রযুক্তির সুফল, যা কিনা তাঁদের জীবনে একটা পরিবর্তন আনতে পারে, তাকে বুঝতে পারেন।

কিন্তু চেতনাই কি যথেষ্ট? আপনি সেচের কোন উন্নততর প্রযুক্তির কথা জানতে পারেন। কিন্তু আপনার যদি সেই প্রযুক্তি পাওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থবল না থাকে তবে সেই জ্ঞান আপনাকে সাহায্য করবে না। ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন, উন্নত প্রযুক্তি থেকে যাঁরা কোন উপকারই পান না, শুধু সেগুলি তাঁদের আর্থিক সংগতির বাইরে বলেই। এখানে সরকার সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন। যে সমস্ত প্রযুক্তি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে সাহায্য করবে সরকার তাতে ভরতুকি দিতে পারেন। সরকার সেগুলি এমনভাবে বাজরে ছাড়তে পারেন যাতে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই এই প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়। এ ধরনের কর্মনীতি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুবিধাগুলিকে নিশ্চয়ই আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

অনুশীলনী ৭

নীচের যুক্তিগুলির কোন্‌গুলি সত্য? সত্য উক্তিগুলির পাশের বক্সে 'স' লিখুন, সত্য না হ'লে 'মি' লিখুন।

(i) শহরবাসীদের তুলনায় গ্রামবাসীদের প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ অনেক কম। ☐

(ii) গ্রামের মহিলারা সাধারণভাবে প্রযুক্তির সুফলগুলির সংস্পর্শে আসেন নি, বরং সেগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে গেছেন। ☐

(iii) রেডিয়ো ও টেলিফিশন সেটের উৎপাদন বাড়িয়ে আমরা ভারতে বিজ্ঞান চেতনাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারি। ☐

(iv) প্রত্যেক ভারতীয়ের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুফলগুলি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছাবে। ☐

২৮.৬ সারাংশ

এই এককে কী কী আলোচিত হল সেগুলি সংক্ষেপিত করে আমরা এককটি শেষ করব।

- ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি বিকাশ ঘটানো কেন প্রয়োজন।
- ভারতের প্রযুক্তি নীতির বিবৃতি।
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের মধ্যে পড়ে উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি, অপেক্ষাকৃত অল্প উন্নত দেশে প্রযুক্তি রপ্তানি এবং দেশজ প্রযুক্তিকে গবেষণাগার থেকে শিল্প বা কৃষিক্ষেত্রে স্থানান্তরণ। প্রযুক্তি আমদানির অনেক অসুবিধা আছে এবং এটি যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
- বস্ত্র, চিনি, ভেষজ, ইস্পাত, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিকস—এই ভারতীয় শিল্পগুলিতে আধুনিক যুগে যে সব বিকাশ ঘটেছে।
- ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে কেন ভারতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার ঘটেনি।

২৮.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

এককটি সবটা পড়ার পর আপনি নীচের অনুশীলনীগুলির উত্তর দিতে পারবেন।

১. কোন দেশের নিজস্ব প্রযুক্তি সৃষ্টির তিনটি কারণ দেখান।

২. যে প্রযুক্তি আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাবে, সেই উপযুক্ত প্রযুক্তি বেছে নেওয়ার সময় আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এ ধরনের তিনটি বিষয়ের তালিকা দিন।

৩. ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমদানির সঙ্গে স্বনির্ভরতার সম্পর্ক কী? কমবেশি ১০০ শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৪. (ক) বস্ত্র শিল্প, (খ) ইলেকট্রনিকস শিল্প ও (গ) ভেষজ শিল্পে দুটি করে প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নয়নের উদাহরণ দিন।

৫. অনুশীলনী ৭-এর (ii) উক্তিটি কেন সত্য তা ৭৫টি শব্দের মধ্যে লিখুন।

২৮.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১ :	(i) স	(ii) স	(iii) স	(iv) মি	
অনুশীলনী ২ :	(i) খ	(ii) ঞ	(iii) ঘ	(iv) ঝ	(v) ঙ
অনুশীলনী ৩ :	সর্বাধুনিক,	নিজদেশে,	রাজনৈতিক	গ্রহীতা	স্বনির্ভর।

অনুশীলনী ৪ : হ্যাঁ। এটি দেশজ প্রযুক্তিকে প্রয়োগক্ষেত্রে স্থানান্তরণের একটি উদাহরণ। প্রযুক্তি বলতে শুধু যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি বোঝায় না। এই পদ্ধতি কাজে লাগানোর জন্য ব্যাবহারিক জ্ঞানও বোঝায়। প্রশিক্ষণের কর্মসূচি এই হাতে-কলমে শেখা জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

অনুশীলনী ৫ : উন্নয়ন, আমদানি, দেশজ, প্রয়োগক্ষেত্রে, হস্তান্তরের, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রপ্তানি।

অনুশীলনী ৬ : (i) বস্ত্র, কার্বন, রেয়ন/কয়লার আলকাতরা/পিচ/পরি-অ্যাক্রিলন (ii) ইন্‌সুলিন (iii) উন্নত, আমদানি (iv) পেট্রো-রসায়নের।

অনুশীলনী ৭ : (i) স (ii) স (iii) মি (iv) স।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি :

(১) প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা উচিত কেননা (ক) তাকে স্বনির্ভর হতে হবে, (খ) তার নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে (গ) এটি জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাবে।

(২) (ক) এই প্রযুক্তি যেন আমাদের মানব-সম্পদের সর্বাধিক সদ্‌ব্যবহার করে, (খ) এটি যেন স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগায় এবং (গ) এটি যেন শক্তি-সংরক্ষণের নীতি মেনে চলে।

(৩) ভারত একসময় একটি উপনিবেশ ছিল, যার ফলে এই দেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পায় নি। ভারতকে তাই উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করতে হয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তি আমদানির অনেক অসুবিধাও আছে। এজন্যই প্রযুক্তি আমদানি করতে থাকা আমাদের অনুচিত। আমাদের পরিকাঠামো এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে একটা স্তরে এসে আমরা নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারি। আমাদের এমন অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যাতে আমরা ধার-করা প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে সেটিকে মানিয়ে নিতে পারি। এটাই স্বনির্ভরতা অর্জনের উপযুক্ত পথ। প্রযুক্তি আমদানি আমাদের বিকাশসাধনে কিছুটা সাহায্য করলেও, নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে না পারলে আমরা কোন দিনই স্বনির্ভর হব না।

(৪) (ক) অগ্নি-নিরোধক করা, পশমের সংকোচন রোধ করা; (খ) কম্পিউটার তৈরি, উচ্চশক্তির মাইক্রোওয়েভ টিউব উৎপাদন; (গ) ইনসুলিনের সংশ্লেষণ, সংশ্লেষণ দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন। এ ছাড়া আরও অনেক উত্তর হতে পারে।

(৫) প্রযুক্তিগত তথ্য গ্রামে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের কাছে অনেক কম পৌঁছায়। এর কারণ, প্রথমত, তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, তাঁদের কাজকর্ম গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় বাইরের জগৎ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। পরিবারের দেখাশোনা করে আর মাঠে কাজ করেই তংদের সবটা সময় কেটে যায়। প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের কাছে পৌঁছাতে যদি বিশেষ পদক্ষেপ না নেন তবে তাঁরা কখনই বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না।

একক ২৯ □ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—১

গঠন

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ লেজার : কাজে লাগার আলো

২৯.২.১ লেজারের প্রয়োগ

২৯.৩ তন্তু আলোকবিদ্যা

২৯.৩.১ আলোকীয় তন্তুর প্রয়োগ

২৯.৪ মহাকাশ প্রযুক্তি

২৯.৪.১ মহাকাশচর্চার মুনাফা

২৯.৫ বিভাজন এবং সংযোজন শক্তি

২৯.৫.১ নিউক্লিয় বিভাজন : পরমাণুর ভাঙন

২৯.৫.২ পরমাণু চুল্লি

২৯.৫.৩ নিউক্লিয় সংযোজন : শক্তির চরম উৎস

২৯.৫.৪ মুদ্রার অপর দিক

২৯.৬ জৈব প্রযুক্তি কী?

২৯.৬.১ সুপ্রজনন প্রযুক্তি

২৯.৬.২ উৎসেচক নিশ্চলীকরণ

২৯.৭ সারাংশ

২৯.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

২৯.৯ উত্তরমালা

২৯.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন অবদান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে। আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে বা শহরে শোরগোলের মধ্যে যেখানেই বাস করি না কেন প্রতিদিনই আমরা এসব জিনিসের সংস্পর্শে আসি তা সে খাদ্য বা কৃষিতেই হোক, যাতায়াত বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় হোক কিংবা আমাদের প্রয়োজনের অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করার সময়ই হোক। ২৮ নং এককে এইসব প্রযুক্তির সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এমন কিছু কিছু আধুনিক প্রযুক্তি আছে প্রত্যক্ষভাবে যাদের সংস্পর্শে না এলেও তাদের সম্বন্ধে সংবদাপত্র বা পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হতে দেখি। কোন একদিন হয়তো আমরা জানতে পারলাম অর্ধ পরিবাহী, কম্পিউটার, রোবটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতির সম্বন্ধে, পরের দিনই আবার খবর বেরল লেজার, আলোকীয় তন্তু

কিংবা বস্তু-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে। আমরা কোটি কোটি মানুষ যে স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মার মহাকাশে সফল অভিযান প্রত্যক্ষ করেছি সেটা সম্ভব হয়েছে মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে। জৈব প্রযুক্তি বর্তমানে এক বহু আলোচিত তথা বহু বিতর্কিত বিষয়। ঠিক তেমনই হল বিভাজন প্রযুক্তি। যদি উন্নতির এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো এই শতাব্দীর শেষেই আমরা দেখতে পাব যে নিউক্লিয় শক্তির উৎস হিসাবে সংযোজন বিভাজনের স্থান দখল করে নিয়েছে।

২৭নং এককে আমরা জানতে পেরেছি যে আগামী দশ বা পনেরো বছর বা তারও কম সময়ের মধ্য সেই সমস্ত প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হবে যেগুলো এখন সৃষ্টির পথে। তাই এই পাঠের শেষের একটি অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে এই সমস্ত আগত প্রযুক্তির সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ধারণা দেওয়া যায়। আমরা আরও চেয়েছি এই সমস্ত প্রযুক্তির সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব, এদের সঠিক প্রয়োগ কীভাবে আমাদের সুবিধা এনে দিতে পারে আর এদের অপপ্রয়োগ কীভাবে বিপদের সৃষ্টি করতে পারে সেগুলি আপনাকে জানাতে এবং সে বিষয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করাতে যাতে করে প্রয়োজনে এই সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কিত কোন আলোচনায় আপনি সচেতনভাবে অংশ নিতে পারেন বা আলোচনাটিকে প্রভাবিত করতে পারেন। এই অংশে লেজার, আলোকীয় তন্তু, মহাকাশ প্রযুক্তি, নিউক্লিয় সংযোজন এবং বিভাজন আর জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৩০নং এককে অর্ধ-পরিবাহী, কম্পিউটার বিজ্ঞান, রোবটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তি এবং বস্তুবিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যা করতে পারবেন—

- যে সমস্ত ধর্মের জন্য লেজারের আলো সূর্যালোক, টিউব-লাইট বা অনুপ্রভনল, বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতি উৎস থেকে আগত আলো থেকে পৃথক, সেগুলির তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- আলোকীয় তন্তু কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশ-সন্ধানীর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিউক্লিয় সংযোজন, বিভাজন এবং নিউক্লিয় চুল্লির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জৈব প্রযুক্তি কী, সুপ্রজনন প্রযুক্তি এবং উৎসেচক নিশ্চলিকরণ কাকে বলে, এগুলি বিবৃত করতে পারবেন।
- এই অধ্যায়ে আলোচতি প্রযুক্তিগুলির প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারবেন।

২৯.২ লেজার : কাজে লাগার আলো

তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে তা জানতে ১০.১ চিত্র ও ১০.২ অংশ দেখুন

লেজার (Laser) শব্দের আক্ষরিক অর্থ উদ্দীপিত বিকিরণের নির্গমন দ্বারা আলোকের বিবর্ধন (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)। যদিও এটা একটি বেশ বড়ো শব্দের মালা তবুও আপনি কিন্তু এখানেই পড়া শেষ করে দেবেন না। আমরা যেটি বোঝাতে চাই সেটি হল লেজার এক বিশেষ ধরনের আলোর সৃষ্টি করতে পারে। লেজার কর্তৃক সৃষ্ট এই আলোর এমন কিছু কার্যকরী ধর্ম আছে যা একে সাধারণ আলো থেকে পৃথক করে রেখেছে। এইসব ধর্মের জন্য লেজারের আলোকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যায়। আপনি হয়তো ভাবছেন সাধারণ আলোর রশ্মির থেকে লেজার রশ্মির তফাত কোথায়। সূর্যালোক বা বাতি থেকে নির্গত আলোক আসলে অনেকগুলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর সমষ্টি। প্রত্যেক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন বর্ণের আলো সৃষ্টি করে। এই সব বর্ণের আলো সংমিশ্রিত হয়ে সাধারণ আলোকের সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই দেখেছি সূর্যের আলোর সাতটি রঙ

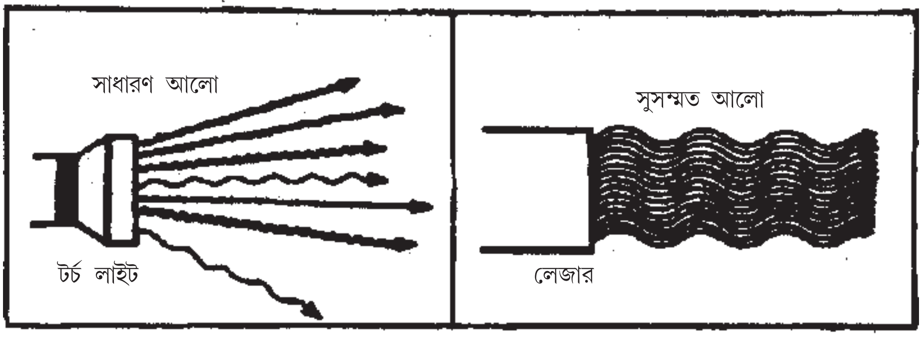

(ক) (খ)

চিত্র ২৯.১

পৃথক হয়ে গিয়ে বৃষ্টির পরে আকাশের গায়ে রামধনু তৈরি করে। আবার সাধারণ উৎস থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গগুলি তাদের গতিপথে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে মিশে থাকে।

লেজার রশ্মিতে একটিমাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেরই আলো থাকে। আর লেজার রশ্মির সমস্ত তরঙ্গগুলিই পরস্পর একই দশায় থাকে। লেজার রশ্মির এই ধর্মকে বলে সুসংগতি (Coherence)। এটি যেন প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সুসজ্জিত ছেলেমেয়েদের প্যারেডকে অথবা কেরলে ওনাম উৎসবে অনুষ্ঠিত নৌ প্রতিযোগিতায় নৌকাগুলির সমলয়ে দাঁড় চালানোকেই মনে করিয়ে দেয়, তাই না? এই সুসংগতি ধর্মের ফলে লেজার রশ্মির আলোক তরঙ্গগুলি খুব বেশি ছড়িয়ে না পড়ে অনেকটা পথ যেতে পারে। লেজার রশ্মি বেশি বিস্তৃত হয় না বলে লেজার রশ্মি কোন বস্তুর ওপর আপতিত হলে তার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে অনেক বেশি শক্তির সমাবেশ ঘটে।

২৯.২.১ লেজারের প্রয়োগ

লেজারের বিশেষ বিশেষ ধর্মের জন্য লেজার রশ্মিকে শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে লাগানো যায়। আমরা এর কিছু কিছু ব্যবহার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। অনেকটা শক্তি খুব বেশি পরিমাণে একত্রিত হওয়ার ফলে লেজার রশ্মি এমনকি ইস্পাতের পাতের ওপরও খুব তাড়াতাড়ি কয়েক মিলিমিটার ব্যাসের খুব ছোটো জায়গা পুড়িয়ে গর্ত করে দিতে পারে। লোহা কাটা বা ওয়েল্ডিং-এর চিরাচরিত যে কোনও পদ্ধতির চেয়ে লেজার রশ্মির ব্যবহার অনেক সুবিধাজনক। যে কোন ধরনের বস্তু—কাগজ, কাঠ, প্লাস্টিক বা কাপড় থেকে শুরু করে শক্ত ধাতু, সেরামিক বা কাঁচ কাটার কাজে লেজার রশ্মির ব্যবহার অনেক বেশি কার্যকর এবং সূক্ষ্মতা সম্পন্ন। ফলে লেজার শুধু এঞ্জিনীয়ারদের কাছেই নয়, ধাতু ও কাঠের কারিগর, দরজি, সবার কাছেই এক আদর্শ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

সামরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ : লেজারের পূর্ব বর্ণিত ধর্মগুলিকে মারাত্মকরকম সূক্ষ্মতার সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। বিশ্ব জোড়া যুদ্ধবিগ্রহে লেজারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। লেজার নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রকে সামগ্রিক ভাবে স্থল, জল এবং অন্তরীক্ষে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন এক্স-রশ্মির লেজারও সৃষ্টি করা হয়েছে। মহাকাশে স্থাপনযোগ্য উপগ্রহে মারাত্মক লেজার অস্ত্র বসাবার চেষ্টাও চলেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কলকারখানা, অরণ্য, খামারবাড়ি বা লোকালয় ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। মানব জাতির ধ্বংসের কারণে লেজার প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষের অসীম প্রচেষ্টা এবং সম্পদের ব্যবহার কিন্তু সত্য সত্যই একটা দুর্ভাবনার কারণ। প্রযুক্তির এই অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

লেজারের স্পর্শে রোগ নিরাময় : ওপরে বর্ণিত প্রয়োগ (বা অপপ্রয়োগ) এর সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রে লেজারের বিস্ময়কর কার্যকারিতার অমিল লক্ষ করুন। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে লেজার রশ্মির ব্যবহার প্রায় নির্ভুল ও যথাযথ।

এটি ক্ষতিগ্রস্ত কলাকে দহন করে কিন্তু ঠিক তার পাশের সুস্থ কলাকে নষ্ট করে না। এর সাহায্যে এতটুকু রক্তপাত না করেও জীবকলাগুলিকে কাটা যায় আবার জুড়েও দেওয়া যায়। লেজার সম্পূর্ণরূপে জীবানুরোধক কারণ ব্যাকটেরিয়া লেজার রশ্মিতে বাঁচতে পারে না। বর্তমানে লেজারকে চক্ষু চিকিৎসায় নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে— সরে যাওয়া রেটিনার চিকিৎসায় অথবা ডায়াবেটিক রোগীদের রেটিনায় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক রক্ত জালিকা নষ্ট করে দেবার জন্য। আগে এইসব রোগ অন্ধত্বের সৃষ্টি করত। সেইজন্য আজ এইসব রোগীদের কাছে লেজার সত্যই এক জাদুর আলো। ধীরে ধীরে লেজার কর্ণেন্দ্রিয়, চক্ষু এবং অন্যান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা আদর্শ অস্ত্র হয়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের টিউমার সারাতে, আলসার থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে এবং ব্লাডারের ক্যানসারের চিকিৎসায় লেজার বিশেষভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে (চিত্র ২৯.২)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে : দূর-সংযোগের ক্ষেত্রেও লেজার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চুলের মতো সূক্ষ্ম কাচ তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লেজার রশ্মি চিরাচরিত তামার তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ সংকেতের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি খবরাখবর বহন করতে পারে। একটি মাত্র তন্তুর সাহায্যে কয়েক হাজার টেলিফোন বার্তা প্রেরণ করা যায়।

অন্যান্য কাজে ব্যবহার : লেজার রশ্মির সাহায্যে দূরবর্তী বস্তুর দূরত্ব (যেমন পৃথিবী থেকে চাঁদের) নির্ণয় করা যায়। এখানে লেজার রশ্মি পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া আর প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার মোট সময় নির্ণয় করা হয়। আমরা জানি শূন্যে আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি. মি.। সুতরাং দূরত্ব = গতিবেগ × সময়, এই সরল সূত্রের সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডল দূষণকারী নগণ্য পরিমাণে উপস্থিত রাসায়নিকগুলিকে লেজারের সাহায্যে চিহ্নিত করতে পারেন কারণ এগুলি লেজারের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এবং তার থেকেই এগুলিকে ধরে ফেলা যায়। লেজার রশ্মির সাহায্যে শক্তি প্রেরণের চেষ্টাও চলছে। এই রশ্মির সাহায্যে শব্দ ও ভিডিয়ো চিত্র রেকর্ডিং করা সম্ভব হচ্ছে। এই রেকর্ডগুলি দেখতে সাধারণ গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। এই রেকর্ডগুলি পুনরায় লেজার রশ্মির সাহায্যে বাজানো যায় এবং এর ফলে এগুলি কোনও দিনই নষ্ট হয় না। বিজ্ঞানের যাদুঘরে গিয়ে বিভিন্ন বস্তুর যে সব হলোগ্রাম দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি আসলে লেজার কর্তৃক সৃষ্ট ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে লেজারকে সীমাহীনভাবে মানব কল্যাণে লাগানো যেতে পারে। এগুলি সবই বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সীমিত কল্পনাশক্তির ফলেই সীমাবদ্ধ। সেরা জিনিসটি এখনও বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়।

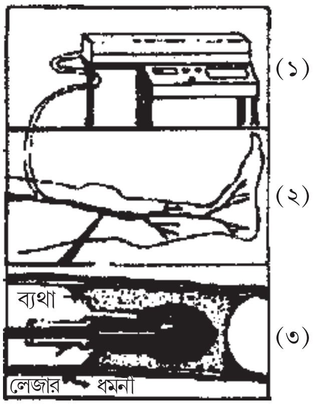

চিত্র ২৯.২ : আলোকীয় তত্ত্ব দ্বারা (২) বাহিত লেজার রশ্মির (১) সাহায্যে পায়ের ধমনীর মধ্যে ব্যথা দগ্ধ করা হচ্ছে (৩)।

চিত্র ২৯.২ :

অনুশীলনী ১

(ক) নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করে লেজার এবং তার কার্যকারিতা সম্বন্ধীয় নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন—

(i) লেজার হল এক বিশেষ ধরনের .... উৎস যার অসংখ্য কার্যকারিতা আছে।

(ii) লেজার রশ্মি .... দূর পর্যন্ত শক্তি বা .... বহন করতে পারে।

(iii) কোন লেজার রশ্মি অনেক বেশি .... শক্তি কোন বস্তুর প্রতি একক .... ওপর সমাবিষ্ট করতে পারে কারণ এটি .... হয় না।

সংকেত : আলোর, বিস্তৃত, পরিমাণ, সংকেত, অনেক, ক্ষেত্রফলের

(খ) এখানে লেজারের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। (ক) প্রশ্নটিতে বর্ণিত ধর্মের কোনগুলি এক্ষেত্রে কাজে লাগবে? প্রত্যেকটি কার্যকারিতার পাশে উপযুক্ত ধর্মটি বোঝাতে সংখ্যাগুলি লিখুন।

(১) পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। ....

(২) শিশুদের দুধ খাবার বোতলের মুখের ছিপিতে ছিদ্র করতে কাজে লাগে। ....

(৩) ক্ষেপণাস্ত্রকে মাটিতে নামিয়ে ফেলা যায়। ....

(৪) দূরভাষ সংকেত প্রেরণ করা যায়। ....

যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজারের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে মূলত তন্তু-আলোকবিদ্যার (Fibre Optics) অগ্রগতির ফলে। সুতরাং তন্তু-আলোকবিদ্যা কী এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

২৯.৩ তন্তু-আলোকবিদ্যা (Fibre Optics)

রেডিয়ো তরঙ্গ হচ্ছে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। ১০ নং এককের ১০.২ অংশ দ্রষ্টব্য।

ট্রানজিষ্টার রেডিয়োতে আমরা যে গান শুনি অথবা টেলিভিশনে আমরা যে ছবি দেখি তা রেডিয়ো তরঙ্গের দ্বারাই স্টুডিয়োর চার দেওয়ালের মধ্য থেকে আমাদের গৃহকোণ পর্যন্ত বাহিত হয়। অন্যদিকে দূরভাষ সংকেত তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে তামার পরিবাহী তারের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন তড়িৎ সংকেত আলোক তন্তুর সাহায্যে পাঠাবার জন্য নূতন প্রযুক্তির সৃষ্টি হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে আলোকীয়তন্তু প্রযুক্তির উন্নতির ফলে।

তন্তু-আলোকবিদ্যা হচ্ছে চুলের মতো সূক্ষ্ম কাচ, স্বচ্ছ প্লাস্টিক, নাইলন বা পলিস্টাইরিন, কোয়ার্জ প্রভৃতির তারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ প্রেরণের একটা পদ্ধতি।

এই তারগুলিকেই বলা হয় আলোকীয় তন্তু। আলোকীয় তন্তু বারবার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সাহায্যে নিজের নিজের দৈর্ঘ্য বরাবর আলোক তরঙ্গ বহন করে নিয়ে যায় (চিত্র ২৯.৩ দ্রষ্টব্য) আমরা এই পদ্ধতির বিশদ আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখছি যে এই পদ্ধতিতে তন্তুটি সোজা বা বাঁকা, যাই হোক না কেন, আলোক রশ্মি তন্তুর একদিকে আপতিত হয়ে প্রাবল্য অপরিবর্তিত রেখে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

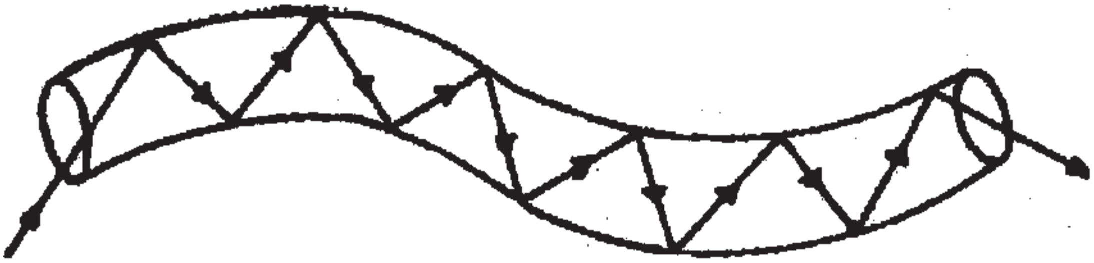

চিত্র ২৯.৩ : আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে আলোকের সঞ্চালন।

২৯.৩.১ আলোকীয় তন্তুর প্রয়োগ

চিকিৎসা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে তন্তু আলোকবিদ্যার যে সব কার্যকারিতা আছে এখানে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব। চিরাচরিত প্রযুক্তি অপেক্ষা এই প্রযুক্তি অনুসরণের সুবিধার বিষয়েও আলোচনা করা হবে।

অপ্রবেশ্য স্থানের পর্যবেক্ষণ : আলোকীয় তন্তু দিয়ে নির্মিত এন্ডোস্কোপ যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে আজকাল পাকস্থলী বা শ্বাসনালির অভ্যন্তর প্রভৃতি মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাগুলিকে নিরীক্ষণ করা যায়। শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তন্তুগুলির কোন কোনটি আলো বহন করে, যার ফলে ভিতরের সেই অঙ্গাগুলি আলোকিত হয়। অন্য তন্তুগুলি আলো ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করে যাতে অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি বাইরের পর্যবেক্ষকের সামনে ফুটে ওঠে। সাধারণত এন্ডোস্কোপ টেলিভিশন মনিটর বা ক্যামেরার সঙ্গো যুক্ত করা হয়। যেহেতু তন্তুগুলি খুবই সরু সেইজন্য সহজেই এগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করান যায়। এইভাবে প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবি হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এবং আরও কিছু রোগ নির্ণয়ে অত্যন্ত কার্যকর।

টেলিযোগাযোগের তারে ভিড় কমানো : টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তুর ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক। কথাবার্তা, পাঠ্য বিষয়, কম্পিউটারের তথ্য বা ছবি সম্প্রেরণের সংকেতগুলির লেজার রশ্মির ওপর সমাপতিত করা হয়। এরপর নিয়ন্ত্রিত লেজার রশ্মিগুলি আলোকীয় তন্তু দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন প্রান্তে যায় এবং সেখানে গৃহীত হয়। এর ফলে গ্রাহক প্রান্তে কথা শোনা, তথ্য পাঠ বা ছবিগুলি দেখা সম্ভব হয় (চিত্র ২৯.৪)।

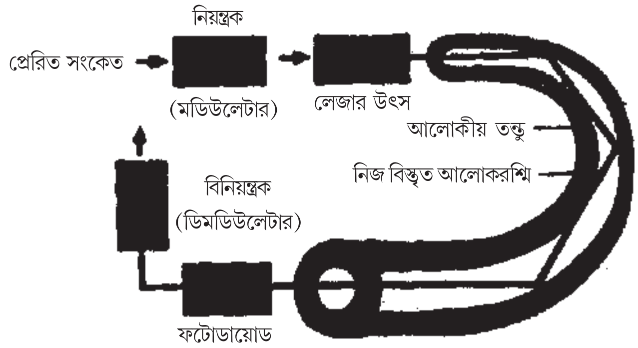

চিত্র ২৯.৪ : টেলিফোন আদানপ্রদানের সংযোগ হিসাবে আলোকীয় তন্তুর কাজ। লেজার রশ্মি সংকেত বহন করে তন্তুর একপ্রান্তের ওপর এসে পড়ে ও অপর প্রান্ত থেকে নির্গত হয়। একটি ফটোডায়োড আলোক রশ্মিকে তড়িৎপ্রবাহে পরিণত করে। ডিমডিউলেটার মূল সংকেতকে পুনরুদ্ধার করে।

আলোকতরঙ্গের সংকেত বহন ক্ষমতা রেডিয়ো তরঙ্গ বা তামার তারে প্রবাহিত তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে, তন্তুর মধ্যে প্রবাহিত আলোক তরঙ্গ হাজার হাজার বিভিন্ন সংকেত বহন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেখানে তামার তার একসঙ্গে ২৪টির বেশি টেলিফোন কল নিতে পারে না সেখানে একজোড়া কাচের তন্তু একসঙ্গে ১৩০০ টেলিফোন কল নিতে পারে।

আলোকীয় তন্তুর মাধ্যমে লেজার রশ্মির ব্যবহার বহু দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠাতে সাহায্য করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) এবং যুক্তরাজ্যের (U.K.) মধ্যে যোগাযোগের জন্য আন্তর্মহাদেশীয় আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া সাগরতলের আলোকীয় তন্তুর কেবল এখনই ব্যবহার করা হচ্ছে। অ্যান্টেনার পরিবর্তে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলি আলোকীয় তন্তু নির্মিত কেবলের সাহায্যেও প্রেরণ করা সম্ভব। এর ফলে কেবল টিভি অনেকগুলি চ্যানেল দর্শকদের এনে দিতে পারছে। ভারতীয় গবেষণাগালগুলি ইতিমধ্যেই বিশেষ ধরনর কাচ ও তার থেকে তন্তু তৈরি এবং যাতে সবথেকে কম অপচয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় সেইজন্য এই তন্তুতে একটা বিশেষ আবরণ লাগাবার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। বর্তমানে ভারতে আলোকীয় তন্তুর ব্যবহার বহুপ্রচলিত হয়েছে। কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থাতেই ইতিমধ্যে ২৮০ কিলোমিটার আলোকীয় তন্তুর কেব্‌ল্ বসানো হয়েছে।

চিরাচরিত প্রযুক্তির তুলনায় আলেকীয় তন্তু প্রযুক্তির অনেকগুলি সুবিধা আছে। একটা সাধারণ বিদ্যুতের তারের আকারের আলোকীয় তন্তু নির্মিত কেব্‌ল্ তার থেকে শত শত গুণ মোটা তামার তারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। আলোকীয় তন্তু অত্যন্ত হালকা এবং শক্ত সমর্থ। তথ্য পরিবহণ ক্ষমতার বিচারে তামার তারের চেয়ে এর দাম অনেক কম। নিকটবর্তী স্থানে বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য মাঝে মাঝে রেডিয়োতে যে গোলযোগ বা ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যায় আলোকীয় তন্তুগুলি আলোক রশ্মি পরিবহণ করে বলে সেইরকম গোলযোগ থেকে মুক্ত। সামরিক ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তুর সাহায্যে যোগাযোগ অনেক বেশি সুবিধাজনক কেননা এই ব্যবস্থায় প্রেরিত বার্তাকে জ্যাম করা যায় না। (একই সঙ্গে সমকম্পাঙ্কের রেডিয়ো-তরঙ্গ পাঠিয়ে রেডিয়ো তরঙ্গে প্রেরিত বার্তাগুলি নষ্ট করে দেওয়া যায়—একেই জ্যাম করা বলে)।

এমন একটা দিন আসতে পারে যখন আলোকীয় তন্তু নির্মিত কেব্‌ল্ আমাদের অনেকের বাড়িতেই ঢুকে পড়বে এবং শুধু টেলিফোন কলই নয়, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, কম্পিউটার থেকে সংযোগ এবং ইলেকট্রনিক মেল পাঠানোর কাজেও লাগবে।

অনুশীলনী ২

(ক) আলোকীয় তন্তু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির (i) থেকে (vii) মধ্যে থেকে তিনটি শুদ্ধ বক্তব্য চিহ্নিত করুন এবং নীচে লিখুন—

আলোকীয় তন্তু

(i) চুলের মতো সূক্ষ্ম, ফাঁপা ও স্বচ্ছ তার যার মধ্য দিয়ে আলো পরিবাহিত হয়।

(ii) নিরেট চুলের মতো সরু স্বচ্ছ তার, যা রেডিয়ো তরঙ্গ পরিবহণ করে।

(iii) নিরেট চুলের মতো সরু স্বচ্ছ তার, যা আলো পরিবহণ করে।

(iv) কাচ, কোয়ার্জ বা পলিস্টাইরিনের মতো স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি।

(v) নিকটবর্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণে ব্যবহৃত হয়।

(vi) একসঙ্গে অনেক তথ্য পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা যায়।

(vii) তামার তারের চেয়ে বেশি ব্যয় সাপেক্ষ।

(খ) নীচে আলোকীয় তন্তু সম্বন্ধে একটু আগেই যা শিখেছেন তার সারাংশ দেওয়া হল। সংকেতে দেওয়া শব্দগুলির মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

আলোকীয় তন্তু বিদ্যা এমন একটি প্রযুক্তি যা সংবাদ পাঠাবার একটা পথ করে দিয়েছে। এই পদ্ধতিতে সংবাদ .... দ্বারা বাহিত হয়। যে কাচের তারের মধ্য দিয়ে আলোকের পরিবহণ ঘটে তাকে .... বলে। .... এবং .... এর তুলনায় আলোকীয় তন্তুর কেব্‌ল্ .... এবং কোন রকম অপচয় বা গোলযোগ ব্যাতিরেকে অনেক বেশি বার্তা বহন করতে পারে। আলোকীয় তন্তু যে উপাদান থেকে তৈরি হয় তা অপেক্ষাকৃত ....।

সংকেত : আলোকীয় তন্তু, তড়িৎ প্রবাহ, হালকা, আলোক তরঙ্গ, রেডিয়ো তরঙ্গ, সুলভ।

আপনি এতক্ষণ লেজার এবং আলোকীয় তন্তুবিদ্যা সম্বন্ধে পড়লেন। এখন আমরা মহাকাশ প্রযুক্তি, যাকে বর্তমান যুগের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বলা যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

২৯.৪ মহাকাশ প্রযুক্তি (Space Technology)

চাঁদের যে শুকনো সমতল জমিটিকে শান্তি সাগর (Sea of Tranquility) বলা হয় তার ওপর একটি পদচিহ্ন আঁকা হয়েছে। এই পদচিহ্নটি এঁকে রেখে এসেছেন নীল আর্মষ্ট্রং। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের মাটিতে হাঁটাচলা করেন। ১৯৬৯ সালের ১১ই জুলাই অ্যাপোলো-১১ নামে আমেরিকান মহাকাশযানে চেপে চাঁদে পাড়ি দেওয়া তিনজনের অভিযাত্রী দলের তিনি ছিলেন একজন সদস্য।

মানুষের একটা স্বপ্ন সেদিন সফল হয়েছিল। স্বপ্নটি ছিল মহাকাশে পাড়ি দেবার আর মহাবিশ্বের আরও একটা জগতে পৌঁছাবার। তারপর থেকে মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রকেট উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।

রকেট বা উৎক্ষেপনযান : প্রত্যেক মহাকাশযাত্রাই রকেট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকে। রকেট উপগ্রহ অথবা মানুষ এবং যন্ত্রপাতি বহনকারী মহাকাশযানকে মহাশূন্যে তুলে দিতে পারে। সেইজন্যই একে উৎক্ষেপনযানও বলা হয়ে থাকে। মানুষের কাছে রকেট বহুদিন ধরেই পরিচিত। আমাদের দেশের উৎসব অনুষ্ঠানে বাজি হিসাবে রকেটের ব্যবহার খুবই পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু মহাকাশযান পাঠাতে যে রকেট প্রয়োজন হয় সেটা অনেক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এবং সেটা অনেক বেশি শক্তিশালী।

রকেটের জ্বালানি যখন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন এর পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে উত্তপ্ত গ্যাস প্রচণ্ড গতিতে বেরোতে থাকে (চিত্র ২৯.৫ দ্রষ্টব্য)। গ্যাসের এই সম্মুখ গতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রকেট বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রকেটের জ্বালানির দহন চলতে থাকে এবং তার ফলে গ্যাসের নির্গমন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রকেটের বেগ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেটি প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করে। তবে পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি মাত্র রকেট কখনও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা বা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যাবার মতো গতিবেগ লাভ করতে পারে না। অধিকতর গতিবেগ পাবার জন্য উৎক্ষেপযানে পর্যায়ক্রমে বড়ো এবং ছোটো রকেট ব্যবহার করা হয়। বড়ো রকেট যখন

মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হয় এবং সমস্ত জ্বালানি খরচ করে ফেলে তখন সেটি ছোটো রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং নীচে পড়ে যায়। প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান ছোটো রকেটটিকে তখন জ্বালানো হয় এর গতিবেগ আরও বাড়াবার জন্য। মহাকাশে প্রয়োজনীয় গতিবেগ পাবার জন্য সাধারণত ত্রি-পর্যায়ী রকেট ব্যবহার করা হয় (চিত্র ২৯.৬ দ্রষ্টব্য)। উৎক্ষেপন যানটির শেষ পর্যায়ে থাকে সওয়ারী বা পে-লোড (Pay-load)।

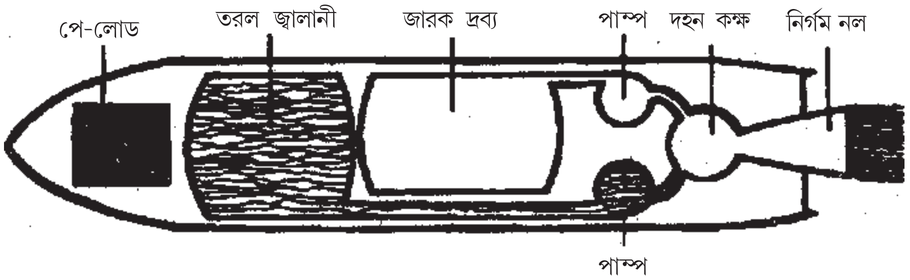

চিত্র ২৯.৫ : তরল জ্বালানী চালিত রকেটের ছেদচিত্র। জ্বালানী ও জারক পদার্থকে পাম্পের সাহায্যে দহনকক্ষে চালিত করা হয়।

চিত্র ২৯.৬ : বহু পর্যায়ী ভারতীয় রকেট এএসএলভি

করে দেখুন : মুখখোলা একটি ফোলানো বেলুন ছেড়ে রকেটের গতিবেগের সত্যতা প্রতিপন্ন করুন। রকেট যেসব বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র মহাকাশে বহন করে নিয়ে যায় তার মধ্যে আছে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং নিকটবর্তী জ্যোতিষ্কে পাঠানো মহাকাশের তথ্য সন্ধানী মহাকাশযান। কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানগুলি নিজেরাই যোগাযোগ এবং গবেষণামূলক নানা যন্ত্রপাতি বহন করে।

কৃত্রিম উপগ্রহ—আকাশের বুকে অক্লান্ত সেবক

যে মহাকাশযানগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিক পরিক্রমণ করে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ। বেশিরভাগ উপগ্রহই কয়েকশত কিলোমিটার উচ্চতায় মোটামুটি ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। উপযক্ত গতিবেগের সাহায্যে উপগ্রহগুলিকে আরও ওপরে (প্রায় ৩৬,০০০ কি. মি. উপরে) তোলা যায়। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তাদের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা এবং সেই জন্য মনে হয় তারা যেন স্থির হয়ে আছে। এই ধরনের উপগ্রহগুলিকে ভূস্থির উপগ্রহ (Geostationary satellites) বলে।

২৬নং এককে আমরা দেখেছি যে আমাদের ইনস্যাট উপগ্রহগুলি ভূস্থির উপগ্রহ। প্রতি রাতে দূরদর্শনের খবর শেষ হবার মুখে ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের একটা ছবি আমাদের দেখানো হয়। ইনস্যাট উপগ্রহই এই ছবিগুলি তোলে এবং পৃথিবীতে পাঠায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া ছাড়াও ইনস্যাট উপগ্রহ দূরভাষ সংকেত গ্রহণ করে এবং পুনঃপ্রেরণ করে। দূরদর্শনের অনুষ্ঠানও ইনস্যাট উপগ্রহের সাহায্যেই প্রচারিত হয়।

উপগ্রহগুলি পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ এবং আবহাওয়ার ওপর লক্ষ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বহন করে। ভারতের উপগ্রহ-কর্মসূচি কৃষি জমি এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর এনে দিয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি IRS (ভারতীয় দূর-সংবেদী উপগ্রহ—Indian Remote Sensing Satellite) উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে যাতে দূর-সংবেদন পদ্ধতিতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জানা যায়।

মহাকাশে বাস করলে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটিও উপগ্রহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। 'স্যালুট' নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি মহাকাশ গবেষণাগার উপগ্রহ হিসাবে বহুদিন ধ'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে। এগুলিতে বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করেছেন—গবেষণাগারের কর্মী এবং তাদের রসদপত্র নিয়মিতভাবে গবেষণাগারে পাঠানো হত। উপগ্রহগুলি দূষণের উৎস নির্দিষ্ট করতে পারে, দাবানল খুঁজে বার করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও বনাঞ্চলের রোগাক্রান্ত জায়গা চিহ্নিত করতে পারে। উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার ওপর নজর রাখা যায় যার ফলে ঝড়ের পূর্বাভাষ দিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উপগ্রহগুলির সাহায্যে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় এবং সেগুলিকে পথ দেখানো সম্ভব। কিন্তু উপগ্রহগুলিকে সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজে।

মহাকাশ সন্ধানী—প্রতিবেশী গ্রহসমূহে ভ্রমণ :

যদি কোন মহাকাশযানকে পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাকাশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে বলে মহাকাশ সন্ধানী। ১১নং এককে আমরা দেখেছি এই রকম মানববিহীন অনেক যান বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহকে হয় ছাড়িয়ে চলে গেছে অথবা এইগুলিতে অবতরণ করেছে। তারা এইসব গ্রহের মূল্যবান সব চিত্র ও তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সে সব থেকে আমরা জানতে পেরেছি এসব গ্রহকে নিকট থেকে দেখতে কেমন লাগে, এরা কী উপাদান দ্বারা গঠিত এবং এদের ভৌত পরিবেশ কেমন।

অনুশীলনী ৩

(ক) ইনস্যাট-১বি হচ্ছে একটি ভূস্থির উপগ্রহ। ইনস্যাট-১বি সম্বন্ধে লিখিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলির মধ্যে কোন্ দুইটি সঠিক? সঠিক উত্তরের পাশে 'ঠিক' এই কথাটি লিখুন।

(i) এটি পৃথিবীর চারপাশে প্রায় ৪০০ কি. মি. ওপর দিয়ে ঘোরে ....।

(ii) এটি চাঁদকে ঘিরে ২৪ ঘণ্টায় দুটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে ....।

(iii) এটিকে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা যায় ....।

(iv) ইনস্যাট-১বি-তে গাছপালার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে ....।

(v) এটি প্রতিবেশী গ্রহগুলি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে ....।

(vi) এটি ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ....।

(খ) নীচে বর্ণিত মহাকাশযানগুলির মধ্যে কোনটি রকেট, কোনটি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং কোনটি মহাকাশ সন্ধানী তা নীচের শূন্যস্থানে লিখুন।

(i) ইনস্যাট দূরদর্শনে পৃথিবীর যে কোন ঘটনা ফুটিয়ে তোলে ....।

(ii) পাইওনীয়ার নামক মহাকাশযান সর্বপ্রথম বৃহস্পতি গ্রহের ছবি পৃথিবীতে পাঠায় ....।

(iii) স্যাটার্ন-৫ মনুষ্যবাহী অ্যাপোলো মহাকাশযানটিকে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার কক্ষপথে স্থাপন করেছে ....।

২৯.৪.১ মহাকাশচর্চার মুনাফা

মহাকাশ গবেষণা প্রকল্প যখন সর্বপ্রথম চালু হয় তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা, দুঃসাহসিক অভিযান এবং জাতীয় মর্যাদা। এই প্রকল্প যত সম্প্রসারিত হয়েছে ততই এতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও বেড়েছে। এখন এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে এটা কীভাবে মানবজাতির কল্যাণসাধন করে।

মহাকাশ প্রকল্প থেকে অনেক উপকার পাওয়া গেছে। মহাকাশ ভ্রমণের নানা জটিল সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ নানারকম নূতন নূতন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই আবিষ্কারগুলি পৃথিবীর পক্ষে সমানভাবে উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিল্পের ব্যবহারের প্রয়োজনে নূতন নূতন উপাদানের আবিষ্কার যেমন হালকা অথচ দৃঢ় ধাতু-সংকর, উন্নত ধরনের ইস্পাত, প্লাস্টিক এবং আঠা জাতীয় জিনিস, মহাকাশযানের জন্য নির্মিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং অতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ যেগুলো এখন টি. ভি. এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। কম্পিউটারগুলি হয়ে উঠেছে আরও বেশি আঁটোসাটো। মহাকাশচারীদের জন্য তৈরি চিকিৎসার সরঞ্জামগুলি এখন হাসপাতালেও ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্য সংরক্ষণের নূতন প্রযুক্তিগুলি শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করছে। অতি সংবেদনশীল অগ্নি সতর্ককারী যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক বস্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তালিকাটি খুবই দীর্ঘ। এর সঙ্গে যদি আবার উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি যোগ করা হয় যথা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, খনিজদ্রব্য অনুসন্ধান অথবা দূর-সংযোগ, তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই অসাধারণ হয়ে ওঠে। ২৬ নং এককে আমরা দেখেছি উপগ্রহগুলিকে শুধু খবরাখবর বা দূর-সংযোগের ক্ষেত্রেই নয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়। অল্প কিছু জায়গা থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান দূরবর্তী এবং দুরধিগম্য স্থানের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বর্তমানে ইনস্যাট উপগ্রহ দূরদর্শনকে ভারতের সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছে।

তবে অন্যান্য সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো মহাকাশ প্রযুক্তিরও অপপ্রয়োগ হতে পারে। মহাকাশে পরমাণু বোমা, লেজার যন্ত্র বা অন্যান্য সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের মতো ক্ষতিকারক বিষয়ের প্রয়োজনে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে।

মহাকাশযাত্রাকে একটু অন্যভাবে দেখলে যুদ্ধোন্মাদনার অসারতার ব্যাপারটি খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে। মহাকাশে ভ্রমণ মানুষের মনে তার ঘর বা নিজের গ্রহ পৃথিবী সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবনার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী একটি সুন্দর, বর্ণময়, গতিময় এবং জীবন্ত গ্রহ বলে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের গ্রহটি একটি আবদ্ধ বস্তুতন্ত্র যা শক্তির জন্য কেবলমাত্র সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। এর প্রাকৃতিক সম্পদও সীমিত, যা খরচ হয়ে গেলে আর পূরণ করা সম্ভব নয়। এটি নিজেই একটি মহাকাশযান, ভঙ্গুর এবং বিরাট মহাবিশ্বের মধ্যে একা যেন প্রাণের একটি বহুমূল্য স্পন্দন। সত্যই পৃথিবী গ্রহটিকে একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ হিসাবে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের একটাই মাত্র পৃথিবী; কাজেই লোভ অথবা অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পৃথিবীর ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারে তাদের হাত থেকে একে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

নিউক্লিয় বিভাজন এবং সংযোজন প্রযুক্তি হচ্ছে সেই রকম আর একটি প্রযুক্তি যাকে ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা যায়। অবশ্য বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠা শক্তিশালী জনমত এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে মুক্ত রাখার জন্য কাজ করেছে। এখন এই প্রযুক্তিটির পর্যালোচনা করে এর উপযোগিতার দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

২৯.৫ বিভাজন এবং সংযোজন শক্তি

“ইতালীয় নাবিক নতুন জগতে পদার্পণ করেছেন।” এই সাংকেতিক বাক্যটিই ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর পরমাণু যুগের সূচনা করেছে। নাবিকটি হলেন ইতালীয়-আমেরিকান পদার্থবিদ, এনরিকো ফারমি (Enrico Fermi)। ওই দিনই বিকেলে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের এক স্কোয়াশ কোর্টে ফারমি আর তার সহযোগী বিজ্ঞানীরা প্রথম পরমাণুকে পোষ মানাতে সক্ষম হলেন। প্রথম পরমাণু চুল্লির ভিতরে শক্তি উৎপাদন করতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণু বিভাজন ঘটানো হল। ফারমি সত্যই এক নূতন যুগের সূচনা করলেন। এখনকার সারা পৃথিবী জুড়ে গড়ে ওঠা বিরাট বিরাট পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বা উদ্ভাবিত পারমাণবিক অস্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই এই আবিষ্কার আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে।

২৯.৫.১ নিউক্লীয় বিভাজন : পরমাণুর ভাঙন

আমরা জানি পরিমাণু গঠিত হয় একটি নিউক্লিয়াস আর তার চারপাশে পরিক্রমারত ইলেকট্রনগুলো নিয়ে। নিউক্লিয়াসটি আবার প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত। বিভাজন নাটকের প্রধান কলাকার হচ্ছে ইউরেনিয়াম পরমাণু। ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর নিউক্লিয়াসে ৯২টি প্রোটন আর ১৪৬টি নিউট্রন আছে। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের প্রতি ১৪০টি পরমাণুর মধ্যে একটির নিউক্লিয়াসে আছে ১৪৩টি নিউট্রন। একে ইউরেনিয়াম-২৩৫ বলা হয়। এই ইউরেনিয়াম-২৩৫ই নিউক্লীয় চুল্লির প্রধান জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুজন জার্মান বৈজ্ঞানিক দেখালেন যদি ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয় তাহলে পরমাণুটি ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং আরও নিউট্রন উৎপন্ন করে। একেই নিউক্লীয় বিভাজন বলে (চিত্র ২৯.৭ক)।

শক্তির উৎপাদন :

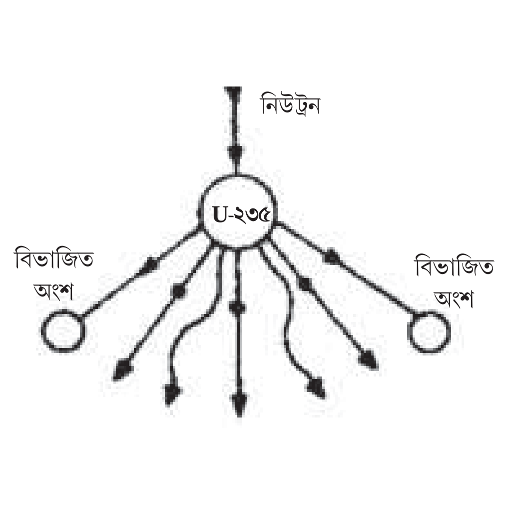

(ক) নিউক্লীয় বিভাজন

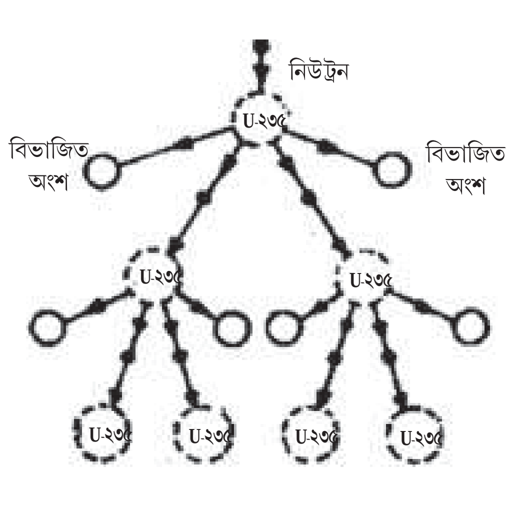

(খ) শৃঙ্খল বিক্রিয়া

চিত্র ২৯.৭ :

যখন পরমাণুর বিভাজন ঘটে তখন বিভাজনে উৎপন্ন নিউক্লিয়াস এবং নিউট্রনগুলির মোট ভর মূল পরমাণুর ভরের চেয়ে কম হয়। ভরের একটি ক্ষুদ্র অংশ যেন অদৃশ্য হয় এবং সেই ভরটুকু শক্তিতে পরিণত হয়। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ থেকে লয়প্রাপ্ত ভর m থেকে উৎপন্ন শক্তি E এর মান পাওয়া যায় যেখানে c হচ্ছে শূন্য আলোকের গতিবেগ। c-এর মান বিশাল (প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার/সেকেন্ড) এবং c^2-এর মান অত্যন্ত বেশি (প্রায় ৯ হাজার কোটি কিমি^{2}/সেকেন্ড^2) ফলে ভরের অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও এক অত্যন্ত বিশাল পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

শৃঙ্খল বিক্রিয়া

যখন একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় তখন শুধু শক্তিই নয়, আরও দুটি কী তিনটি নিউট্রনও উৎপন্ন হয়। এই নতুন নিউট্রনগুলি আবার দু-তিনটি পরমাণুকে ভেঙে দিতে পারে। ফলে তারা আরও শক্তি এবং আরও নিউট্রনের সৃষ্টি করে যারা আরও বেশি পরমাণু ভাঙে। এককথায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন একবার শুরু হলে প্রক্রিয়াটি নিজে নিজেই চলতে থাকে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে (চিত্র ২৯.৭খ দ্রষ্টব্য)। যদি এই শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে চলতে দেওয়া হয় তবে একসময় শক্তির বিস্ফোরণ ঘটবে। অতিরিক্ত নিউট্রনগুলিকে বের করে নিয়ে এই বিক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ করেই পরমাণু চুল্লি পাওয়া যায়। এটা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতোই শক্তির এক উৎস হিসাবে কাজ করে। এবারে আমরা পরমাণু চুল্লি নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী ৪

(ক) নীচের বাক্সগুলির মধ্যে নিউক্লীয় বিভাজন সম্পর্কিত তথ্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল লিখুন। (ঠিক হলে '✓' আর ভুল হলে '×' চিহ্ন দিন।)

(i) নিউক্লিয় বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি বড়ো নিউক্লিয়াস ভেঙে গিয়ে দুটি ছোটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। ☐

(ii) উৎপন্ন নিউক্লিয়াস ও অন্য কণাগুলির মোট ভর মূল নিউক্লিয়াসের ভরের একেবারে সমান। ☐

(iii) যখন একটি নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় তখন একমাত্র শক্তি ছাড়া আর কিছু নির্গত হয় না। ☐

(iv) নিউক্লিয়াস বিভাজন প্রক্রিয়ায় সামান্য ভর লয়প্রাপ্ত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। ☐

(v) উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ খুব বেশি হয় কারণ এটি আলোর গতিবেগের বর্গের ওপর নির্ভর করে। ☐

(খ) নিম্নে ২৯.৭ (খ) চিত্রে প্রদর্শিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ার পরবর্তী ধাপটি এঁকে দেখান।

২৫.৫.২ পরমাণু চুল্লি (Nuclear Reactor)

নিউক্লীয় বিভাজনকে পরমাণু চুল্লিতে নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া হিসাবে পরিচালিত করে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

ফারমি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে নিউক্লীয় বিভাজন ঘটাতে ধীর গতির নিউট্রন দ্রুতগতির নিউট্রনের চেয়ে বেশি কার্যকর। কিন্তু নিউক্লীয় বিভাজনে উৎপন্ন নিউট্রনগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতি। তাই এদের গতি কমানোর একটা উপায় খুঁজতে হল। দেখা গেল কিছু কিছু পদার্থ নিউট্রনগুলির গতি হ্রাস করে দেয় যেমন বিশুদ্ধ কার্বনের একটা রূপভেদ গ্রাফাইট। এদের বলা হয় মডারেটর। পেনসিলে যে কাল সিসা ব্যবহার করা হয় তা আসলে গ্রাফাইট। ভুলবশত সেটাকে সীসা বলা হয়।

তা সত্ত্বেও এই শৃঙ্খল বিক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থাৎ একে ইচ্ছামতো চালানোর বা থামানোর সমস্যা রয়েই গেল। যে সমস্ত পদার্থ নিউট্রন শোষণ করে সেগুলি বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কেননা তাদের ব্যবহার করা হলে শোষিত নিউট্রনগুলি আর কোন নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে পারবে না। নিউট্রন শোষক হিসাবে সাধারণত ক্যাডমিয়াম বা বোরন ষ্টিল ব্যবহার করা হয়।

পরমাণু চুল্লিতে [চিত্র ২৯.৮ (ক)] গ্রাফাইটের বিরাট একটা ব্লকের মধ্যে গর্ত করে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর দণ্ডাকৃতি আধারে প্রবেশ করানো হয়। গ্রাফাইট নিউট্রনগুলির গতি হ্রাস করে শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে বর্ধিত করে। গ্রাফাইটের ব্লকের ভিতরে ক্যাডমিয়ামের নিয়ন্ত্রক দণ্ডও প্রবেশ করানো হয়। এগুলি নিউট্রন শোষণ ক'রে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলিকে যত বার করে নেওয়া হয় তত কম নিউট্রন শোষিত হয় এবং বিক্রিয়াও তত ত্বরান্বিত হয়। উৎপন্ন তাপ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য জল বা তরল সোডিয়াম প্রবাহিত করা হয় যাতে সেগুলি গ্রাফাইট ব্লকে উৎপন্ন তাপ শোষণ করতে পারে। এই তাপের সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং ওই বাষ্প টারবাইন (হেলানো পাখা লাগানো চক্র) ও তার সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘুরিয়ে তড়িৎ উৎপন্ন করে।

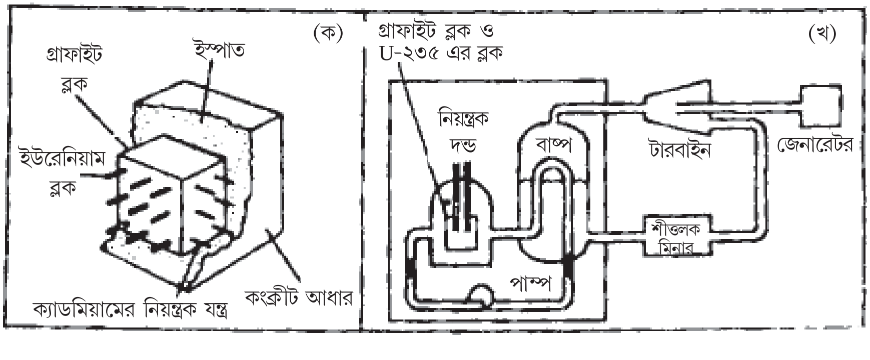

চিত্র ২৯.৮ : (ক) বেশিরভাগ পরমাণু চুল্লিতে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। (খ) ওই বাষ্প টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর চালায়। বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

ভারতে এখন প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট* পর্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন উৎপাদক চুল্লি আছে। যে সব ছোটো ছোটো চুল্লি ১ থেকে ৫ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে পারে সেগুলি প্রধানত গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। বড়ো বড়ো চুল্লি বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ডুবোজাহাজ বা জাহাজ চালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। চুল্লিতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম দণ্ড থেকে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নামে আরও একটি বিভাজনক্ষম বস্তু পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার্য চুল্লিটি

*(1 মেগাওয়াট = দশ লক্ষ ওয়াট। ওয়াট হল ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন শক্তির একক।)

একটি বোমা তৈরির উপাদানের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষ পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে লাগাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অনুশীলনী ৫

নীচে যে জায়গা দেওয়া আছে সেখানে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

(ক) পরমাণু চুল্লিতে গ্রাফাইটের বিরাট ব্লক কী উদ্দেশ্য সাধন করে?

....

....

....

(খ) নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়ার হার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়?

....

....

....

পরমাণু বিশ্বের অনিশ্চয়তা :

পূর্বে বর্ণিত চিত্রটি উজ্জ্বল এবং আশাব্যঞ্জক হলেও এর একটা অন্ধকার দিকও আছে। নিউক্লিয় বিভাজন থেকে উৎপন্ন শক্তি কাজে লাগানোর অনেকগুলি বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই সব ঝুঁকির কারণে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক, মতভেদ এবং ভয় দানা বেঁধে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে মাঝে মাঝেই নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেমন কিছুদিন আগে ১৯৮৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার চের্নোবিল পরমাণু কেন্দ্রে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কদাচিৎ ঘটলেও এই সমস্ত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত পরমাণু কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ারও দাবী উঠেছে, যদিও অতীতের ঘটনাবলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে এটাই সমাধানের পথ নয়। পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়টি আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখা, দুর্ঘটনা এড়ানোর ও তার ফলে ক্ষতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখার পন্থা উদ্ভাবন করাটাই উপযুক্ত সমাধান বলে মনে হয়। ভারতবর্ষেও এই নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে তবে নানান সতর্কতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই পদ্ধতিতে ১০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল নিউক্লিয় চুল্লিতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম দণ্ড থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন। পৃথিবীর সর্বত্রই নানা ভাবে এই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা চলেছে, যেমন মাটির নীচে বা মহাসাগরের তলদেশে হাজার হাজার ফুট গভীরে এগুলি পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। কিছু পাশ্চাত্য রাষ্ট্র এইসব অত্যন্ত ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নাকি আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতেও এনে ফেলেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

খনি থেকে আকরিক তোলা থেকে শুরু করে নিউক্লিয় বর্জ্য পদার্থের নিকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই ঝুঁকি আছে। তবে প্রতিটি পদে ঝুঁকি এবং সুবিধা, দুটি নির্ভর করে যান্ত্রিক গোলযোগ ও মানুষের ভুলভ্রান্তির ওপর কতটা কড়া নজর রাখা যাবে তার ওপর। এর বিপদের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে কত বেশি উপকারে লাগানো যায়, সেটাই দেখবার বিষয়।

২৯.৫.৩ নিউক্লিয় সংযোজন : শক্তির চরম উৎস

জ্বালানির জন্য হন্যে হয়ে ওঠা পৃথিবী সূর্য আর নক্ষত্রের ক্ষমতার জ্যোতির দিকে ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে থাকে। এই ক্ষমতা অবশ্য অন্য একটি নিউক্লিয় প্রক্রিয়া থেকে পাওয়া যায়, যার নাম নিউক্লিয় সংযোজন। দুটি হালকা পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে বা পরস্পর মিশে গিয়ে যখন একটি পরমাণু গঠন করে তখন তাকে নিউক্লিয় সংযোজন বলা হয়।

চিত্র ২৯.৯ : নিউক্লিয়ার সংযোজন প্রক্রিয়ার কাল্পনিক চিত্র।

২৯.৯ চিত্রে সবচেয়ে সরল একটি সংযোজন বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ভারী হাইড্রোজেনের (ডিউটেরিয়াম) দুটি নিউক্লিয়াসও সংযোজিত হয়ে হিলিয়ামের একটি নিউক্লিয়াস ও শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় প্রভূত পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হতে পারে।

আধ কিলোগ্রাম ডিউটেরিয়াম গ্যাস থেকে উৎপন্ন শক্তি প্রায় ৩০০টন কয়লার থেকে প্রাপ্ত শক্তির সমান। তা ছাড়া আমরা সহজেই সমুদ্র জল থেকে ডিউটেরিয়াম পেতে পারি। সমুদ্রের জলে প্রায় ৪ কোটি টন ডিউটেরিয়াম রয়েছে। যেটা আমাদের বেশ কয়েকশ কোটি বৎসর ধরে জ্বালানির প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়াম হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ, এর পরমাণুতে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকলেও নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন আছে। হাইড্রোজেন সব থেকে হালকা মৌল, এর পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন একটি প্রোটনকে পরিক্রমণ করে।

এখন প্রশ্ন হল কেন আমরা এই শক্তির উৎসকে কাজে লাগাতে পারছি না? এর কারণ হচ্ছে সংযোজন ঘটাবার জন্য অত্যন্ত বেশি উষ্ণতার প্রয়োজন যার মান দশ লক্ষাধিক ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবার এই উষ্ণতা উৎপন্ন করা সম্ভব হলেও তপ্ত গ্যাসকে প্রসারিত হতে দেওয়া চলবে না, তাকে কোন পাত্রে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। কিন্তু কোন আধারই এত তাপ সহ্য করতে পারবে না। সেইজন্য একদম নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে অবশ্য নানা ভাবে এই নিউক্লিয় সংযোজন থেকে শক্তি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। সংযোজন থেকে শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবনই এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের সবথেকে কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে। যাই হোক, যদি সংযোজন চুল্লির বাস্তবায়ন সম্ভব হয় তাহলে মানুষকে আর কোনদিন জ্বালানির জন্য হাহাকার করতে হবে না।

২৯.৫.৪ মুদ্রার অপরদিক

পরমাণুর নিউক্লিয়াস যেমন একদিকে অসীম শক্তির প্রতিশ্রুতি বহন করে, তেমনই এ সমগ্র জীবিত ও নিষ্প্রাণ পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন করে দিতে পারে। মানবজাতি ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্টের ভয়াবহ দিন দুটিকে আজও ভুলতে পারেনি। ওই দুদিনে আমেরিকা Little Boy (ছোটো ছেলে) ও Fat Man (মোটা মানুষ) নামের দুটি পরমাণু বোমা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ফেলেছিল। মুহূর্তের মধ্যে শহর দুটি ধুলোয় পরিণত হয়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় মৃত্যুমুখে পড়েছিল নয়তো মারাত্মক রকমের জখম হয়েছিল। যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক বা তাঁদের বংশধরেরা এখনও মানবতার বিরুদ্ধে সেই ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তি বহন করে চলেছেন। তাঁরা নিজেরা যে শুধু কষ্ট পাচ্ছেন তাই নয়, তাঁরা জন্ম দিচ্ছেন বিকলাঙ্গ বা

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু সন্তানের। শহর দুটির ওপর হঠাৎ আসা ধূম্র ছত্রাকের ভয়ংকর দৃশ্য আজও আমাদের তাড়া করে বেড়ায়।

প্রথম পরমাণু বোমাগুলি আরও বোমা তৈরির পথ দেখিয়েছে। দ্রুতই সোভিয়েট রাশিয়া যোগ দিয়েছে আমেরিকার সঙ্গে। তার পরেই শুরু হয়েছে আরও মারাত্মক সব অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতার। সংযোজন প্রক্রিয়ায় তৈরি হাইড্রোজেন বোমা, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, যার প্রতিটি অনেকগুলি বোমা বহন করে এবং নিউট্রন বোমা—এই পরমাণু অস্ত্রের তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে ৫০,০০০ এরও বেশি পরমাণু অস্ত্র বিশ্ব জুড়ে তৈরি রয়েছে। মাটির ওপরে ঢেকে রাখা সংরক্ষণাগারে, চলন্ত ট্রেন বা ট্রাকে, সমুদ্রে জাহাজ বা ডুবোজাহাজ, আকাশ পথে বোমারু বিমানে চেপে এই সব অস্ত্র পৃথিবীকে অনেকবার ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আমেরিকা যে যুদ্ধকৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ (Strategic Defence Initiative) নিয়েছে, যাকে নক্ষত্র যুদ্ধের (Star wars) কর্মসূচিও বলা হয়, তার ফলে মহাকাশও পরমাণু অস্ত্রের আওতায় এসে যাওয়া সম্ভব।

একবার ভেবে দেখা যাক আমরা এর ফলে কী হারাচ্ছি।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় পৃথিবীতে প্রতি বছর অস্ত্র তৈরি করতে এক লক্ষ কোটি ডলার বা টাকার হিসাবে, ৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়। একা আমেরিকাই এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ খরচ করে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশও যে অনেকটাই খরচ করেছে তার কারণ প্রতিবেশী দেশগুলি নিয়ে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াই। নিজেদের সুবিধামতো যুদ্ধ চালাবার, জমির দখল নেবার এবং কোন দেশ তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে তার খোঁজে তারা আঞ্চলিক সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে সবাই এখন শক্তিশালী হতে চাইছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সব অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে। যদি প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় বন্ধ হত তাহলে পৃথিবীর সমগ্র জনসাধারণের জন্যই আহার এবং বস্ত্রের সংস্থান করা যেত। দীন কুটির পরিণত হত সত্যিকারের বাসগৃহতে আর তার সঙ্গে দূর হত নিরক্ষরতা।

এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা সমস্ত দেশেই এক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে কারণ এই লগ্নিটি অনুৎপাদক। বিশ্বব্যাপী জনগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয়ে এবং মারাত্মক রকমের অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এখন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং বিক্ষুব্ধ। গত প্রায় তিন চার বছর ধরে একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে—আমেরিকা ও রাশিয়া অবশেষে তাদের কিছু পরমাণু অস্ত্র বিনষ্ট করে দিতে সম্মত হয়েছে। আরও বেশি করে নিউক্লিয় নিরস্ত্রীকরণ নিয়েও কথাবার্তা চলছে। ভারতবর্ষ এবং রাশিয়া ১৯৮৬ সালে এক পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এবং অহিংস বিশ্ব গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিল। এই সব বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের যুগে সব দেশকে আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা করতে হবে এবং তার জন্য ধৈর্য ও পারস্পরিক বিশ্বাসও অর্জন করতে হবে। যদিও ভারতবর্ষ পরমাণু অস্ত্র বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তবু ভারত বিশ্বজোড়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের সমর্থক। জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা আর একটি বিকাশশীল প্রযুক্তি, সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে যা মানুষের সীমাহীন উপকারের সম্ভাবনা রাখে। দেখা যাক প্রযুক্তিটি কী।

চিত্র ২৯.১০ : পরমাণু অস্ত্র থেকে শান্তির দূত পায়রায় পরিবর্তন মানুষের শান্তি কামনা আর নিউক্লিয় নিরস্ত্রীকরণের আশার প্রতিফলন।

২৯.৬ জৈব প্রযুক্তি কী?

শিল্পে জৈব সম্পদ বা প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হিসাবেই জৈব প্রযুক্তিবিদ্যাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। একদিক থেকে দেখলে প্রকৃতপক্ষে হাজার বছর ধরেই জৈব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর সুপ্রাচীন উদাহরণ হল ছত্রাকীকরণ। বহু শতাব্দী ধরে সজীব জীবাণুকে দই, আচার, চিজ, ভিনিগার, পাউরুটি ও বটুরার জন্য ময়দার তাল বা মদ তৈরিতে কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা এইসব সরল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বেশি জানতে পেরেছি। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর গবেষণাগারে সযত্ন পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে, এইসব জীবাণুগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র জৈব রাসায়নিক কারখানা। এদের স্বাস্থ্য, ঔষধ, খাদ্য, দূষণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়। জীবাণুদের নিয়ন্ত্রণ, তাদের গঠনে হস্তক্ষেপ করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করার যে ক্ষমতা আমরা লাভ করেছি তার থেকেই আজকের জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমরা এই নতুন প্রযুক্তির দুটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এইদুটি দল সুপ্রজনন প্রযুক্তি এবং উৎসেচক নিশ্চলীকরণ প্রযুক্তি।

২৯.৬.১ সুপ্রজনন প্রযুক্তি

জৈব প্রযুক্তির আধুনিক বিপ্লব দাঁড়িয়ে আছে ডি.এন.এ.-র গঠন সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান অর্জন ও তাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। ডি.এন.এ. এক জটিল জৈব অণু যা সমস্ত সজীব কোশে প্রোটিন সংশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে এটি সমগ্র জীবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, জনন এবং কার্যাবলিও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ডি.এন.এ.-র রাসায়নিক গঠনের মধ্যেই সংকেতবদ্ধ থাকে। এই সংকেত আবিষ্কার এবং টেস্টটিউবে ডি.এন.এ. সংশ্লেষণই হল সুপ্রজনন প্রযুক্তির যুগান্তকারী ঘটনা। অবশ্য বাইরে থেকে প্রদত্ত ডি.এন.এ. জীবাণু কর্তৃক গ্রহণ করা সম্ভব। এই আবিষ্কারই সুপ্রজনন প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে, তাই জীবাণু থেকে গৃহীত কোন কোশে ডি.এন.এ. প্রবেশ করিয়ে সেই কোশকে দিয়ে প্রবিষ্ট ডি.এন.এ.-র সংকেত অনুসারে প্রোটিন সংশ্লেষণ করানো যায়। এই নতুন কোশগুলির সংখ্যা কর্ষণ বা প্রতিরূপ গঠনের (cloning) মাধ্যমে বর্ধিত হয় যতক্ষণ না ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট প্রোটিন অণু গঠন করার মতো উপযুক্ত সংখ্যক কোশ গঠন সম্পূর্ণ হয়। এই ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়। যখন

বাইরের ডি.এন.এ. অণু কোন কোশে প্রবেশ করে তখন প্রতিরোধক উৎসেচক (restriction enzyme) নামের এক বিশেষ উৎসেচক খুব দ্রুত তাকে মেরে ফেলে। এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল যখন জানা গেল ব্যাকটিরিয়ার কোশে মূল ডি. এন. এ.-র সূত্র ছাড়াও কিছু ক্ষুদ্র ডি. এন. এ.-র বলয় থাকে। এইসব বৃত্তাকার অণুগুলিকে প্লাসমিড বলে (চিত্র ২৯.১১ দ্রষ্টব্য)। তখন বাইরের ডি. এন. এ.-র খণ্ডিত অংশগুলিকে কোশ থেকে বার করে আনা প্লাসমিডের মধ্যে স্থাপন করার একটা উপায় বের করা হল। একেই ‘জিন সংযুক্তিকরণ’ (gene splicing) বলা হয়। একবার বাইরের ডি. এন. এ.-কে প্লাসমিডের মধ্যে যুক্ত করে কোশে স্থাপন করতে পারলে প্রতিরোধক উৎসেচকেরা আর একে ধ্বংস করতে পারে না। কোশটি যখন বিভাজিত হয়ে নতুন কোশের সৃষ্টি করে তখন বাইরের ডি. এন. এ.-র প্রতিরূপও নির্মিত হয়। কোশ যখন তার স্বাভাবিক কাজ শুরু করে, তখন ‘প্লাসমিডের মধ্যে অবস্থিত কৃত্রিম ডি. এন. এ. তার নিজস্ব সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটায়। সুতরাং সুপ্রজনন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে পিতৃকোশে বাইরের ডি. এন. এ. প্রবেশ করানো এবং প্রয়োজনমতো যে কোনও প্রোটিন সংশ্লেষণ করানো যায়। জীববিদ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সব প্রোটিন বিরল, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎস থেকে সহজে পাওয়া যায় না, সেগুলিকে এইভাবে অধিক মাত্রায় তৈরি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মধুমেহ রোগীদের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন বর্তমানে এই পদ্ধতিতেই প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা যায়।

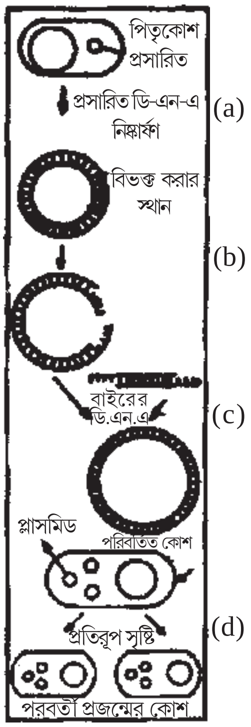

চিত্র ২৯.১১ : সুপ্রজনন প্রযুক্তির বিশ্লেষণ চিত্র-(ক) পিতৃকোশ থেকে প্লাসমিড ডি. এন. এ. নেওয়া হল। (খ) বিশেষ পদ্ধতিতে একে নির্দিষ্ট জায়গায় বিভক্ত করা হল। (গ) প্লাসমিডের মধ্যে বাইরের ডি. এন. এ. প্রবেশ করানো হল। (ঘ) পরিবর্তিত প্লাসমিডকে পিতৃকোশে পুনরায় প্রবেশ করানো হল।

অধিক দুগ্ধ উৎপাদন বা ভারী মাল বহন করাবার মতো বিশেষ কাজের জন্য যেমন গবাদিপশু প্রজনন করা হয় তেমনই এখন বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনার জন্য ব্যাকটিরিয়া প্রজনন করছেন। নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটিরিয়া নির্বাচন করে ও সুপ্রজনন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যারা প্লাস্টিকের মতো মানুষের তৈরি কৃত্রিম বস্তু বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। এইভাবে এরা পরিবেশ দূষণ রোধ করে কারণ জঞ্জাল হিসেবে ফেলে দেওয়া ওইসব প্লাস্টিক বিনষ্ট করা খুবই শক্ত। এইসব বিশেষ ব্যাকটেরিয়াকে আদর করে ‘বাগ্‌স্’ (bugs) বলে ডাকা হয়।

২৯.৬.২ উৎসেচক নিশ্চলীকরণ (Enzyme Immobilisation)

বেকারি বা মদ তৈরির মতো অনেক শিল্পেই উদ্দীপক হিসাবে উৎসেচকের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। কিন্তু বিশোধিত উৎসেচকগুলি জলে দ্রবণীয়। সেইজন্য সর্বশেষ উৎপন্ন বস্তু থেকে এগুলি পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। এ ছাড়া এগুলি পুনরায় ব্যবহার করাও কষ্টসাধ্য। সুতরাং একবার মাত্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎসেচকের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করতেই ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে নিশ্চল উৎসেচকের আবিষ্কার হয়। নিশ্চলীকরণের মূল ব্যাপারটি হল উৎসেচকটিকে জিলেটিনের মতো কোন বৃহৎ অণুর সঙ্গে

উদ্দীপক হল এমন একটি উপাদান যা রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত থাকে। উৎসেচকগুলি হল প্রোটিন যারা জীবদেহে জৈব বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত করা। এর ফলে এটিকে একবার উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করার পর বৃহৎ অণুটির থেকে বিযুক্ত করে পরে আবার ব্যবহার করা যায়। আধা-কৃত্রিম পেনিসিলিন উৎপাদন এবং ভুট্টা থেকে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুকটোজ তৈরিতে কাজে লাগানো যায়। ফ্রুকটোজ গ্লুকোজের চেয়ে মিষ্টি হলেও এর তাপন মূল্য একই এবং এর ফলে একে কম তাপন মূল্যের মিষ্টি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

অনুশীলনী ৬

সুপ্রজনন প্রযুক্তি এবং উৎসেচক নিশ্চলীকরণ বলতে কী বোঝায় তা প্রতিটি তিন পঙ্‌ক্তিতে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা প্রধানত জীবাণু এবং উৎসেচক প্রযুক্তি নিয়ে হলেও এদের সমার্থক নয়। এই প্রযুক্তির উন্নতিতে প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোশেরই সমান ভূমিকা আছে। প্রাণী কোশের ওপর সুপ্রজনন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভাইরাস জীবাণু প্রতিষেধক এবং চিকিৎসাবিদ্যায় অতি প্রয়োজনীয় সব প্রোটিন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। একইভাবে কোশ, কলা এবং উদ্ভিদের অঙ্গসমূহের কালচার এবং উন্নত মানের উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে সুপ্রজনন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটছে। মটর, বিন, ডাল প্রভৃতি শিম্ব জাতীয় (leguminous) উদ্ভিদের মূলে যে ব্যাকটিরিয়া থাকে তার দ্বারা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের (fixation) সমস্যাটির ওপরেও গবেষণা চলেছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই আমরা জৈব প্রযুক্তি, কৃষি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন দেখতে পাব।

জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন মানুষের উপকারে লাগানো যায় তেমনই এর অপব্যবহারও হতে পারে। এর সাহায্যে ক্ষতিকারক টিকা, পাতা ঝরানো রাসায়নিক পদার্থ, ফসল বা অরণ্যের পক্ষে যা মারাত্মক, এই রকম জিনিসও তৈরি করা যেতে পারে। অথবা ইঁদুর-জাতীয় তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীর নূতন প্রজাতি তৈরি হতে পারে যারা প্রচুর ফসল বা অরণ্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং মানবসমাজকে সব সময়ই নূতন আবিষ্কারের ওপর লক্ষ রাখতে হবে যাতে সেগুলি মানবজাতির সমস্যা বাড়িয়ে তার অস্তিত্ব বিপন্ন না করে, মানুষের সমস্যার প্রকৃত সমাধানে সাহায্য করে।

২৯.৭ সারাংশ

- এই এককটিতে আপনি সংক্ষেপে পাঁচটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। এগুলি হল লেজার, তন্তু-আলোকবিদ্যা, মহাকাশ প্রযুক্তি, নিউক্লিয় বিভাজন ও সংযোজন এবং জৈব প্রযুক্তি। এদের কিছু প্রয়োগ, সুবিধা এবং বিপদের দিকগুলিও আপনি জেনেছেন।
- লেজার এক বিশেষ ধরনের আলো যার অনেক ধর্মই অত্যন্ত উপযোগী।
- আলোকতন্তু বিদ্যা হল এমন এক প্রযুক্তি যাতে আলোকীয় তন্তু, অর্থাৎ সরু চুলের মতো স্বচ্ছ তন্তুর মধ্যে দিয়ে আলো আঁকাবাঁকা পথেও প্রবাহিত করা যায়।

- মহাকাশ প্রযুক্তির উন্নতিতে মানুষ গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ অনেকগুলি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।
- বিভাজন ও সংযোজন প্রযুক্তি—পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের উপায়। বিভাজন হল ভারী নিউক্লিয়াসকে ভেঙে ছোটো ছোটো নিউক্লিয়াসে পরিণত করা। আর সংযোজন প্রক্রিয়ায় একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। দুটি ক্ষেত্রেই উৎপন্ন পরমাণুর ভর প্রাথমিক অবস্থার পরমাণুর চেয়ে কম হয় এবং লয়প্রাপ্ত ভর প্রভূত শক্তিতে পরিণত হয়।
- জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা উৎসেচক, জীবাণু আর কোশসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

২৯.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

(১) সাধারণ বিজলি বাতির আলো আর লেজার-নির্গত আলোক রশ্মির মধ্যে চারটি পার্থক্য লিখুন।

(২) দূরভাষ সংযোগ স্থাপনে তামার কেব্‌লের তুলনায় আলোকীয় তন্তু নির্মিত কেব্‌লের তিনটি প্রধান সুবিধা কী কী?

(৩) কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকল্প থেকে আমরা যেসব দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছি, তার চারটি নীচে লিখুন।

(৪) নিউক্লিয় বিভাজন শক্তিকে কাজে লাগানোয় কী কী বিপদের সম্ভাবনা আছে।

(৫) এই অধ্যায়ে আলোচিত প্রযুক্তিগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল। বক্তব্যগুলির পাশে উপযুক্ত প্রযুক্তিটির নাম লিখুন :

(ক) আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান করা যায়। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত প্রচারিত দূরদর্শন অনুষ্ঠান যে-কোনো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়।

(খ) প্রভূত পরিমাণ শক্তির উৎপাদন ও জোগান দেওয়া যায়।

(গ) ধমনিতে রক্ত জট বেঁধে যাওয়া ও মস্তিষ্কের টিউমার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(ঘ) ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা এবং পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার জন্য উপকারী ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টি করা যায়।

(ঙ) দূরবর্তী স্থানে দূরভাষ সংযোগ স্থাপন ও দূরদর্শন অনুষ্ঠান করা যায়।

২৯.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

(ক) (i) আলোর (ii) অনেক, সংকেত (গ) পরিমাণ, ক্ষেত্রফলের বিস্তৃত

(খ) (১) (ii), (iii) (২) (iii) (৩) (ii), (iii) (৪) (ii)

অনুশীলনী ২

(ক) (iii), (iv), (vi)

(খ) আলোক তরঙ্গ, আলোকীয় তন্তু, তড়িৎ প্রবাহ, রেডিয়ো তরঙ্গ, সুলভ, হালকা।

অনুশীলনী ৩

(ক) (iii), (vi)

(খ) (i) কৃত্রিম উপগ্রহ (ii) মহাকাশ সন্ধানী (iii) রকেট

অনুশীলনী ৪

(ক) (i) ঠিক (ii) ভুল (iii) ভুল (iv) ঠিক (v) ঠিক

(খ) ২৯.৭ (খ) চিত্রের সাহায্যে উত্তর দিন।

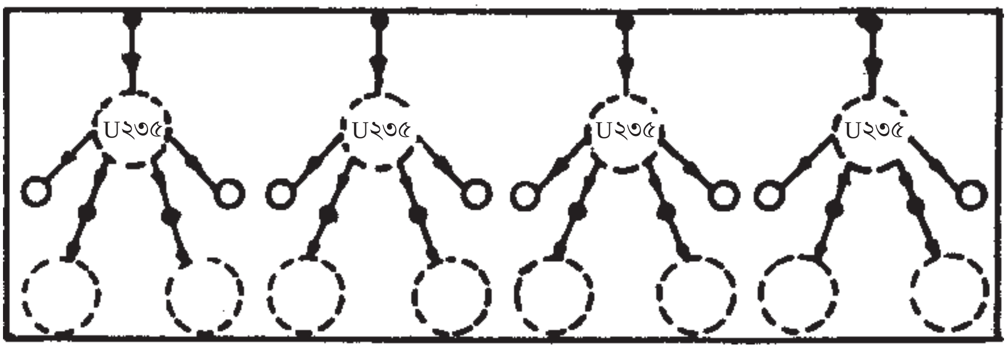

অনুশীলনী ৫

(ক) গ্রাফাইট ব্লক নিউট্রনের গতি হ্রাস করে।

(খ) ক্যাডমিয়াম দণ্ডের মতো কোন নিউট্রন-শোষক ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি কীভাবে হয় তা আপনি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অনুশীলনী ৬

সুপ্রজনন প্রযুক্তিবিদ্যা হল কোন পিতৃকোশে বাইরে থেকে খণ্ডিত অংশ প্রবেশ করানো যার ফলে ওই কোশে সেই প্রবিষ্ট ডি. এন. এ.-র জন্যই কিছু নির্দিষ্ট কার্য করানো সম্ভব হয়।

উৎসেচক নিশ্চলীকরণ পদ্ধতিতে উৎসেচককে কিছু বৃহৎ অণুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এর ফলে সেই উৎসেচক একটি বিক্রিয়া চক্রের পরেই নষ্ট হয় না, একে আবার সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা যায়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর

(১) লেজার রশ্মি	সাধারণ আলোক রশ্মি
(ক) একটি মাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমষ্টি	(ক) অনেকগুলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমষ্টি
(খ) সুসংগত	(খ) অসংগত
(গ) আলোক রশ্মি বিস্তৃত না হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে	(গ) ছড়িয়ে যায়
(ঘ) প্রতি একক ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণ আলোকশক্তি বহন করে	(ঘ) উৎস থেকে কিছুটা দূরত্বে শক্তির পরিমাণ কম।

(২) আলোকীয় তন্তু হালকা এবং এর খরচ কম। এছাড়া এটি অনেক বেশি বার্তা বহন করতে পারে।

(৩) যোগাযোগ, সম্পদের অবস্থান নির্ণয়, বস্তুবিদ্যা, শিক্ষা।

(৪) নিউক্লিয় কেন্দ্রের দুর্ঘটনা, বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন।

(৫) (ক) মহাকাশ প্রযুক্তি, (খ) বিভাজন ও সংযোজন, (গ) লেজার, (ঘ) জৈব প্রযুক্তি, (ঙ) আলোকীয় তন্তু।

একক ৩০ □ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি—২

গঠন

৩০.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৩০.২ অর্ধপরিবাহী

৩০.২.১ অর্থপরিবাহী কাকে বলে?

৩০.২.১ অর্থপরিবাহী-নির্মিত সামগ্রী ও সেগুলির ব্যবহার

৩০.৩ কম্পিউটার প্রযুক্তি

৩০.৩.১ কম্পিউটারের ক্রিয়াকলাপ

৩০.৩.২ মাইক্রো ও মিনি কম্পিউটার, মেন ফ্রেম, দৈত্যাকার কম্পিউটার ও এগুলির ব্যবহার।

৩০.৩.৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৩০.৪ রোবটবিদ্যা

৩০.৪.১ রোবট ও রোবট-বিদ্যা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি

৩০.৪.২ রোবটই যেখানে তারকা

৩০.৪.৩ রোবটের জন্য প্রস্তুতি

৩০.৫ বস্তুবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৩০.৬ প্রযুক্তির পূর্বাভাষ

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

৩০.৯ উত্তরমালা

৩০.১ প্রস্তাবনা

একক ২৯-এ আমরা কিছু আধুনিক প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি, যেমন লেজার, আলোকীয় তন্তু, বিভাজন ও সংযোজন এবং জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা। আমরা এগুলির প্রয়োগ এবং মানবসমাজ কীভাবে এগুলির যথাযথ ব্যবহার থেকে উপকৃত হতে পারে তারও আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা ওই আলোচনাটিই চালিয়ে যাব এবং অর্ধপরিবাহী, কম্পিউটার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটবিদ্যা, বস্তুপ্রযুক্তি প্রভৃতি অন্যান্য প্রযুক্তিগুলির বিবরণ দেব। একক ২৭-এ আপনি পড়েছেন যে আজকাল কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিতে তার ব্যবহারের মধ্যে অতিবাহিত সময় বেশ কিছুটা কমে গেছে। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতির পূর্বাভাষ দেওয়া জ্ঞানচর্চার একটি নতুন ক্ষেত্র হিসাবে দেখা দিচ্ছে। আমরা তাই এই এককটি প্রযুক্তির পূর্বাভাষ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে শেষ করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ার পর আপনি যা পারবেন তা হল :

- অর্ধপরিবাহী কী তা বলতে এবং পি-এন সন্ধি-ডায়োড, ট্রানজিস্টর ও একীকৃত বর্তনীর (integrated circuit) মতো কিছু অর্ধপরিবাহী-নির্মিত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে।
- কম্পিউটারের পাঁচটি মূল অংশের কার্যপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে এবং কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার (যান্ত্রিক অংশ) ও সফটওয়্যারের (বৌদ্ধিক অংশ) পার্থক্য নির্ণয় করতে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে।
- রোবট কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- নতুন উপাদান-বস্তুর উদ্ভাবন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে কীভাবে সাহায্য করেছে তা বর্ণনা করতে।
- উল্লিখিত প্রযুক্তির প্রতিটির প্রয়োগ বর্ণনা করতে।
- প্রযুক্তি পূর্বাভাষের গুরুত্ব আলোচনা করতে।

৩০.২ অর্ধপরিবাহী

ইতিমধ্যে আপনি এই পাঠক্রমের অনেকটাই পড়ে ফেলেছেন। আপনি হয়তো বেশ কয়েকবার পাঠকেন্দ্রেও গিয়েছেন। আপনি শ্রাব্য ক্যাসেট রেকর্ডারে পাঠগ্রহণ করে থাকবেন, হয়তো টেলিভিশনে ভিডিও-অনুষ্ঠানও দেখেছেন। রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভিডিও-ক্যাসেট-প্লেয়ার প্রভৃতিতে যে সব সরঞ্জাম সচরাচর দেখতে পান তা সবই হল অর্থপরিবাহী-প্রযুক্তির ফসল।

অর্ধপরিবাহী বস্তুই হল আজকের দিনের জটিল ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জামের ভিত্তিস্বরূপ। ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, বিমান, মহাকাশযান, কৃত্রিম উপগ্রহ, টেলিফোন, এক্সচেঞ্জ, লেজার এবং আরও অজস্র সরঞ্জামের মধ্যে অর্ধপরিবাহী নির্মিত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি আছে। অর্ধপরিবাহী প্রযুক্তি ব্যবহার করে না এমন কোন যোগাযোগের, অধিক দূরত্বে যাতায়াতের, বিনোদনের বা প্রতিরক্ষার যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম নেই বললেই হয়। এইসব উৎপাদিত বস্তু এবং যে অর্ধপরিবাহীগুলি সেগুলির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নয়নের একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে। কাজেই, আপনি নিশ্চয়ই অর্ধপরিবাহী জিনিসটি কী তা জানতে চাইবেন।

৩০.২.১ অর্ধপরিবাহী কাকে বলে?

আপনি নিশ্চয়ই তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু দেখেছেন। এগুলির প্রতিটিই তড়িৎপ্রবাহের সুপরিবাহী। আপনি এও জানেন যে কাঠ, প্লাস্টিক বা কোয়ার্জের মতো বস্তু তড়িৎ পরিবহণ করে না। এধরনের বস্তুকে বলা হয় অপরিবাহী বা অন্তরক। নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, অর্ধপরিবাহী হল এমন বস্তু যার তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতা অপরিবাহীর চেয়ে বেশি কিন্তু ধাতুর চেয়ে কম। সিলিকন ও জার্মেনিয়াম হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অর্ধপরিবাহী। অবশ্য আজকাল গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, ইন্ডিয়াম অ্যান্টিমনাইড প্রভৃতি যৌগও ব্যবহৃত হয়।

অর্ধ পরিবাহীগুলির তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতা সেগুলির বিশুদ্ধতা, অথবা বলা যায় অবিশুদ্ধতার ওপর বেশিরকম নির্ভরশীল। সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কেলাস প্রায় অপরিবাহীর মতোই আচরণ করে। কিন্তু কোন অপদ্রব্য যোগ করলেই কেলাসটির পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। এখানে উল্লেখ্য এই যে অপদ্রব্য বলতে শতকরা ৫০-৫০ ভাগের মিশ্রণ, এমন কী দশভাগের একভাগ অপদ্রব্যও বোঝায় না। যে সব

অর্ধপরিবাহী কাজে লাগে তাতে এক টন সিলিকনে মাত্র ১ মিলিগ্রাম আর্সেনিক মৌল থাকতে পারে। এই সামান্য পরিমাণ আর্সেনিকই সিলিকনে অতিরিক্ত ইলেকট্রন জোগায়, যার ফলে সেটি আরও সুপরিবাহী হয়ে ওঠে। এ ধরনের সিলিকনের টুকরোটি হবে পি-জাতির অর্ধপরিবাহী। এই অত অল্প পরিমাণ অপদ্রব্য যোগ করাকে বিজ্ঞানীরা 'ডোপিং' (doping) বলেন।

অনুশীলনী ১

অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়াম সম্বন্ধে নীচের কোন উক্তিটি যথাযথ?

জার্মেনিয়ামের তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতা—

(i) তামার চেয়ে বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কম, (ii) তামা ও প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি, (iii) প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি এবং তামার চেয়ে কম, (iv) তামা ও প্লাস্টিক উভয়ের চেয়ে কম।

৩০.২.২ অর্ধপরিবাহী-নির্মিত সামগ্রী ও সেগুলির ব্যবহার

একটি পি-জাতীয় ও একটি এন-জাতীয় অর্ধপরিবাহীর সংযোগ গঠন করলে তাকে পি-এন সংযোগ ডায়োড বলা হয়। এই সামগ্রীটির একটি অদ্ভুত ধর্ম হল এই যে এটি মাত্র একদিকে তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে। এইজন্য এটিকে পরিবর্তী প্রবাহকে (এ.সি.) দিষ্ট প্রবাহে (ডি.সি.) পরিবর্তিত করতে ব্যবহার করা হয়। (চিত্র ৩০.১ দেখুন)। (ক) চিত্রে এটি সুইচ হিসাবে এবং (খ) চিত্রে এটি মুক্ত বর্তনী হিসাবে কাজ করছে। যান্ত্রিক না হওয়ায় এই সুইচ খুব দ্রুত কাজ করে।

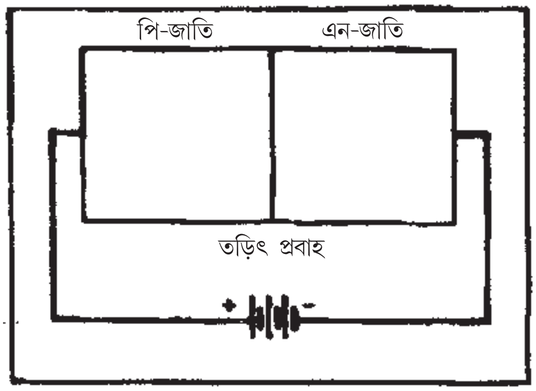

(ক)

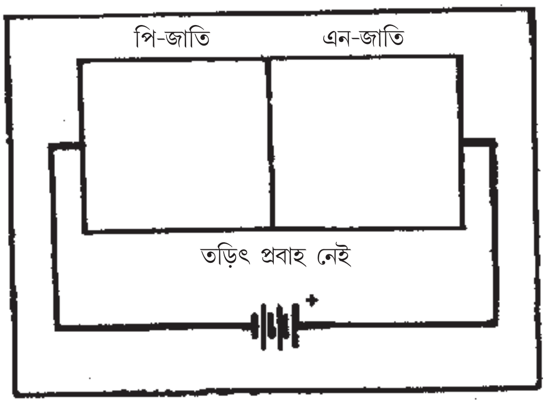

(খ)

চিত্র ৩০.১ : (ক) পি-এন সংযোগ ডায়োডে পি-প্রান্তটি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত যোগ করলে তবে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।
(খ) ব্যাটারির প্রান্ত দুটি উলটে দিলে তড়িৎ প্রবাহ হয় না।

এন-পি-এন বা পি-এন-পি অর্ধপরিবাহী পদার্থের সমন্বয় সৃষ্টি করে তৈরি আরও জটিল অর্ধপরিবাহী নির্মিত সামগ্রীকে বলা হয় ট্রানজিস্টার (Transistor)। এগুলির আরও আকর্ষণীয় কিছু ধর্ম আছে। ব্যাটারির সঙ্গে এগুলিকে এমনভাবে যুক্ত করা যায় যাতে এর একদিকে তড়িৎ-প্রবাহের সামান্য পরিবর্তন অন্যদিকে বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। কারিগরির ভাষায় ট্রানজিস্টার ক্ষুদ্র সংকেতের 'পরিবর্ধন' (amplify) করতে পারে। ট্রানজিস্টারের সঙ্গে তড়িৎবর্তনীর অন্যান্য উপাদান (যথা, রোধ, ধারক প্রভৃতি) যোগ ক'রে উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী প্রবাহ উৎপাদন করা যায়।

অর্ধপরিবাহী সামগ্রীগুলি আকালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদের ধর্মও ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা চলে। অপদ্রব্য দিয়ে ‘ডোপিং’-এর মাত্রা কমবেশি করে অথবা একই কেলাসের মধ্যে আরও পি-জাতীয় বা এন-জাতীয় অর্ধপরিবাহী অঞ্চল সৃষ্টি করে এটি করা হয়। এইভাবে অনেক নতুন অর্ধপরিবাহী সামগ্রীর সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে এগুলি ‘চিপ’ (chip) নামের একটি অপরিবাহী বস্তুর তলের ওপর দীর্ঘ শৃঙ্খলে, অথবা ইচ্ছামতো কোন নকশা অনুযায়ী তৈরি করা যায়। এক বৃহৎ সংখ্যক অর্ধপরিবাহী সামগ্রী যখন একটি ‘চিপ’-এর ওপর নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য তৈরি করা হয় তখন ওই উৎপন্ন সামগ্রীটিকে বলা হয় একীকৃত বর্তনী (integrated circuit) বা আই. সি. (I.C.)। ক্ষুদ্র আকৃতিবিশিষ্ট ও ঘাতসহ হওয়ায় এবং এগুলির জন্য ক্ষমতার ব্যয় প্রায় শূন্য হওয়ায় এই সামগ্রীগুলি টেলিভিশন সেট, কম্পিউটার এবং যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই প্রচলিত হয়েছে।

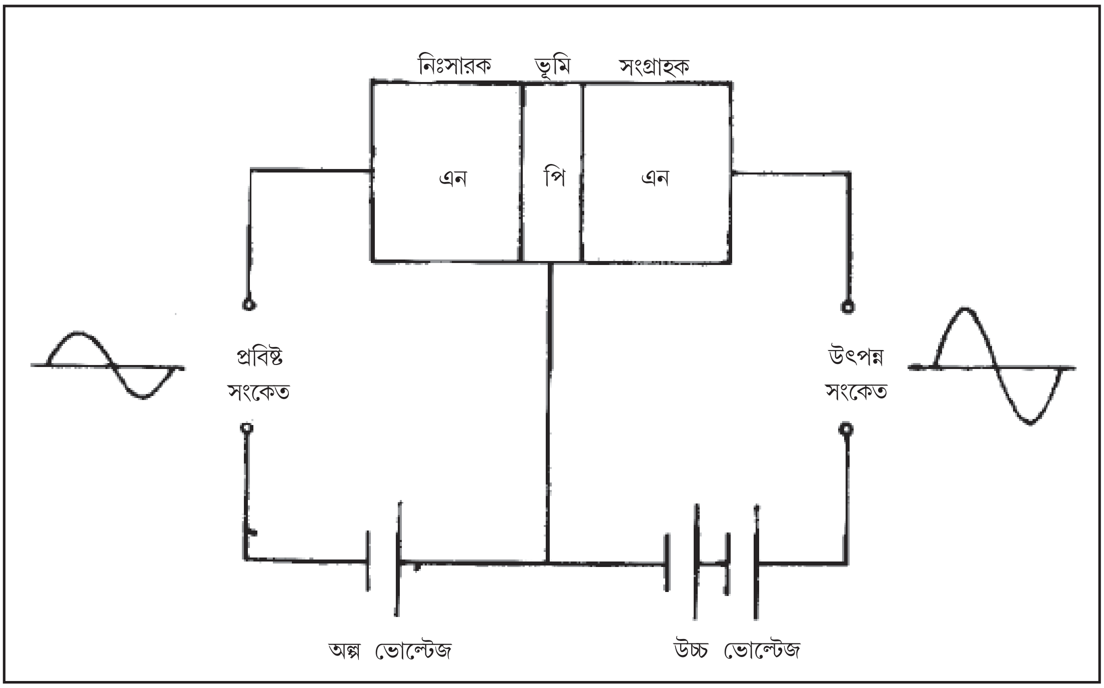

চিত্র ৩০.২ : একটি এন. পি. এন. ট্রানজিষ্টার।

বর্তমান প্রযুক্তিতে আমরা এক বর্গসেমি পরিমাপের একটি ‘চিপ’-এর ওপর লক্ষ লক্ষ অর্ধপরিবাহী সামগ্রী তৈরি করতে পারি। এতে সরঞ্জামের আকার ও ওজন অনেক কমে যায়। যেমন ধরুন, ১৯৫০-এর দশকে কয়েক কোটি টাকা দামের তিন টন ওজনের একটি কম্পিউটার একটি বড়ো ঘর জুড়ে থাকত। তারপর চার দশকেরও কম সময়ে কয়েক হাজার টাকা দামের একটি মাইক্রোচিপ-ভিত্তিক কম্পিউটার, আকারে যেটি একটি বড়ো ব্রিফকেসের চেয়ে বড়ো নয়, তা তার পূর্বসূরিকে কাজে হারিয়ে দিতে পারে। আলপিনের মাথার মতো আকারের রেডিয়ো-সম্প্রচারক বা গ্রাহক যন্ত্রও তৈরি করা সম্ভব। এই ধরনের উন্নয়ন নানা সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অতিক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী-সামগ্রীর সাহায্যে মনুষ্য দেহের শিরায় রক্তের প্রবাহও পর্যবেক্ষণ করা যায়।

অনুশীলনী ২

প্রথম স্তম্ভে যে অর্ধপরিবাহী সামগ্রীগুলির নাম রয়েছে সেগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের বর্ণনা মেলান :

(ক) পি-এন সংযোগ ডায়োড	(i)	একটিমাত্র ক্ষুদ্র 'চিপ'-এর ওপর নির্দিষ্ট নকশায় সজ্জিত বৃহৎ সংখ্যক অর্ধপরিবাহী সামগ্রী।
(খ) ট্রানজিস্টার	(ii)	অর্ধপরিবাহী কেলাসের একদিকে পি-জাতি, অন্যদিকে এন-জাতি আছে এমন সামগ্রী।
(গ) একীকৃত বর্তনী	(iii)	পি বা এন জাতির অর্ধপরিবাহী দুইটি যথাক্রমে এন বা পি জাতির অর্ধপরিবাহীর মধ্যে স্থাপিত আছে এমন সামগ্রী।

অতিক্ষুদ্র ও স্বল্পমূল্যের হলেও অর্ধপরিবাহী সামগ্রীগুলি আমাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেছে। আমরা আগেই বলেছি, যে আমাদের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার ওপর অর্থপরিবাহী প্রযুক্তির উদ্ভাবনের একটা গভীর প্রভাব রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ও বিনোদনের উপায় সৃষ্টি ছাড়াও সারা বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই প্রযুক্তি আশ্চর্যজনক ভূমিকা নিয়েছে। অবশ্য এমন আশঙ্কাও প্রকাশিত হয়েছে যে বহুমুখী কার্যসাধক এই সব যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন মানুষকে কর্মচ্যুত করবে। যেমন কম্পিউটার বিশালসংখ্যক করণিকশ্রেণির কর্মচারীর প্রয়োজন দূর করবে। অথবা, রোবটের ব্যবহারের ফলে কারখানার অনেক কর্মী কাজ হারাবেন।

কিন্তু অতীতেও পুরাতন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে; যেমন, ঘোড়ায় টানা গাড়ির পরিবর্তে মোটরগাড়ির প্রচলন ঘটেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, সমাজ যখন এইভাবে অগ্রসর হয় তখন বহু নতুন ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর উদাহরণ, আগে টাঙা-চালক ও ঘোড়ার দেখাশোনা করার জন্য পশু-চিকিৎসকের যতগুলি কাজের সংস্থান ছিল, মোটরগাড়ির প্রচলন হওয়ার পর সেগুলির নির্মাণ, দেখাশোনা ও মেরামতির জন্য অন্তত ততগুলি, অথবা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কাজের সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে অর্ধপরিবাহী-প্রযুক্তিও এটির নিজস্ব অনেক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পার্থক্য এখানেই, যে এসব কাজের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং, নতুন প্রযুক্তিকে বর্জনের মধ্যে নয়, সমাধান আসলে মানুষকে নতুনভাবে প্রশিক্ষিত ও মতাদর্শে দীক্ষিত করার মধ্যে, যাতে তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন ধরনের কাজের উপযোগী হতে পারে।

একটু আগেই আপনি পড়লেন যে অর্ধপরিবাহী প্রযুক্তির অনেক প্রয়োগ আছে, যাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল কম্পিউটার। আসুন আমরা কম্পিউটার সম্বন্ধে আরও কিছু শিখি।

৩০.৩ কম্পিউটার প্রযুক্তি

আপনি এখনও কোন কম্পিউটার দেখে না থাকলেও আপনার জীবনে কম্পিউটারের উপস্থিতি এমনই এক সত্য যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। আপনার স্কুলের মার্কশিট হয়তো কম্পিউটারে তৈরি হয়েছে, বিদ্যুৎ ও জলের যে বিল আপনি পান তাও হয়তো কম্পিউটারে তৈরি হয়েছে। আপনি যদি কলকাতার মতো বড়ো শহরে কোন রেলের টিকিট ক্রয় করেন তবে তার স্থান সংরক্ষণ কম্পিউটারে করা হবে। ব্যাংক থেকে দেওয়া চেকবই কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য। আমাদের জীবনের অনেক দিকেই কম্পিউটার সত্যই খুব দ্রুত প্রবেশ করছে।

সত্তরের দশকে আমাদের দেশে খুব অল্প সংখ্যক কম্পিউটার ছিল। সেগুলি ছিল আকারে বিশাল আর বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। সেগুলি প্রায়ই বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবনে তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব কমই ছিল। কিন্তু অর্ধপরিবাহী-প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষুদ্র, অল্পমূল্যের যন্ত্র থেকে বিশাল ও ব্যয়সাপেক্ষ হাজার হাজার কম্পিউটার এখন অফিসে, কারখানায়, স্কুলে, হাসপাতালে, ব্যাংকে, বিমানবন্দরে, রেলস্টেশনে এমন কী বসতবাড়িতেও দেখা যায়। ভারতের প্রত্যেক জেলা সদরে কম্পিউটার চালু করে সেগুলিকে উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে একটি বড়ো কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করার একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে রূপায়িত হতে চলেছে। এই কম্পিউটার "জালিকা" (network) সারা দেশের সব ধরনের সর্বাধুনিক তথ্যের ভান্ডার হবে। নতুন শতাব্দীতে কম্পিউটার হয়তো জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে উঠবে। এগুলি আমাদের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দেবে, তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনার ভার নেবে এবং অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে।

৩০.৩.১ কম্পিউটারের ক্রিয়াকলাপ

কম্পিউটার আসলে একটি সাধারণ যন্ত্র। এটিকে শ্রদ্ধা ও ভীতির চোখে দেখা উচিত নয়। মূলত, কম্পিউটার তথ্য গ্রহণ করে ও তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখে। এরপর সেটি ওই তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ করে, যার উদাহরণ হল তথ্যগুলিকে নির্দিষ্ট কোনভাবে সাজানো, বিভিন্ন সংখ্যা যোগ বা গুণ করা। শেষে এটি কোন তথ্যপ্রদায়ক (output) ব্যবস্থার মাধ্যমে অভীষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। এই ব্যবস্থা একটি পর্দা হতে পারে যার ওপর তথ্যটি দেখা যাবে, আবার এটি কাগজে ছাপাও হতে পারে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা করি, ব্যাপারটি কতকটা তারই মতো। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করি, আমাদের মস্তিষ্ক তা সঞ্চিত রাখে ও প্রক্রিয়াকরণ করে এবং তার পর আমরা ক্রিয়াশীল হই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের যদি দুটি সংখ্যা গুণ করতে বলা হয় তখন আমাদের মস্তিষ্ক চোখ বা কানের মাধ্যমে তথ্যটি গ্রহণ করে, সংখ্যা দুটিকে সঞ্চয় করে রাখে এবং গুণের কাজটি সম্পন্ন করে। এর পর আমরা উত্তরটি মুখে বলি বা কাগজে লিখি।

দুটির মধ্যে প্রভেদ একমাত্র এই, যে কম্পিউটার এসব কাজ আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত করে। যেসব বর্ণনা বা লেখালেখির কাজ করতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস বা কয়েক বছর লাগত তা কম্পিউটারে কয়েক সেকেন্ডে বা কয়েক মিনিটে করা যায়। যেমন, একজন সাধারণ ব্যক্তি মিনিটে ৫ থেকে ১০টি সরল গণনা করতে পারে। একটি সাধারণ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ১০,০০০টি জটিল গণনা করতে পারে আর একটি দ্রুতগতি কম্পিউটার পারে লক্ষ লক্ষ জটিল গণনা করতে। আর এর মধ্যে একটিও ভুল থাকে না। কম্পিউটার এক বিশাল পরিমাণ উপাত্ত সঞ্চিত রাখতে পারে। এইসব কারণেই কম্পিউটার জীবনযাত্রার প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

কম্পিউটারের দুটি বড়ো দিক হল তার যান্ত্রিক অংশ বা হার্ডওয়্যার (hardware) এবং তার বৌদ্ধিক অংশ বা সফটওয়্যার (software)। সমস্ত জটিল ইলেকট্রনিক বর্তনী আর নানা ধরনের চৌম্বক ও যন্ত্রসামগ্রী মিলে হল কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার। আর কম্পিউটারের সফটওয়্যার হল পরপর অনেকগুলি নির্দেশের গুচ্ছ বা 'প্রোগ্রাম' (programme) যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে পরিচালিত করে। কম্পিউটার ধাপে ধাপে প্রোগ্রামের নির্দেশগুলিকে পালন করে। আমরা এখন সংক্ষেপে কম্পিউটারের এই দুই দিক নিয়ে আলোচনা করব।

কম্পিউটারের হার্ডওয়ার

আজকাল নানা ধরনের অজস্র কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রতিটিরই পাঁচটি মূল অংশ আছে। ৩০.৩ চিত্রে এগুলি এক একটি ব্লক হিসাবে দেখানো হয়েছে। চিত্রটি যত্ন করে লক্ষ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

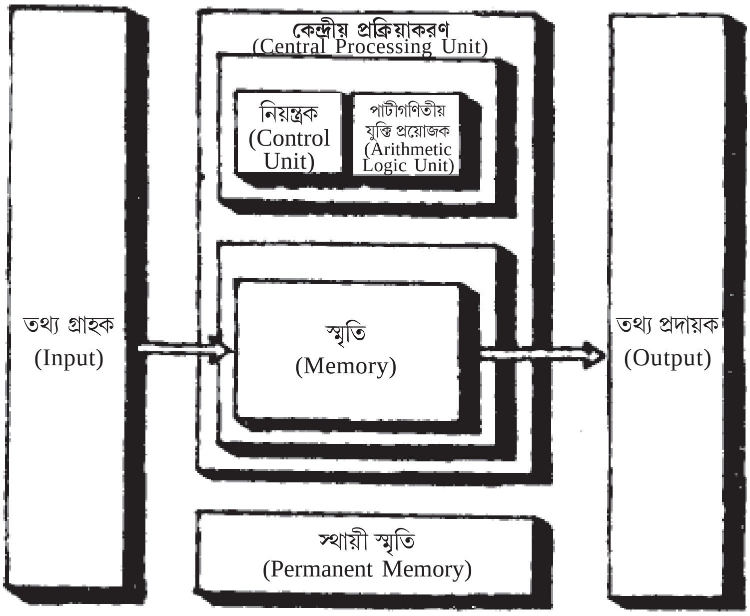

চিত্র ৩০.৩ : কম্পিউটারের পাঁচটি মূল অংশ।

অনুশীলনী ৩

কম্পিউটারের পাঁচটি মূল অংশের তালিকা দিন।

তালিকায় আপনি অন্যতম মূল অংশ হিসাবে তথ্যগ্রাহকের উল্লেখ করেছেন। কম্পিউটার ব্যবহার করতে হলে আপনার দেয় তথ্য ও নির্দেশ আপনি টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের মতো একটি তথ্যগ্রাহকের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করাবেন। এই তথ্য ও প্রোগ্রাম কম্পিউটারের যে স্মৃতিতে রক্ষিত হবে তা হয়তো গ্রামাফোন রেকর্ডের মতো কোন বস্তু, যার নাম 'ফ্লপি ডিস্ক' (floppy disc). জিনিসটি বাঁকানো যায় বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে) অথবা একটি ফিতা (tape) চিত্র ৩০.৪ (ক)।

প্রোগ্রামটি কম্পিউটারে প্রবিষ্ট হলেই নিয়ন্ত্রক তার কাজ শুরু করে। এটি নির্দেশগুলিকে বেছে সেগুলিকে ক্রমানুযায়ী সাজায় এবং অন্য অংশগুলিকে তাদের কার্যসম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। এটি কম্পিউটারের দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মতো কাজ করে। যেমন ধরুন, নিয়ন্ত্রক স্মৃতিকে কিছু সংখ্যা পাটিগাণিতীয় যুক্তি প্রয়োজককে (ALU) পাঠাতে নির্দেশ দেয় এবং প্রয়োজকটিকে আদেশ দেয় সংখ্যাগুলির যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ, এর যখন যেটি দরকার সেটি সম্পন্ন করতে।

নিয়ন্ত্রক ও পাটিগাণিতীয় যুক্তি প্রয়োজককে একত্রে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকারক (Central Processing Unit, CPU) বলা হয়। কম্পিউটারের এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকারকের ইলেকট্রনিক বর্তনী অসংখ্য

ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে গঠিত একীকৃত বর্তনীর সমন্বয়ে তৈরি, যার সম্বন্ধে আপনি আগের অংশে পড়েছেন।

শেষকালে, নিয়ন্ত্রক গণনার ফলাফল তথ্যপ্রদায়কে পাঠায়। এই ফলাফল এখন টেলিভিশন পর্দার মতো মনিটরে (monitor) দেখানো যেতে পারে অথবা মুদ্রক বা প্রিন্টারের (printer) দ্বারা কাগজে ছাপা হতে পারে। এটি ইচ্ছা করলে ফ্লপি ডিস্কে তুলে নেওয়া যেতে পারে [চিত্র ৩০.৪ (খ)]।

সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অবশ্য কম্পিউটার ব্যবহারকারী ব্যক্তির হাতেই থাকে। আলো, সুইচ ও বোতামের সাহায্যে তিনি প্রতি মুহূর্তে কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের ওপর লক্ষ ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন।

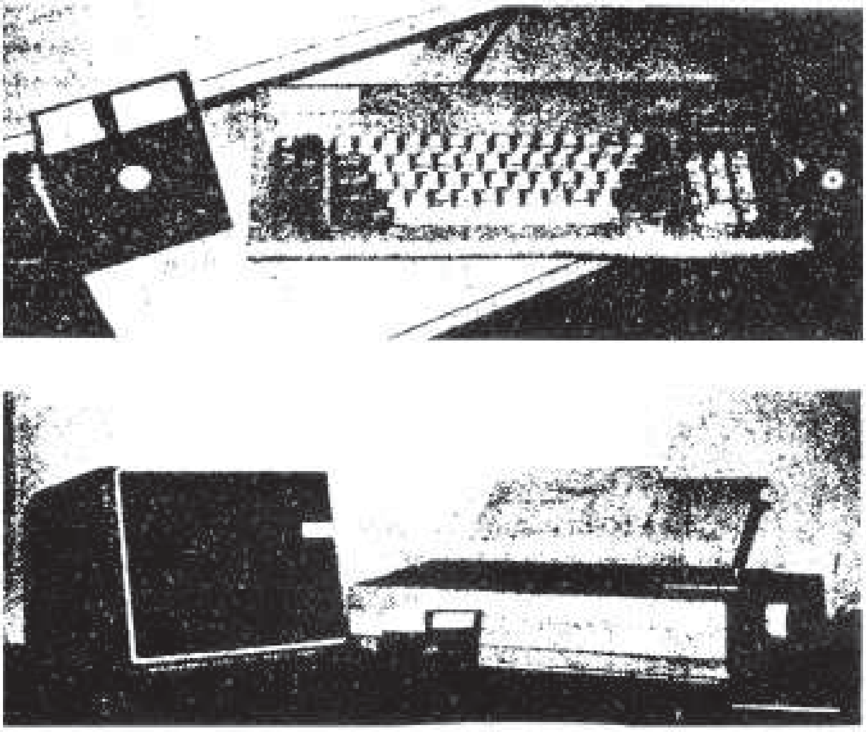

চিত্র ৩০.৪ : (ক) কয়েকটি তথ্যগ্রাহক ও (খ) তথ্যপ্রদায়ক ব্যবস্থা

অনুশীলনী ৪

(ক) নীচে দেওয়া শব্দগুলি ব্যবহার করে কম্পিউটার সম্বন্ধীয় উক্তিগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় কম্পিউটার .... এবং .... কাজের জন্য বেশি সুবিধাজনক। এগুলি একটিও .... না করে প্রতি সেকেন্ডে বহু .... গণনা করতে পারে। এগুলি .... পরিমাণ .... ও .... সঞ্চিত রাখতেও সক্ষম।

প্রচুর, সহস্র, নির্ভুল, উপাত্ত, ভুল, তথ্য, দ্রুত

(খ) প্রথম স্তম্ভে দেওয়া কম্পিউটারের অংশগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভে দেওয়া বৈশিষ্ট্য বা কার্যের মিল বার করুন।

১		২	
(i)	কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার	(ক)	ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পাটিগাণিতীয় যুক্তি প্রয়োজকের কাছে উপাত্ত হস্তান্তর করে।
(ii)	তথ্যগ্রাহক (ইন্‌পুট)	(খ)	কিছুসংখ্যক প্রোগ্রামের সমষ্টি।
(iii)	স্মৃতি	(গ)	তথ্যের প্রদর্শন বা সংরক্ষণ বা মুদ্রণ করে।
(iv)	নিয়ন্ত্রক	(ঘ)	সমস্ত ইলেকট্রনিক বর্তনী, চৌম্বক ফিতা ও মুদ্রক নিয়ে তৈরি।
(v)	পাটিগাণিতীয় যুক্তি প্রয়োজক	(ঙ)	উপাত্ত সংরক্ষণ করে।
(vi)	তথ্যপ্রদায়ক (আউটপুট)	(চ)	ট্রাফিক পুলিশের মতো বিভিন্ন অংশের মধ্যে নির্দেশের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
(vii)	কম্পিউটারের সফটওয়্যার	(ছ)	দুটি সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বা তাদের মধ্যে তুলনা করে।

কম্পিউটারের সফটওয়্যার

নির্দেশ না পাওয়া কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার কোন কাজই করে না। অর্থাৎ, কম্পিউটারকে নির্বাহ করার জন্য একটি কার্যসূচি বা প্রোগ্রাম দিতে হবে। কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম অনুযায়ী যা করতে বলা হয় সে শুধু তাই করে, তার অধিক কিছুই করে না। কম্পিউটার আমাদের মতো চিন্তা করতে পারে না। উপযুক্ত প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারকে শুধু সরল গাণিতিক কার্যই নয়, খুব জটিল গণনা ও যুক্তি প্রয়োগের নির্দেশও দেওয়া যায়, হিসাব রাখা, বিল তৈরি করা, এসব কাজ তো আছেই। কম্পিউটারের সফটওয়্যার দু ধরনের হয়, প্রায়োগিক সফটওয়্যার ও তন্ত্রগত সফটওয়্যার।

প্রায়োগিক সফটওয়্যার হল সমস্যার সমাধান এবং তথ্য বা উপাত্ত উৎপাদনের জন্য কিছু প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলি কিছু বিশেষ চিহ্ন বা লিপি ব্যবহার করে লেখা হয়, যেগুলিকে বলা হয় কম্পিউটারের ‘ভাষা’ (language)। সেগুলিকে BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এর কোনটি হিসাব রাখার জন্য উপযুক্ত, আবার কোনটি গাণিতিক গণনা বা যুক্তিভিত্তিক কাজকর্মের উপযুক্ত।

তন্ত্রগত সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও প্রায়োগিক সফটওয়্যারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। প্রোগ্রামের ভাষাকে হার্ডওয়্যারের ক্রিয়ার উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। তন্ত্রগত সফটওয়্যার কম্পিউটারের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই বিধৃত থাকে, ব্যবহারকারী এটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন না।

অনুশীলনী ৫

(ক) FORTRAN একটি প্রায়োগিক সফটওয়্যার ভাষা, না তন্ত্রগত সফটওয়্যার ভাষা, না দুই এরই ভাষা?

(খ) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, তন্ত্রগত সফটওয়্যার, প্রায়োগিক সফটওয়্যার ও ব্যবহারকারীর সম্পর্ক বোঝাতে একটি চিত্র অঙ্কন করুন।

৩০.৩.২ মাইক্রো ও মিনি কম্পিউটার, মেনফ্রেম (mainframe), দৈত্যাকার কম্পিউটার ও এগুলির ব্যবহার

কম্পিউটার বিভিন্ন আকারের হতে পারে। তাদের গণনার ক্ষমতাও অনেকটাই কমবেশি হতে পারে। আকার, দাম ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী নানারকমের কম্পিউটার ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ বেশ দুরূহ কাজ।

তবে তা সত্ত্বেও আমরা মাইক্রোকম্পিউটার, মিনিকম্পিউটার, মেনফ্রেম ও সুপারকম্পিউটার (অর্থাৎ দৈত্যাকার) সম্বন্ধে শুনতে পাই, এগুলির সম্বন্ধে লেখাও পড়ি। এধরনের শ্রেণিবিভাগ অনেকটাই ঠিক সুস্পষ্ট নয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারের দাম ও কর্মক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে একই হতে পারে। যেমন ধরুন, প্রস্তুতকারক যে শক্তিশালী কম্পিউটারটি মিনি হিসাবে বিক্রি করলেন, সেটি হয়তো একটি ছোটো মেনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় আরও বেশি গণনা করতে পারে, আরও উপাত্ত ধরে রাখতে পারে আর দামেও হয়তো আরও বেশি। অথবা, প্রায়ই আপনি এমন শক্তিশালী মাইক্রোকম্পিউটার দেখবেন যা মিনি কম্পিউটারের চেয়ে কাজেও ভালো, দামেও কম।

যে সব কম্পিউটার বাড়িতে অফিসে ও ব্যবসায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে বলা হয় মাইক্রো কম্পিউটার বা ব্যক্তিগত কম্পিউটার (Personal Computer, PC)। প্রচুর পরিমাণ উপাত্ত নিয়ে কাজ করা এবং সেগুলি ধরে রাখার ক্ষমতা থাকার ফলে ব্যবসায় এই কম্পিউটারের প্রচুর ব্যবহার হয়। এখন অনেক কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে বিল ও বিবরণী তৈরি করা যায়। ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সাহায্যে একজন ম্যানেজার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সাজিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন।

কম্পিউটার-সহায়িত-পরিকল্পনার (Computer-aided-design, CAD) প্রোগ্রামের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের প্রস্তাবিত উৎপাদনীয় বস্তু কম্পিউটারে পরিকল্পিত করতে পারেন, পরখ করে দেখতেও পারেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে উৎপাদনের জন্য সঠিক বস্তুটির নকশা দিতে পারেন। এমন কী, কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে যে একীকৃত বর্তনীর (I.C.) ব্যবহার হয় সেগুলির নকশাও কম্পিউটারেই তৈরি করা হয়।

আপনি যে পাঠক্রম পড়ছেন তার বইগুলির পাণ্ডুলিপি ছাপতে ও সংশোধন করতে 'ওয়ার্ড-প্রসেসর' (word-processor) হিসাবে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে। টাইপরাইটারে একটি ভুল শব্দ পালটাতে হলে বা একটি অনুচ্ছেদ বাদ দিতে হলে পুনরায় টাইপ করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কম্পিউটারে সমস্ত পাঠ্যাংশটি একটি ফ্লপি ডিস্কে ধরে রাখা হয় এবং ইচ্ছামতো সেটিকে একটি পর্দায় দেখানো যায়। আমরা তাতে যতখুশি সংশোধন ও সংযোজন করতে পারি, প্রয়োজনমতো যে কোনও অংশ বাদ দিতে পারি। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই আমরা বিষয়টির ছাপার কাজ করি।

ব্যক্তিগত কম্পিউটারকে মেনফ্রেম বা সুপার কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এর ফলে ব্যবহারকারীরা এখন তাঁদের প্রোগ্রাম মেনফ্রেম কম্পিউটারে চালিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে তার ফলাফল পেতে পারেন। অর্ধপরিবাহী-প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ক্রমশ আমাদের জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। উন্নত দেশে লোকে ইতিমধ্যেই গৃহস্থালির বাজেট ও আয়করের বিবৃতি তৈরি করতে, নাম-ঠিকানা ধরে রাখতে, চিঠি লিখতে, এমনকি খেলা ও বিনোদনের জন্যও ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার করে।

মিনি কম্পিউটারও একটি ছোটো, সাধারণ কাজকর্মের উপযুক্ত যন্ত্র, তবে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের চেয়ে দামি। ছোটো টেবিলের ওপর রাখার উপযুক্ত মডেল থেকে শুরু করে এটি আকারে চারটি ড্রয়ার লাগানো ফাইল রাখার ক্যাবিনেটের মতো হতে পারে। একটি মিনি কম্পিউটারে একাধিক ব্যক্তি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম চালাতে পারেন। তার ফলে এটি অফিস বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশ উপযুক্ত।

কম্পিউটার সহায়িত শিক্ষাদান ছাত্রদের কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করে। এখানে ধাপে ধাপে লেখা একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এক একটি ধারণা এক একবারে দেখানো হয়। এর পরেই থাকে কিছু

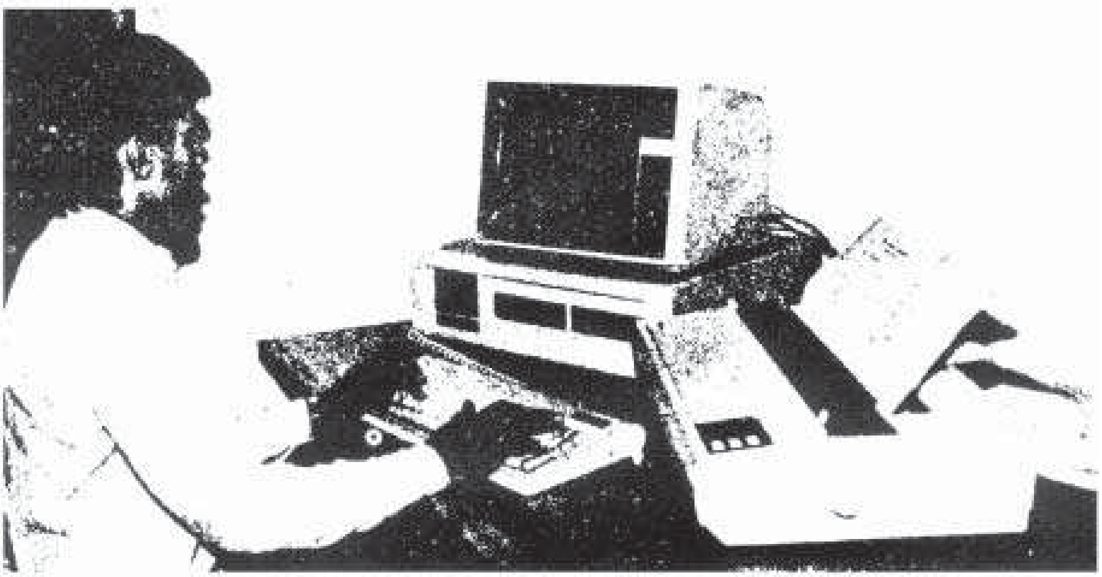

চিত্র ৩০.৫ : ব্যক্তিগত কম্পিউটার।

অনুশীলনী যেগুলির সমাধান করার পরই ছাত্রটি পরের ধাপে যেতে পারে। ব্যক্তিগত ও মিনি কম্পিউটারকে তালিম দেওয়ার কাজেও লাগানো যায়। আমরা যেমন পছন্দের গান শোনার জন্য ক্যাসেট কিনি, তেমনি যে-কোনো বিষয় শেখার জন্য একটি প্রোগ্রাম কিনলেই হয়। ছাত্ররা নিজেদের প্রোগ্রাম রচনা করতে এবং কম্পিউটারে সেগুলি চালাতেও শেখে।

কম্পিউটার প্রতিবিম্ব বা চিত্র রচনা করতেও সক্ষম। হাসপাতালে রোগীদের ইতিবৃত্ত সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার হয়, আবার তার সাহায্যে মস্তিষ্ক, ফুসফুস বা দেহের অন্য কোন অংশের রঙিন প্রতিবিম্বও তৈরি করা যায়।

মিনি ও মাইক্রোকম্পিউটার আসার আগে সব গণনাকার্যই মেনফ্রেম কম্পিউটারে করা হত। এই কম্পিউটার একসঙ্গে অনেকে ব্যবহার করতে পারেন। মিনি বা ব্যক্তিগত কম্পিউটারের তুলনায় এর স্মৃতি অনেক বড়ো, কাজের দ্রুততাও অনেক বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা জটিল গণনার জন্য এগুলি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ব্যাংক এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আয়োগের (ONGC) মতো বড়ো সরকারি প্রতিষ্ঠানও মেনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করে।

এ পর্যন্ত তৈরি বৃহত্তম, দ্রুততম ও সবচেয়ে দামি কম্পিউটার হল সুপারকম্পিউটার। প্রতি বছর এই কম্পিউটার অল্প কয়েকটি মাত্র তৈরি হয় কেননা অতি অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানেরই এগুলির প্রয়োজন হয় বা এই কম্পিউটার কেনা সামর্থ্যে কুলায়। এগুলির অন্যতম ব্যবহার হল আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জ্ঞাপনে। কৃত্রিম উপগ্রহ, বিমান ও ভূমিস্থ আবহাওয়া কেন্দ্রের এক বিশ্বজোড়া জালিকা থেকে পাওয়া তথ্য ও চিত্র সুপার কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়। কয়েকটি জটিল প্রোগ্রামের সাহায্যে এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তবেই পূর্বাভাষ দেওয়া যায়।

সেনাবাহিনীও নানাকাজে কম্পিউটার ব্যবহার করে। এর মধ্যে আছে প্রচলিত ও বৃহদাকার যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের নকশা তৈরি থেকে আরম্ভ করে পুরো যুদ্ধকৌশলের পরিকল্পনা। পারমাণবিক অস্ত্রের অবস্থিতি, সন্ধান কার্য ও নিক্ষেপের নিয়ন্ত্রণেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

কখনও কখনও জালিয়াতি বা অন্য অপরাধের জন্য কম্পিউটারের অপব্যবহারও হয়ে থাকে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে সব তথ্য জমা থাকলে কোন ব্যক্তির আয়ব্যয়, ট্যাক্স, ব্যাংকের জমার হিসাব, কেনাকাটা, পত্রপত্রিকার চাঁদা, বন্ধুবান্ধব, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য জেনে নেওয়া সম্ভব। এগুলি থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক মতাদর্শও প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এটি ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার ওপর আক্রমণ এবং এটি নাগরিক জীবনের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। কম্পিউটারে তথ্যের তথ্যাধিক কেন্দ্রীভবন রাষ্ট্র বা অপরাধীদের দ্বারা অপব্যবহারের এই সুস্পষ্ট বিপদ ডেকে আনে। কম্পিউটার সংক্রান্ত ভুলের কথা সুবিদিত। এগুলি প্রচণ্ড বিপদ ডেকে আনতে পারে। অযত্নপ্রসূত ভুলের জন্য নিশ্চিন্তে থাকা গ্রাহকদের কাছে হাজার হাজার টাকার বিদ্যুতের বিল পাঠানো হয়। কম্পিউটার অনেক সময় উড়ন্ত পাখিকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ধরে নিয়ে পৃথিবীকে বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

কম্পিউটার হল দুদিকে ধার দেওয়া তরবারির মতো। একদিকে এটি আমাদের একঘেয়ে কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে এটি সবসময় আমাদের নজরদারির মধ্যে রাখে। ঠিক কীভাবে এর ব্যবহার হবে তা নির্ভর করে যাঁরা এই প্রযুক্তির ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন শুধু তাঁদেরই ওপর। বিকল্পটি আমাদেরই বেছে নিতে হবে। কম্পিউটার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আমরা বিপদ এড়িয়ে কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্যবহার থেকে উপকৃত হতে পারব।

৩০.৩.৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কম্পিউটারকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্পণ করা হল কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি নূতন সংযোজন। সাধারণ কম্পিউটার জটিল গণনা করতে পারে, যুক্তিভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতেও এটি সক্ষম। প্রোগ্রামের দ্বারা কম্পিউটারকে দিয়ে দাবা খেলানো যায়। কিন্তু কম্পিউটারকে এজন্য কাজের পুরো ছকটি বিশদভাবে দিয়ে দিতে হবে। এই প্রোগ্রামটি যিনি বানাবেন কম্পিউটার তাঁর চেয়ে ভালো দাবা খেলবে না। এগুলির একমাত্র সুবিধা এই যে এটি যে কোনও একটি চালের সবরকম সম্ভাব্য ফলাফল খুব দ্রুত পরীক্ষা করে আসল চালটি দিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা বলতে শুধু যুক্তি খাটানো, বিশ্লেষণ করা আর সিদ্ধান্ত নেওয়া বোঝায় না। একটা অবস্থা বুঝে নিয়ে কীভাবে সেখানে সামাল দেওয়া যাবে সেটি স্থির করাও বুদ্ধিমত্তার মধ্যেই পড়ে।

কথা শুনে বুঝতে পারার সহজ ব্যাপারটাই ধরুন। একটি বাক্য পুরুষ, নারী বা শিশু, অর্থাৎ বিভিন্ন বক্তা যত আলাদাভাবেই বলুন না কেন, মানুষের কর্ণ আর মস্তিষ্কের স্নায়বিক প্রক্রিয়া মিলিতভাবে বাক্যটি বুঝতে পারে এবং তার প্রতিটি শব্দকে চিনে নিতে পারে। পরীক্ষাটি যদি একসারি অর্থহীন শব্দ বা আওয়াজ নিয়ে করা যায়, তাহলে মানুষ্যযন্ত্রও সেগুলির ৫০ শতাংশের বেশি চিনতে পারে না। সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের

মন প্রসঙ্গ, ব্যাকরণ এবং সেই সঙ্গে বক্তা নির্বিশেষে বিভিন্ন রকম শব্দ শোনার অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শব্দ চেনার ক্ষমতা ব্যবহার করে।

কম্পিউটারকে দিয়ে এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করাতে হলে তাকেও শত শত শব্দের নমুনা সঞ্চিত রাখতে হবে এবং বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির প্রতিটি ধ্বনিকে ওই নমুনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এবার এটিকে পরীক্ষা করতে হবে একটি বিশেষ শব্দের আগে পরে কোন কোন শব্দ আছে এবং সেগুলি একটি ব্যাকরণগত গঠনের সঙ্গে খাপ খায় কিনা। এটা হলে কম্পিউটারও একটি বাক্য বুঝতে পারবে। কিন্তু হায়, বর্তমানে কম্পিউটার এই কাজ শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে না। একাজ কেবলমাত্র বুদ্ধিমান কম্পিউটারই করতে পারবে।

সুতরাং কৃত্রিম বা কম্পিউটারের বুদ্ধিমত্তার জন্য কম্পিউটারকে প্রথমে যে কোনও বিশেষ সংকেত প্রক্রিয়াকরণের নিয়মগুলি শিখতে হবে এবং তার পর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার তৈরি করা হচ্ছে। 'বুদ্ধিমত্তা'র সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা এবং কম্পিউটারে বুদ্ধিমত্তা যোগ করার জন্য পরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়েছে, যদিও তার উদ্দেশ্য কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ, যেমন মহাকাশযান থেকে নেওয়া পৃথিবীর আলোকচিত্র ও উপাত্ত থেকে বিমান অবতরণক্ষেত্র, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ক্ষেত্র বা উন্মুক্ত সাগরে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা। এধরনের কম্পিউটার তৈরি হওয়ার পথে। এবং একবার এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারলে এপথে আমরা অনেকটাই এগিয়ে যাব। তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে দুবছরের শিশুও অন্যের কথা বুঝতে পারে এবং নিজের চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। আদেশমাফিক খাটার দিক দিয়ে কম্পিউটার একশো জন গণিতজ্ঞের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু ওই দুবছর বয়সির সমকক্ষ হতে কম্পিউটারের এখনও অনেক উন্নতির প্রয়োজন।

অনুশীলনী ৬

নীচে দেওয়া জায়গায় 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

৩০.৪ বোরটবিদ্যা

একটি কারখানায় প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় প্রধান কম্পিউটার তার স্মৃতি থেকে আগের দিন পাওয়া খরিদ্দারদের ফরমায়েশের তালিকা বার করে সেগুলি মূল প্রোগ্রামের কম্পিউটারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সকাল সাড়ে সাতটায় এই কম্পিউটারটি যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার লাইন (assembly line) চালু করে আর কী তৈরি করতে হবে তার নির্দেশ পাঠায়। মাল বওয়ার বেল্ট (conveyor belt) আর রোবটেরা হুসহাস শব্দ করে আর আলো দপদপিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ২৬টি জোড়া দেওয়ার কেন্দ্রে পকেট-রেডিয়োর আকারের প্লাস্টিকের কেস তৈরি হয়ে বেরোতে থাকে। প্রথম কেন্দ্রে একটি রোবট প্রত্যেকটি কেসের ওপর একটি কম্পিউটারে ছাপানো

লেবেল সেঁটে দেয়। এই লেবেলেই বলা থাকে কোন কেসের মধ্যে কোন কোন অংশ লাগাতে হবে। পরের প্রতিটি কেন্দ্রে রোবটেরা লেবেলের নির্দেশ প'ড়ে নির্দেশ পালন ক'রে যায়। শেষে একটি লেজার-প্রিন্টার কেসের ওপর সামগ্রীটির সম্বন্ধে তথ্য ছেপে দেয়। এবার সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই হয় এবং বাক্সে ভরে জাহাজে তোলার বন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সমস্ত ব্যাপারটি কী ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা বলে মনে হল? তা কিন্তু নয়। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি কম্পিউটার-চালিত কারখানার বাস্তব চিত্র। এই কারখানার শ্রমিকরা সকলেই রোবট। তারা মাত্র চারজন যন্ত্রবিদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০০টি জিনিস উৎপাদন করে। রোবট নামের এই আশ্চর্য যন্ত্রগুলি আসলে কী? এই অংশে আমরা রোবট ও রোবটবিদ্যা সম্বন্ধে কিছুটা জানব।

৩০.৪.১ রোবট ও রোবট-বিদ্যা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি

রোবটের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও ব্যবহারের বিজ্ঞানই হল রোবটবিদ্যা। এই রোবট আসলে কী? অনেকে মনে করেন রোবট হল দেখতে, শুনতে, অনুভব করতে, হাঁটতে ও কথা বলতে পারে এমন যন্ত্রমানব। এ জাতীয় রোবট এখনও দূরের স্বপ্ন। যে সব রোবট এখন ব্যবহার করা হয়, সেগুলি মূলত কম্পিউটার চালিত যন্ত্র। প্রোগ্রামের সাহায্যে সেগুলি দিয়ে নানারকম কাজ করানো যায়। আসুন, দু একটি উদাহরণ দেখা যাক, যাতে রোবট কী তা বুঝতে সুবিধা হয়।

রোবটকে দিয়ে নানারকম কাজ করানো যায়। যেমন একটি রোবট নানা আকারের গর্ত করতে পারে। রোবটকে দিয়ে সবজি বাছাই, ভেড়ার লোম ছাঁটা, মুরগি ছাড়ানো, চালের পিঠে তৈরি, যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজ করানো যায়। রোবট ট্রেন যাত্রীদের কাজের জায়গায় নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। রোবট ঘড়ি বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশের মতো সূক্ষ্ম জিনিসও বানাতে পারে। কারখানায় রোবট স্পট্-ওয়েল্ডিং এবং স্প্রে-পেন্টিং-এর কাজও করে।

প্রোগ্রামের দ্বারা বোরটকে এক কাজ থেকে অন্য কাজে লাগানো যায়। নতুন কাজ করতে শেখানোও যায়। যেমন ধরুন, একই রোবট গর্তও করতে পারে আবার সেই গর্তে বোল্ট্ লাগাতেও পারে। একটি রোবট কিছুক্ষণ একটি কাজ করার পর অন্য কাজ, আবার তারপর আরও অন্য কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ইংরেজি হরফ বেছে নিয়ে কিছু টাইপরাইটারে লাগাতে পারে, তারপর আরও কয়েকটিতে হিন্দী হরফ এবং তৃতীয় আর একটি গুচ্ছে আরবি হরফ লাগিয়ে দিতে পারে। 'টি' নামের শিল্পে ব্যবহৃত একটি রোবট নিজেই র‍্যাক থেকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বেছে নিতে পারে, .০০৫ ইঞ্চ সূক্ষ্মতার সঙ্গে গর্ত করতে পারে এবং ২৫০টি আলাদা যন্ত্রাংশের পরিসীমা মাপতে পারে। F-16 যুদ্ধবিমান বানানোর কাজে এটির ব্যবহার হয়।

এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে রোবট হল একটি কম্পিউটার-চালিত, বহু-উপযোগিতা বিশিষ্ট, বারবার প্রোগ্রাম করার যোগ্য যন্ত্র যা দিয়ে বহু রকমের কাজ করানো যায়। তবে রোবট সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানলাম তার বাইরেও কিছু বলার আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের দ্বারা রোবটকে প্রচুর মনুষ্যসুলভ ক্ষমতা দেওয়া গেছে। তার কয়েকটি আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

রোবটকে দৃষ্টিদান

রোবটকে দিয়ে কোন বস্তু বা দৃশ্য 'দেখানো' যায়। রোবটের আলোক-সংবেদকগুলি (optical sensors)

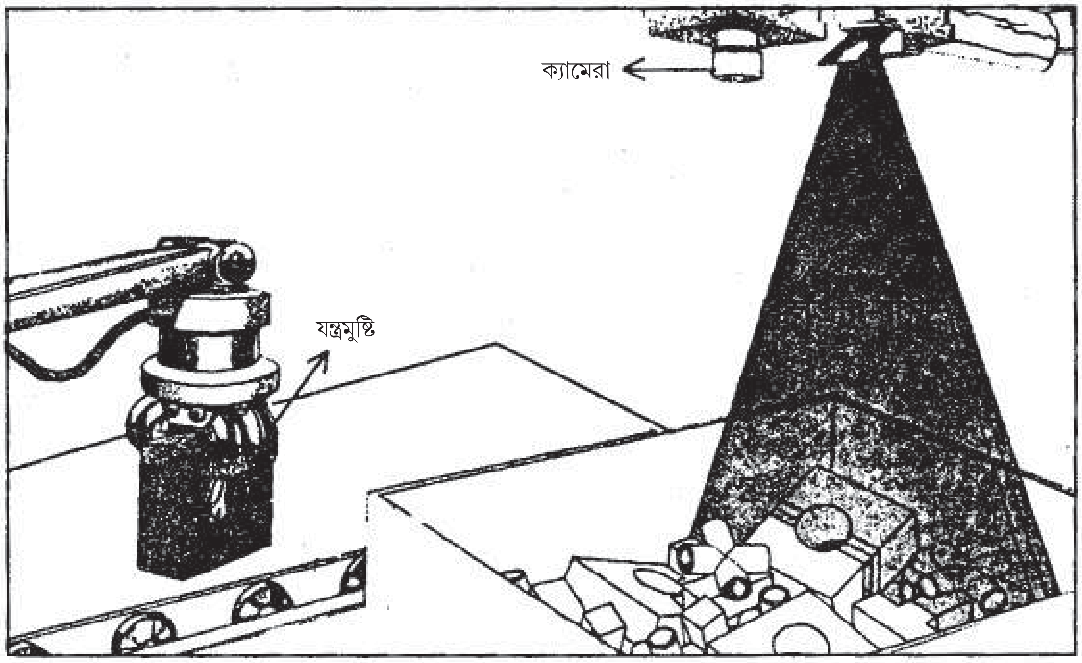

চিত্র ৩০.৬ : ঝুড়ি থেকে তোলার রোবট। নানা আকারও আকৃতির এক ঝুড়ি যন্ত্রাংশ একটি লেজার দিয়ে আলোকিত করা হয়। একটি ক্যামেরা বিভিন্ন বিন্দুতে বস্তুগুলির ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করে। রোবটের মধ্যেকার কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বস্তুটির ঔজ্জ্বল্যের প্যাটার্নটির মধ্যে কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে নেয়। তারপর কম্পিউটার যন্ত্রমুষ্টিকে (gripper) যথাস্থানে আনে ও বন্ধ ক'রে জিনিসটি তুলে নেয়।

কোন বস্তু থেকে আসা আলোর কম-বেশি হওয়া ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করে। কোন বস্তুকে চেনার জন্য কম্পিউটার তার স্মৃতিতে থাকা একটি প্রতিবিম্বের বিভিন্ন বিন্দুর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে বস্তুটির প্রতি বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য মিলিয়ে দেখে। ঔজ্জ্বল্যের মিল হলে কম্পিউটার তখন যেন বস্তুটিকে 'দেখতে' পায় এবং তখন এটি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে (চিত্র : ৩০.৬)।

রোবটীয় দৃষ্টি নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তৈরি করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে এ জাতীয় দৃষ্টির সাহায্যে রোবট গাড়িতে জানালা লাগাতে পারে, বা কোন জিনিস তুলেল তা অন্য জায়গায় রাখতে পারে। দৃষ্টিশীল রোবটকে দিয়ে সাধারণ পরিদর্শনের কাজ করানো যায়, যেমন বোতল সঠিক স্তর পর্যন্ত ভরা হয়েছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। রোবটীয় গুণমান-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর দোষ-ত্রুটি ধরা ও বাতিলগুলিকে সরিয়ে ফেলার কাজ করা যায়।

প্রত্যেক আধুনিক প্রযুক্তির মতো রোবটকেও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবহার করা যায়। এখানে দৃষ্টিশীল রোবটের একটি উদাহরণ হল 'টোম্যাহক' নামের বিচরণকারী ক্ষেপণাস্ত্র (Tomahawk cruise missile)। এটি বেশ কয়েকটি পারমাণবিক বিস্ফোরক বহন করে মারাত্মকরকম নির্ভুল লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট বস্তুর ওপর ফেলতে পারে। এটি লক্ষ্যবস্তুর কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে, জাহাজ, সাবমেরিন বা মাটির ওপর থেকে নিক্ষেপ করা যায়। এর কম্পিউটারের স্মৃতিতে উদ্দিষ্ট উড়ানপথের পর পর অনেকগুলি ভূদৃশ্যের চিত্র ধরা

থাকে। ক্ষেপণাস্ত্রটি ভূদৃশ্যের ওপর নজর রাখে এবং স্মৃতিতে রাখা প্রতিবিম্বের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখে। পথভ্রষ্ট হলে এটি উড়ানপথের সংশোধন করে। লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে এটি শেষবারের মতো উপযোজন করে নেয়। অন্তত এর প্রস্তুতকারকরা এটাই দাবি করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অস্ত্রের বাজারে কখনও কখনও জনসাধারণ ও "শত্রু"-দের প্রভাবিত করতে অতিরঞ্জিত দাবি করা হয়।

রোবট-বাহুর কাজকর্ম

রোবটের গড়ন এমন হতে পারে যাতে সেটি মানুষের বাহুর মতো কাজ করতে পারে। রোবট-বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটার বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কারিগরির জ্ঞান ও দক্ষতা মিলিয়ে বাহুযুক্ত রোবট তৈরি করেন। কাজ করার সময় রোবট-বাহুর সন্ধিগুলি অনেকরকম অবস্থানে যেতে পারে। এই অবস্থানগুলি বোঝাতে লক্ষ লক্ষ সংখ্যা রোবটের স্মৃতিতে রাখা থাকে। বাহুর মধ্যে কিছু বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা এই সংখ্যাগুলিকে মৌলিক গতিতে রূপান্তরিত করে।

রোবট-বাহুতে সাধারণত আঙুলযুক্ত হাত থাকে না। তার বদলে কিছু বিশেষ কাজের যন্ত্র লাগানো থাকে, যা হাতের কাজ করে। এগুলির সাহায্যে একই রোবট স্প্রে-গান ব্যবহার করে রং স্প্রে করতে পারে, ধাতুর ওয়েল্ডিং করতে পারে বা জিনিসপত্র তুলে সেগুলি সাজিয়ে রাখতে পারে (চিত্র ৩০.৭)।

হেঁটে চলা রোবট

স্থির হয়ে বসে একটু ভেবে দেখুন, চলে ফিরে বেড়ানোর জন্য চাকার তুলনায় আমাদের পায়ের সুবিধা কী কী।

চাকা সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। বাধা ডিঙিয়ে চলতে, সরু জায়গার মধ্য দিয়ে যেতে, নরম, উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে যেতেও সেটি অক্ষম। মানুষ ও পশু সবসময়েই পা রাখার এমন জায়গা বেছে নিতে পারে যা তাকে ভার সামলাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে, বিশেষ করে পাহাড়ের ওপর। আসলে ভূপৃষ্ঠের অর্ধেক জায়গাই এমন যে তার ওপর চাকা চালানো খুব শক্ত। যে সব প্রাণীর পা আছে তাদের পক্ষে গুঁড়ি মেরে চলা, কোন কিছু বেড়ে ওঠা, ভারসাম্য রাখা, হাঁটা, ছোটা, সবই সম্ভব। আমাদের পা আবার হাঁটুতে ভাঙাও যায় যার ফলে মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়। সুতরাং রোবট যাতে সহজে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য তার পা চাই। রোবটবিদ্যায় পা-ওয়ালা রোবট নির্মাণ; দেখা গিয়েছে বেশ শক্ত কাজ। পা-লাগানো গাড়িতে কম্পিউটার বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, ভারসাম্য, সমন্বয়ন এবং উঁচু-নীচু রাস্তায় হাঁটার সমস্যাগুলির সমাধান খুবই দুরূহ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

রোবটের নড়াচড়া ছাড়াও তার মধ্যে স্বাভাবিক নমনীয়তা আনা, হাতে কাজ করার, স্পর্শ করার ও শোনার ক্ষমতা দেওয়া আজকাল রোবটবিদ্যায় সক্রিয় গবেষণার বিষয়।

স্বাভাবিকভাবেই, রোবটের চোখ, কান, হাত, পা-কে মানুষের ক্ষমতার কাছাকাছি আনতে এখনও অনেক দূর এগোতে হবে। রোবটের কোন কিছু অনুভব করার বা চিন্তা করার দক্ষতাকে বড়ো জোর প্রাথমিক বলা যায়। তবে একথা ভুললে চলবে না যে আমরা সহস্র-লক্ষ বছরের জৈব বিবর্তনের ফসল। রোবট ও জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে অতি ক্ষীণ সাদৃশ্য আনতেও আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন।

অনুশীলনী ৭

নীচে দেওয়া জায়গায় সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

(ক) স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রি, চুলা প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থেকে একটি রোবট কোন দিক দিয়ে স্বতন্ত্র?

(খ) রোবটকে দিয়ে কীভাবে দেখানো ও হাত দিয়ে কাজ করানো যায়?

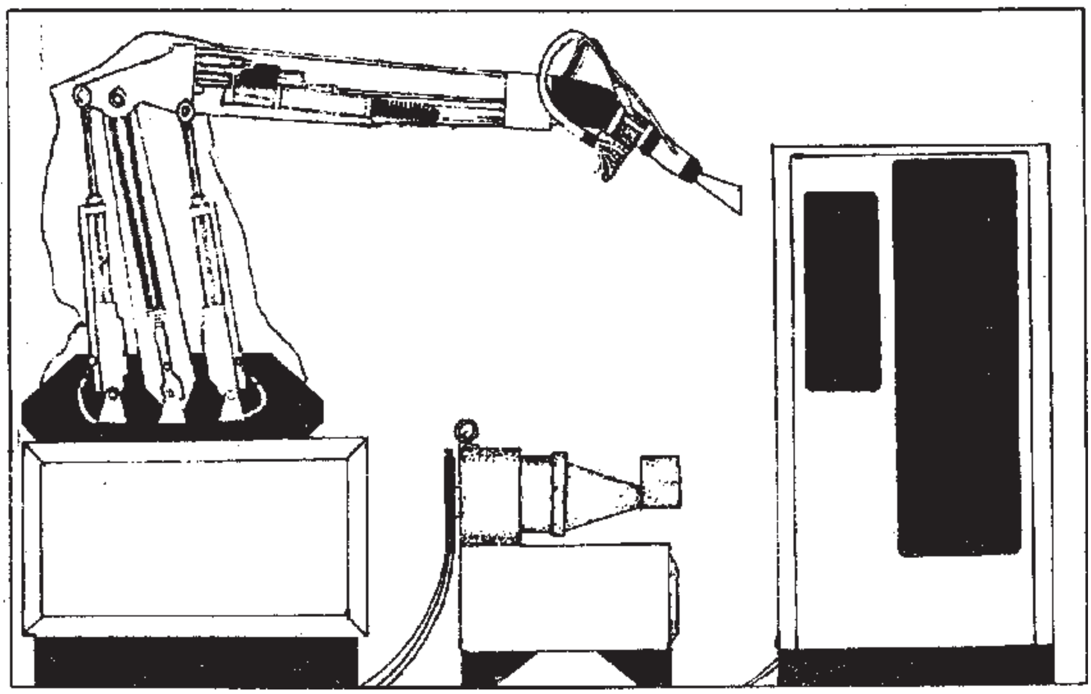

চিত্র ৩০.৭ : (ক) স্প্রে পেন্টিং এর জন্য ৪৫০ কেজি ওজনের একটি রোবট-বাহু। (খ) একটি হাইড্রলিক পাম্প বাহুটির যান্ত্রিক অংশগুলিকে চালাচ্ছে এবং (গ) একটি আলাদা ছয় ফুট উঁচু বসানো কম্পিউটার রোবটের কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে কম্পিউটারটিকে বাহুটির মধ্যে তৈরি করা কম্পনের ফলে সেটিতে গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা থাকত।

৩০.৪.২ রোবটই যেখানে তারকা

উন্নয়নের এই অবস্থাতেও মানুষের তুলনায় রোবটের কয়েকটি সুস্পষ্ট সুবিধা আছে। রোবট কোন ছুটি না নিয়ে সপ্তাহে সাত দিন, দিনে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে যেটা মোটেই মানুষের মতো নয়। কল্পনা করুন কারখানার মালিকরা তাদের কত ভালোবাসেন! তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাদের কাজ করতে পারে। ঠিকমতো প্রোগ্রাম করলে রোবট একটা কাজ সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে লক্ষবার করে যেতে পারে। এবং এতে তারা কখনই বিরক্ত বা অসতর্ক হয় না। যেমন, রোবটেরা অর্ধপরিবাহী চিপের ওপর শত শত আণুবীক্ষণিক সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখতে পারে। এ ধরনের খুঁটিনাটির কাজ করতে একজন মানুষের পক্ষে প্রচণ্ড মনঃসংযোগের প্রয়োজন হত।

রোবটরা অত্যধিক তাপ, শীতলতা, ধুলা, বিকিরণ ও বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল। তারা অক্সিজেনবিহীন স্থানে এমনকি শূন্যেও কাজ করতে পারে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কাজও রোবট করতে পারে। যে সব কাজে প্রচণ্ড ক্ষমতার প্রয়োজন বা যেখানে অতি সাধারণ অথচ ক্ষতিকর ভুল হওয়া সম্ভব সে রকম কাজও রোবট করতে পারে।

৩০.৪.৩ রোবটের জন্য প্রস্তুতি

ওপরে যেসব কারণগুলি বলা হল তার জন্য রোবট-চালিত কারখানার কাজ গুণে উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্য-চালিত ব্যবস্থার তুলনায় অনেক গুণ বেশি হয়। ফলে সাধারণ মালের তুলনায় রোবট চালিত কারখানার উৎপন্ন মাল বাজারে অনেক সুবিধা পায়। উন্নতিশীল দেশের কাছে এটি একটি চিন্তার বিষয়। এই কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাদের রোবট-জনসংখ্যা গুণতে শুরু করেছে। আমরাও আমাদের গবেষণাগারে রোবট তৈরির কাজ আরম্ভ করেছি।

রোবট মানুষের শ্রমের জায়গা নিয়ে ফেলবে, এই ভেবে কেউ কেউ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। কিন্তু এটাও ঠিক যে কিছু কাজ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে রোবট অন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। উন্নত দেশে বোরটীয় শিল্প ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থানের একটি সুযোগ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এ ছাড়া, রোবট-বিপ্লব কজের চরিত্রেই একটা পরিবর্তন আনবে। এটা ঠিকই যে রোবটরা ক্রমশ শ্রমিকদের কাজের বোঝা নিয়ে নেবে। কিন্তু যে সমস্ত কাজ যন্ত্র করতে পারে না তা করার জন্য আরও বেশি মানুষের প্রয়োজন হবে। যে সব 'জ্ঞান-কর্মী' টেবিল চেয়ারে বসে তথ্য দেওয়া-নেওয়া, চিন্তা ও পরিকল্পনার কাজ করবেন, মোট কর্মীকুলের আরও বড়ো অংশ হবেন তাঁরাই।

৩০.৫ বস্তুবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এ পর্যন্ত আপনি নানা ধরনের প্রযুক্তির কথা পড়েছেন। এসব প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত এক বিশাল সংখ্যক উপাদান বস্তুর সঙ্গেও আপনার পরিচয় ঘটেছে। প্রাত্যহিক জীবনে যত রকমের বস্তুর সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটে তাও মোটেই অল্প নয়। আপনি যে কাপ থেকে চা পান করেন, যে বাইসিকল, বাস বা গাড়িতে যাতায়াত করেন, যে জামাকাপড় পরেন, যে সব আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহার করেন, তা সবই নানা বস্তুতে তৈরি। বাসের মতো একটি নির্দিষ্ট উৎপন্ন সামগ্রীও নানা বিভিন্ন ধরনের বস্তু দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে আছে নানা ধরনের লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত বা পেতলের মতো ধাতুসংকর, তা ছাড়া কাচ, রবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি। এমন কী বাসের বিভিন্ন অংশে যে ইস্পাত ব্যবহার হয় তারও আলাদা আলাদা ধর্ম থাকতে হবে। যেমন, চাকার অক্ষদণ্ড তৈরির ইস্পাত হবে দৃঢ় ও শক্তিশালী কিন্তু দরজা তৈরির ইস্পাত হবে পিটানোর মতো নমনীয় যাতে সেটি বেলনার সাহায্যে পাতলা পাতে পরিণত করা যায়।

যত রকমের বস্তু এখন পাওয়া যায় তার সীমা সংখ্যা নেই। যতরকম বিভিন্ন গঠনের ইস্পাত পাওয়া যায় তার সংখ্যাই কয়েক হাজার। কাচ আর প্লাস্টিকের যত প্রকারভেদ আছে তার সংখ্যা দশ হাজারের বেশি। নাইলন, রেয়নের মতো কৃত্রিম তন্তু তো বস্ত্র শিল্পেই পরিবর্তন এনে ফেলেছে। নানা রাসায়নিক পদার্থ, সার, কীটনাশক ও ভেষজ হল আরও কিছু বস্তুর উদাহরণ। তন্তুকাচ (Fibre glass) অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে হালকা অথচ ইস্পাতের চেয়ে শক্তিশালী। এটি শক্তসমর্থ আসবাব, স্যুটকেস প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়া অর্ধপরিবাহীগুলিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বস্তু, যেগুলি সম্বন্ধে আপনি আগেই পড়েছেন। সম্প্রতি ঘড়ি, ক্যালকুলেটর প্রভৃতির সূচক প্যানেল (display panel) তরল কেলাসের ব্যবহার খুবই প্রচলিত হয়েছে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে প্রতিদিনই নতুন বস্তুর উদ্ভাবন ঘটছে। এই সব বস্তু যেমন প্রকৃতিকে বশে আনতে মানুষের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে তেমনই তার নিজের মঙ্গলের জন্য প্রকৃতির সংরক্ষণেও সাহায্য করছে।

কিছু বিশেষ ধরনের কাচকে টেনে তন্তু তৈরি করে সেই তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রেরিত আলোকের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হয়। এ ধরনের কাচের কথা আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন। বস্তু প্রযুক্তির এই উন্নতি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অথবা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বিশাল পরিমাণ তথ্য প্রেরণের প্রচুর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এর সাহায্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার উন্নতি ঘটেছে। তন্তুবাহিত সংকেতের ক্রমশ ক্ষীণ হওয়া রোধ করতে আলোকীয় তন্তুর ক্রমোন্নয়ন ঘটেছে।

অর্ধপরিবাহী, একীকৃত বর্তনী ও কম্পিউটারের প্রসঙ্গে আমরা জার্মেনিয়াম ও সিলিকনের কথা উল্লেখ করেছি। এগুলিকে এক শতকোটি ভাগের একভাগ আর্সেনিকের বা বোরনের মতো পদার্থ দিয়ে ডোপিং করতে হয়। কিন্তু সবার আগে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সিলিকন বা জার্মেনিয়াম উৎপন্ন করতে হবে যা ৪০ বা ৫০ বছর আগে যা পাওয়া যেত তার থেকে একেবারেই আলাদা। বর্তমানে এমন অর্ধপরিবাহী তৈরি হচ্ছে যা লেজার রশ্মি অর্থাৎ সুসংগত আলোকের রশ্মি তৈরি করতে পারে। এই আলোক রশ্মি ধাতব তার বা আলোকীয় তন্তুর বদলে একটি বর্তনীর মধ্যে সংকেত বহন করে। বস্তুবিজ্ঞানের এই উন্নতির ফলে কম্পিউটারের কাজের গতি নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন নতুন ধরনের কম্পিউটার তৈরি সম্ভব হবে যা অনেক বেশি তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে।

নতুন বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মহাকাশ প্রযুক্তিরও অগ্রগতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে শুধু যে অত্যন্ত হালকা এবং অত্যন্ত দৃঢ় বস্তুর প্রয়োজন তাই নয়, এমন বস্তুও চাই যা মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় বায়ুর ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে উঠলেও গলে যাবে না। এর জ্বালানিও আর এক ধরনের বস্তু, যা কঠিন বা তরল হতে পারে, যা হালকা হবে, দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি দেবে, আবার এমন হবে যেন তার দহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে কম বেশি করা যায়। এই সব বস্তুর সাহায্যে শক্তিশালী মহাকাশযাত্রী রকেট ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০০ টনের মতো ওজন তুলতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে, ২০০ টন হল সাধারণ মাপের ২০০টি মোটর গাড়ির ওজন।

পলিমার নামের একজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে। এই পলিমার হল পরপর সাজানো ছোটো ছোটো অণুর দীর্ঘ শৃঙ্খল দিয়ে তৈরি। যে প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য সামগ্রীতে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কাপ, বালতি, দড়ি, থলি, বর্ষাতি ও অন্যান্য পোশাক-আশাক হিসাবে যা গ্রামাঞ্চলেও এত কাজে লাগে তাও এক ধরনের পলিমার। রবারও হল পলিমার, আর যে সেরামিক বস্তু দিয়ে চিনামাটির বাসন আর যাবতীয় অন্তরক (insulator) তৈরি হয় তাও আসলে এই পলিমারই। এই ক্ষেত্রটিতে বিশাল উন্নতি ঘটেছে। সেরামিক দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে যা ঢালাই করা ইস্পাতের চেয়ে অনেক হালকা এবং যেগুলি অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ চাপ ও উষ্ণতায় কাজ করতে পারবে। ইঞ্জিনের ওজন এতে যা আছে তার চার ভাগের এক ভাগ করা যাবে এবং ক্ষমতা বাড়িয়ে করা যাবে চারগুণ। সেরামিকের চুম্বক এখন প্রায়ই ব্যবহার হয়। চুম্বকের বল ও তার ওজনের অনুপাত এর ফলে একশো গুণেরও বেশি বাড়ানো গেছে। ক্ষুদ্র চুম্বকের শক্তি এখন আগেকার বড়ো বড়ো চুম্বকের সমান।

সম্প্রতি যে ক্ষেত্রটিতে বেশ কিছুটা উত্তেজনারর সৃষ্টি হয়েছে তা হল আগের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণতায় ক্রিয়াশীল সেরামিক অতিপরিবাহীর (super conductors) উদ্ভব। অনেক বছর ধরেই জানা ছিল যে কোন কোন বস্তুকে প্রায় মাইনাস ২৭০° সেলসিয়াস পর্যন্ত ঠান্ডা করলে তারা অতিপরিবাহী হয়ে যায় অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র তড়িৎবিভব তাদের মধ্যে বিশাল তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে বা তড়িৎ-প্রবাহের প্রতি তাদের রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। তবে বরফের গলনাঙ্কের ২৭০° সে নীচে পৌঁছানোই এত শক্ত ছিল যে এই ধর্মটি কেবলমাত্র পুঁথিগত আগ্রহের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে কোন কোন সেরামিক যে উষ্ণতায় অতিপরিবাহী হয়ে যায় তা আগের তুলনায় প্রায় ১৭০° সে বেশি। এর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে সেরামিক বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে একদিন আমরা সাধারণ ঘরের উষ্ণতাতেই অতিপরিবাহী বস্তু পেতে পারব। তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এখনকার মতো ভারী না হয়ে অনেক ছোটো হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারটার মধ্যেই এক আশ্চর্য বিপ্লব এসে যাবে। বিদ্যুৎ শক্তির প্রেরণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে কেননা তারের মধ্যে ক্ষমতার অপচয় ঘটবে না। যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটবে। বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন চালানোর খরচ অনেক কমবে, হয়তো বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ি, ট্রাকও চলতে শুরু করবে। এখনকার দূষণ সৃষ্টিকারী ও পুনর্নবীকরণ যোগ্য নয় এমন সম্পদ অর্থাৎ তেল ব্যবহারকারী গাড়িগুলির জায়গায় তখন অন্য গাড়ি ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে আরও অনেক ধরনের বস্তুর ব্যবহার হয় যার কিছু রাসায়নিক বা ভেষজের কারখানায়, আবার কিছু জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি হয়। এগুলির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় না গিয়েও এটি সহজেই বলা যায় যে নতুন প্রযুক্তি আর নতুন উপাদানবস্তু হাতে হাত মিলিয়ে চলে, একটির অগ্রগতি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। ধাতুবিদ্যা, মেশিনে সূক্ষ্ম কাজের ক্ষমতা, ঘর্ষণহ্রাসকারী তেল ও চর্বি, পেট্রোলিয়াম প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, ক্ষয়রোধী রবারের উৎপাদন, বায়ুপূর্ণ টায়ার, নানা সংশ্লিষ্ট বস্তু—এসবের ক্ষেত্রে বিশাল উন্নতি ঘটে না থাকলে মোটর গাড়ি তৈরিতে কখনই সাফল্য আসত না। উপাদান বস্তু এখন নিজস্ব অধিকারই গবেষণা ও উন্নয়নের একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান এখন এত উন্নতি করেছে যে আমরা এখন ইচ্ছামতো যে-কোনো কয়েকটি ধর্ম বিশিষ্ট বস্তু উৎপাদন করার অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

অনুশীলনী ৮

(ক) নীচের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে উৎপন্ন দুটি করে সামগ্রীর তালিকা দিন।

ধাতু, ধাতু-সংকর, পলিমার, তন্তুকাচ, কৃত্রিম তন্তু, তরল কেলাস।

....

....

....

....

....

....

....

(খ) তন্তু আলোকবিদ্যা, অর্ধপরিবাহী, মহাকাশ প্রযুক্তি ও অতিপরিবাহীর ক্ষেত্রে উন্নতি কোন কোন বিশেষ উপাদানবস্তুর জন্য সম্ভব হয়েছে?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩০.৬ প্রযুক্তির পূর্বাভাষ

প্রযুক্তির প্রসঙ্গে এবং তার ফলে সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষমতা অপরিসীম। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতের প্রযুক্তির পূর্বাভাষ কী দেওয়া সম্ভব? কেউ কী বলতে পারেন, আজ থেকে দশ বছর বাদে কী ধরনের সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে আসবে? ভারতের মতো দেশে সার্বিক পরিকল্পনার দিক থেকে এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রযুক্তি সম্বন্ধে এই প্রশ্নটির উত্তর বেসরকারি উৎপাদকদেরও আগ্রহ জোগাচ্ছে কেনন তাঁদের মুনাফা এর ওপর নির্ভর করবে।

প্রশ্নটি প্রথমে যা মনে হয় তার থেকে বেশি জটিল। বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি আর সেখান থেকে সমাজের উপযোগী জিনিসপত্রে পৌঁছানোর পথটি খুব সরল নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যবহার্য সামগ্রী হিসাবে কাজে লাগাতে এবং এই সমস্ত সামগ্রীর উন্নয়নের প্রয়োজন ঘটিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে আমাদের সমাজ কখনও কখনও বেশ কয়েক দশক সময় নিয়েছে। ফ্যারাডে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তড়িৎ আবেশের (electric induction) নিয়ম আবিষ্কার করেন। এই নিয়ম হল সমস্ত বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু সে সময় মোটর ও জেনারেটরের প্রয়োজন ছিল না, এসব ছাড়াই মানুষের বেশ চলে যেত। আপনি ভাবতে পারেন, তখন বাড়িতে ও পথঘাটে আলো জ্বালানোর জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার হত না কেন। এর উত্তরটি খুব সহজ—তখন বাল্‌বের আবিষ্কার হয়নি। যখন তপ্ত-ফিলামেন্ট বাল্‌ব প্রথম আবিষ্কার হল, তখনও

সেগুলি বেশি ঘণ্টা জ্বলত না কেননা ভালো নির্বাতন পাম্প তখন পাওয়া যেত না। আরও বড়ো বাধা ছিল বিদ্যুৎ বিক্রি করা ও তার দ্বারা মুনাফা করার সুযোগের অভাব। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে যখন এডিসন বাড়িতে ও কারখানায় জলের মতো বিদ্যুৎ বিতরণ করার জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করলেন তখনই এর একটা সুরাহা হল। এর প্রথম ব্যাপক ব্যবহার হল কারখানায় আলো জ্বালানোর কাজে, যাতে শ্রমিকরা সূর্যাস্তের পরে আরও কিছুক্ষণ কাজ করতে পারেন। সুতরাং অন্য প্রযুক্তি ও সামগ্রী উদ্ভাবিত হয়ে বিদ্যুৎ বিক্রি ও কারখানায় দীর্ঘতর কাজের সময়ের ফলে ব্যবসায়ে যাতে মুনাফা হয় তার জন্য ফ্যারাডের ধারণা বা আবিষ্কারকে প্রায় পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আবিষ্কার ও প্রয়োগের মধ্যে অপেক্ষার সময় এখন কমে গেছে (২৭.২ অংশ দেখুন)। কোন কোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি মাত্র কয়েক বছর। কিন্তু আগের অনুচ্ছেদে যে মডেলটির কথা বলা হল সেটি এখনও কার্যকরী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেকগুলি শাখা আছে। কিছু গবেষণা তাত্ত্বিক ও ভাবমূলক, আবার কিছু প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন কোন প্রযুক্তিকে সম্ভবপর করে তোলে। কিন্তু সম্ভবপর প্রযুক্তিকে সম্ভাব্য সাফল্যের প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করতে গবেষণা ও উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে পাওয়া ভিন্ন প্রযুক্তির প্রয়োজন হতে পারে। আবার সম্ভাব্য প্রযুক্তিকে প্রকৃতই প্রাপ্তিসাধ্য প্রযুক্তি হতে হলে সমাজকে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অথবা সেই প্রযুক্তি থেকে লাভ উঠানোর মতো বাজার থাকতে হবে (অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা সেটি তৈরি করতে হবে!) (চিত্র ৩০.৮ দেখুন)।

চিত্রটি অবশ্যই অত্যন্ত সরলীকৃত। যেমন, সময়ে বিলম্বগুলি এখানে দেখানো হয়নি কিন্তু প্রত্যেক স্তরেই এই বিলম্ব ঘটে। এ ছাড়া যোগসূত্রের সংখ্যা এখানে যা দেখানো হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি হতে পারে।

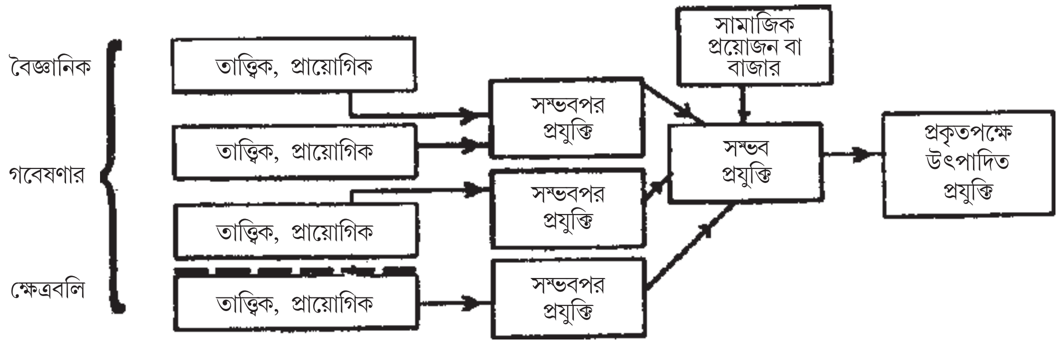

চিত্র ৩০.৮

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর এই পাঠক্রমের প্রায় শেষভাগে এসে আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন যে আজকালকার বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাজার তৈরি করতে, মানুষকে তাদের যা প্রয়োজন নেই তা কেনাতে বিজ্ঞাপনের প্রচুর ব্যবহার করে। কোন একটি জিনিসকে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখিয়ে অথবা শুধু প্রতিবেশীর সেটি আছে বলেই মানুষকে কোন জিনিস কিনতে প্ররোচিত করা হয়।

চিত্রের অন্য দিকটি হল এই, যে আগামী দিনের প্রযুক্তির প্রাক্‌দৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক দিকগুলির ওপর দৃষ্ট রাখতে হবে—এবং সেটি শুধু একটি দেশে নয়,

সারা পৃথিবীতেই। এই কাজ যে কার্যকরীভাবে করতে সক্ষম হবে, সে প্রচণ্ডভাবে লাভবান হতে পারে। অত্যন্ত উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে আরও বেশি করে নিয়োজিত করা যাবে। অবশ্য দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেটা অস্ত্র তৈরির জন্যও হতে পারে। অন্য দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকার জন্য বিভিন্ন দেশ প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। কোন কোন দেশে মোট জাতীয় আয়ের কয়েক শতাংশ এই উদ্যোগের জন্য ব্যয় করা হয়। ভারতে আমরা বর্তমানে প্রায় এক শতাংশ এই খাতে ব্যয় করি। প্রত্যেকেই চায় ব্যয়িত অর্থের বিনিময়ে সর্বাধিক লাভ ফিরে পেতে। তাই প্রযুক্তির পূর্বাভাষ নিজেই একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

৩০.৭ সারাংশ

এবার আমরা এই এককের আলোচনাকে সংক্ষেপিত করব।

- অর্ধপরিবাহী বস্তুর তড়িৎ বহনের ক্ষমতা ধাতু আর অন্তরকের মাঝামাঝি। অর্ধপরিবাহী থেকে তৈরি ও বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে ব্যবহৃত অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
- কম্পিউটারের মূল অংশগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটা ধারণাও দেওয়া হয়েছে। আমরা বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ও তাদের প্রয়োগ বর্ণনা করেছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটারের প্রয়োগেরর একটি দ্রুত বিবর্ধনশীল প্রয়োগক্ষেত্র।
- রোবটবিদ্যা কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি প্রয়োগ, যা এখন শিল্পে, ভেষজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- নতুন নতুন বস্তু তৈরি করতে এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের জন্য পুরাতন বস্তুর উন্নতি ঘটাতে বস্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।
- উদ্ভাবমান প্রযুক্তিগুলি প্রতিটিই বিজ্ঞান-নির্ভর এবং এগুলির বিশাল অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ওপর নজরদারি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৩০.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

(১) নীচের শূন্যস্থানে অর্ধপরিবাহীর চারটি সুবিধা ও অর্ধপরিবাহী সামগ্রীর পাঁচটি প্রয়োগের তালিকা দিন।

....

....

....

....

....

(২) নীচের প্রয়োগগুলির জন্য আপনার কী ধরনের কম্পিউটার লাগবে? (ব্যক্তিগত, মিনি, মেনফ্রেম বা সুপার কম্পিউটার)

....

....

....

(ক) আপনি একটি শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় কাজ করেন। আপনি সমস্ত বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত কাজ কম্পিউটারে করতে চান। আপনি ব্যবহার করবেন ....।

(খ) আপনি একটি ছোটো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। আপনি কম্পিউটারে একটি পত্র প্রাপকদের ঠিকানার তালিকা রাখতে চান। আপনার একটি .... কেনা উচিত।

(গ) আপনি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। আপনি সমস্ত ছাত্রের নাম, ঠিকানা, নির্বাচিত পাঠক্রম, পরীক্ষার নম্বর, গ্রেড প্রভৃতির একটি তালিকা রাখতে চান। আপনার চাই একটি ....।

(ঘ) আপনি একটি তেল-খননকারী সংস্থায় কর্মরত একজন বৈজ্ঞানিক। আপনি ভূকম্পীয় তথ্য, উপগ্রহ চিত্র প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে অনাবিষ্কৃত তৈলক্ষেত্রের অনুসন্ধান করতে চান। আপনাকে কাজ করতে হবে ....।

(ঙ) আপনার অফিসে পাঁচটি বিভাগ আছে। আপনার এমন একটি কম্পিউটার আছে যাতে একসঙ্গে প্রতি বিভাগের অন্তত একজন ব্যক্তি কাজ করতে পারেন। আপনার যন্ত্রটি হল ....।

(৩) কোন একটি সংস্থা গোটা কম্পিউটার ব্যবস্থার নকশা তৈরি করে, উৎপাদন করে এবং সেগুলি বিক্রি করে। নীচে ওই সংস্থার কয়েকজন কর্মীর কাজের বর্ণনা দেওয়া হল। আপনাকে প্রত্যেকের কাজটি ঠিক কী তা নীচে দেওয়া নামগুলি থেকে চিনে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখতে হবে।

(ক) রবীন্দ্র একজন ....। তিনি কম্পিউটার ব্যবস্থার ইলেকট্রনিক বর্তনীগুলির পরিকল্পনা করেন।

(খ) সঞ্জয় একটি অঞ্চলের মধ্যে বড়ো বড়ো সংস্থাগুলিতে যান। তাঁর কাজ যন্ত্রগুলির প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করা এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের বোঝানো যে কম্পিউটারগুলি তাঁদের সংস্থার পক্ষে সহায়ক হবে। সঞ্জয় ওই সংস্থার একজন ....।

(গ) সীমা একজন ....। তাঁর কাজ কম্পিউটারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য সেটির ভিতর যে প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে সেগুলি তৈরি করা।

(ঘ) ফিরোজ কম্পিউটারকে দিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজ করানোর জন্য সফটওয়্যার তৈরি করেন। তিনি হলেন একজন ....।

(ঙ) শ্যারন একটি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানে একজন ....। তিনি কম্পিউটারে সমস্ত তথ্য প্রবেশ করান এবং কম্পিউটার যখন চলে তখন তার দেখাশোনা করেন।

তন্ত্রগত প্রোগ্রাম লেখক, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার চালক, প্রায়োগিক প্রোগ্রাম লেখক, হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

(৪) রোবটের অন্তত তিনটি সুবিধার উল্লেখ করুন।

(৫) প্রযুক্তির পূর্বাভাষ বর্তমানে পড়াশোনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন, তার দুটি কারণ লিখুন।

৩০.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী

(১) (iii)

(২) (ক) ii (খ) iii (গ) i

(৩) তথ্যগ্রাহক, নিয়ন্ত্রক, পাটিগাণিতীয় যুক্তি প্রয়োজক, স্মৃতি, তথ্য প্রদায়ক।

(৪) (ক) দ্রুত, নির্ভুল, ভুল, সহস্র, প্রচুর, তথ্য, উপাত্ত।

(খ) (i) ঘ, (ii) ক, (iii) ঙ, (iv) চ, (v) ছ, (vi) গ, (vii) খ

(৫) (ক) প্রায়োগিক সফটওয়্যার (খ)

(৬) একটি কম্পিউটার ব্যবস্থা যখন এমনভাবে তথ্য প্রদান করে যে তা কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে আসছে বলে মনে হয়, তখন কম্পিউটারের সেই ক্ষমতাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়।

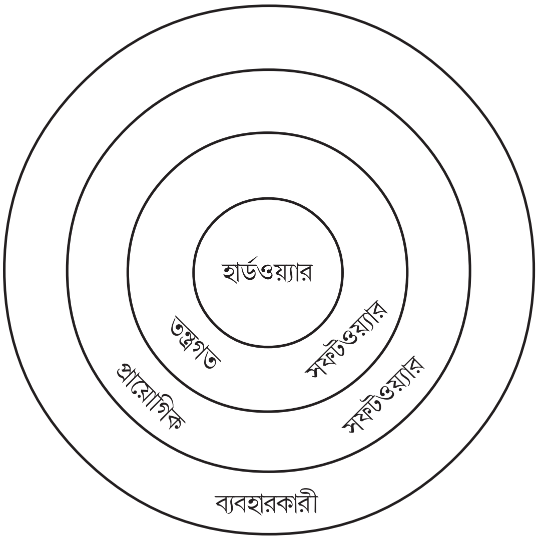

(৭) (ক) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাধারণত কম্পিউটার-চালিত হয় না। এগুলি যে কাজের জন্য তৈরি তা ছাড়া অন্য কাজ এগুলিকে দিয়ে করানো যায় না। এগুলিকে সাধারণত সম্পূর্ণ আলাদা কোন কাজের জন্য নতুন করে সংগঠিত করা যায় না। রোবট একটি প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার যা একসঙ্গে নানা কাজ করতে পারে এবং আলাদা আলাদা ব্যবহারের জন্য যেটির নতুন করে প্রোগ্রাম করা যায়।

(খ) রোবট তার কম্পিউটারের স্মৃতিতে রাখা প্রতিবিম্বের সঙ্গে কোন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য তুলনা করে ও মিলিয়ে নিয়ে জিনিসটিকে দেখতে পায়। রোবটকে দিয়ে বাহুর কাজ করানোর জন্য তার অবস্থানসূচক সহস্র সহস্র সংখ্যা রোবটের স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে। এগুলি রোবটের নিয়ন্ত্রণকারী প্রোগ্রামের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামটি যখনই নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা এনে দেয়, কতকগুলি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা সংখ্যাটিকে বাহুর একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে রূপান্তরিত করে।

(৮) (ক) ধাতু : অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, তামার বৈদ্যুতিক তার। ধাতুসংকর : ইস্পাতের বাসন ও যন্ত্রপাতি। পলিমার : প্লাস্টিকের খেলনা, রবারের টায়ার। তন্তু কাচ : চেয়ার, সুটকেস। কৃত্রিম তন্তু জামা-কাপড়, প্যারাসুট। তরল কেলাস : ঘড়ি ও ক্যালকুলেটরের সূচক প্যানেল।

(খ) বিশেষ ধরনের কাচের তন্তু; বিশুদ্ধ সিলিকন ও জার্মেনিয়াম; অত্যন্ত দৃঢ় ও হালকা ধাতুসংকর ও বিশেষ ধরনের জ্বালানি; সেরামিক বস্তু।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলির উত্তর :

(১) অর্ধপরিবাহী নির্মিত সামগ্রী অতি ক্ষুদ্র ও ঘাতসহ। এগুলি অতি অল্প ক্ষমতা ব্যয় করে এবং এগুলির ধর্ম ইচ্ছামতো পরিবর্তিত করা যায়। প্রয়োগ : পরিবর্তী প্রবাহ (A.C.) কে দিষ্ট প্রবাহে (D.C.) রূপান্তরণ; সংকেতের বিবর্ধন; কম্পিউটার, যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়।

(২) (ক) মিনি কম্পিউটার অথবা মেনফ্রেম, (খ) ব্যক্তিগত কম্পিউটার, (গ) ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী মিনি কম্পিউটার অথবা মেনফ্রেম, (ঘ) সুপার কম্পিউটার, (ঙ) মিনি কম্পিউটার।

(৩) (ক) ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার (খ) হার্ডওয়্যার বিক্রেতা, (গ) তন্ত্রগত প্রোগ্রাম লেখক (ঘ) প্রায়োগিক প্রোগ্রাম লেখক (ঙ) কম্পিউটার চালক।

(৪) রোবট (i) কাজে ক্লান্ত হয় না (ii) নির্ভুলভাবে কাজ করে (iii) বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে পারে।

(৫) সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতের ভোগ্যপণ্য বা শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করবে। দুটি কারণে এই প্রযুক্তিগুলি কী তা জানা প্রয়োজন : (ক) একটি নির্দিষ্ট মানবসমাজের ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে, (খ) এই কাজের ক্ষমতা সৃষ্টি করতে, অর্থাৎ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্ভাব্য প্রযুক্তিকে সমাজে প্রকৃত ব্যবহারের প্রযুক্তিতে পরিণত করার জন্য জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.-১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
৮

একক ৩১ উপলব্ধি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ২৮১-২৯৩

একক ৩২ বিজ্ঞান---উন্নয়নের পথ ২৯৪-৩০৪

পর্যায় ৮ : নবদিগন্ত

পর্যায় ১ থেকে ৭ পর্যায় পর্যন্ত আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, বর্তমান পর্যায়টিকে তারই সারসংক্ষেপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা এখানে পাওয়া যাবে। মানুষের উদ্যোগকে কেন্দ্র কের সমাজের যে বিবর্তন, সেখানে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ বিজ্ঞানের সুসংহত এবং পরীক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের অধিগম্য। এই জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমবর্ধমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনাও অসীম। পৃথিবীর গভীরে, ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রবক্ষে বা অন্তরীক্ষে যে সব উপাদান ছড়িয়ে আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তার ব্যবহার করতে পারি। আমরা ক্ষুধা, ব্যাধি এবং বঞ্চনা দূর করার উদ্যোগ নিতে পারি। অন্যদিকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের ফলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

মানব জাতির ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই প্রয়াসের সঙ্গে সামাজিক চেতনা বা দায়িত্ববোধ অনেক সময়েই যুক্ত থাকেনি। বিশেষ করে বিগত শতকে সীমিত প্রাকৃতিক উপাদানকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে অরণ্য নির্মূল হয়েছে, পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীর জলকে ক্লেদাক্ত করেছে। ফলে অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়নি। বরং দুর্বল শ্রেণী এবং জাতিকে শোষণ এবং ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের সামনে দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে। প্রথমটি হল, মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে সমাজের সুষম বিকাশ সম্ভব হয়, শ্রমের ফসল সকলের হাতে পৌঁছোয়। দ্বিতীয়টি হল নিপীড়ন এবং সমূহ বিনষ্টির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চূড়ান্ত অপব্যবহার। এ দু'টি পথের যে কোন একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যেন জাতীয় উন্নতির পক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে। জাতীয় বিকাশের এই মাপকাঠিতেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উপযোগিতা বিচার করতে হবে। আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বাধীন কর্মপন্থা রূপায়ণের পথে যে সব সমস্যা আছে সেগুলিকেও জানা প্রয়োজন। পরিশেষে, অসংখ্য মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করব। একটি উপসংহার দিয়ে এই পর্যায় শেষ হয়েছে।

উদ্দেশ্য :

এই পর্যায়টি পাঠ করার পর আপনি—

★ বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারবেন। সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে তবেই সামাজিক কল্যাণসাধনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা সম্ভব।

★ উপলব্ধি করবেন যে সুস্থ সামাজিক চিন্তা এবং দায়িত্ববোধই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উপযোগিতাকে অর্থবহ করে তোলে।

★ আত্মনির্ভরশীল বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন।

একক ৩১ □ উপলব্ধি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা

গঠন

৩১.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৩১.২ বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

৩১.২.১ বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে

৩১.২.২ সমাজবিজ্ঞানের উন্নতিকে প্রভাবিত করে

৩১.৩ সুসম্বদ্ধ অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা

৩১.৩.১ সামাজিক লক্ষ্যবস্তুর প্রাথমিকতা

৩১.৩.২ বিজ্ঞান ও কিছু সামাজিক ধারণার বিবর্তন

৩১.৪ বর্তমান কালে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা

৩১.৪.১ বিজ্ঞান ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ

৩১.৫ নতুন উপলব্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

৩১.৮ উত্তরমালা

৩১.১ প্রস্তাবনা

আপনারা দেখেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে সর্বদাই মানুষের প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। আপনারা আরও দেখেছেন, সকলের জন্য খাদ্য সংস্থান, রোগ দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা কত অপরিমেয়। এই এককে আমরা বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করব এবং এই ব্যাপারে একটি সুসম্বদ্ধ অভিগমনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করব। একটি বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে সামাজিক লক্ষ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের দিক নির্ধারণ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই প্রতিস্থাপনাই নির্ধারণ করে, তা মানুষের কল্যাণ-বিধানে, নাকি বলপ্রয়োগ ও গণ-ধ্বংসের অস্ত্র-সৃজনে ব্যবহৃত হবে। এই বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে আমরা বর্তমানে মানব-জাতির উপলব্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি আলোচনা করব। পরের এককে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে প্রয়োগ করলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও আত্মনির্ভরতা বাড়ানো যেতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনারা এই বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন :

- একদিকে যেমন বিজ্ঞান সামাজিক কাঠামোকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানের বিকাশও সামাজিক প্রয়োজন ও উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়;
- সামগ্রিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সুসম্বদ্ধ অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা, যার মুখ্য বিষয় হবে সামাজিক লক্ষ্যবস্তু;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানবসমাজের কল্যাণ-বিধানে অথবা বল-প্রয়োগ ও গণ-ধ্বংসের অস্ত্র-সৃজনে ব্যবহার করা যায়, এমন একটি পরিস্থিতিতে মানবজাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি।

৩১.২ বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ শেষ করতে চলেছি। এখন আমরা সংক্ষেপে মানবসমাজ এবং তার বিশেষ প্রচেষ্টার ফসল এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্কটি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করব।

এ পর্যন্ত আপনারা যে এককগুলির পাঠ গ্রহণ করলেন, তার থেকে আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; প্রকৃতপক্ষে আদিম মানুষ যখন থেকে খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত, তখন থেকেই এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্ম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি পরীক্ষিত জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে, এবং এই জ্ঞানভাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখনও উভয়ের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্কটি অটুট রয়েছে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নতি ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজও সমাজকে প্রভাবিত করছে। পক্ষান্তরে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৃদ্ধির হার ও গতিপথকে প্রভাবিত করছে। এখন আমরা এই বিষয়ে দুটি বিশদভাবে আলোচনা করব।

৩১.২.১ বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে, এবং সেই কারণেই আমাদের ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রীর সঙ্গে জড়িত। যে কলম দিয়ে আমরা লিখি, যে কাগজে আমরা লিখি, যে খাদ্য আমরা খাই, যে বস্ত্র আমরা পরি, যে ঔষধ আমরা গ্রহণ করি, সেগুলি এই ধরনের সামগ্রীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এইসব সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ঘরে বা কারখানায় অথবা অরণ্যে-প্রান্তরে কাজ করতে হয়। যেহেতু সমাজকে ধারণ করতে লক্ষ লক্ষ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই কারণে উৎপাদন একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত ক্রিয়া হয়ে উঠেছে। ১নং ও ২নং পর্যায়ে যেখানে আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি, সেখানে আপনারা দেখেছেন, উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রণালী যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়, তার ফলে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে, যখন মানুষের পক্ষে এককভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা ও বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তখন তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাঁচতে শিখল। যেহেতু খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না, সেইজন্য খাদ্য হিসেবে তারা যা সংগ্রহ করত, তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত। আগুন ও কৃষির আবিষ্কারের পর এই 'আদিম' সমাজের একটা পরিবর্তন ঘটল। পূর্ববর্তী

পর্যায়গুলিতে এই ধাপে ধাপে ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি পরিক্রমণ করে আমরা বর্তমান সময়ে পৌঁছেছি, যখন জৈব-প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমাজের পথ-নির্দেশ করছে।

কৃষি বা শিল্পের মাধ্যমে যে বিবিধ রকম পণ্য-সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সেগুলি ক্রেতা বা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো দরকার। তার জন্য প্রয়োজন ব্যবসাবাণিজ্য ও একটু সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা, যেটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল। আপনারা চাকার আবিষ্কারের কথা শুনেছেন; এই চাকাই অতীতে পশু-চালিত গাড়ির প্রচলন সম্ভব করেছিল। বর্তমানে জেট বিমান চলছে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে। বিশাল জাহাজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল ও যন্ত্রাদি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অতীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পণ্য-বিনিময় হত, এখন তা হচ্ছে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে। এক অর্থে পৃথিবীর পরিধি এখন অনেক ছোটো হয়ে গেছে। একসময়ে ৫০০ কিমি দূরত্ব খুব বেশি মনে হত এবং এই দূরত্ব পাড়ি দেওয়া কল্পনার অতীত ছিল। পরবর্তী কোন এক সময়ে এই দূরত্ব বেড়ে ২০০০ কিমি হয়েছিল, যার বেশি দূরে গেলে 'সমতল' পৃথিবীর কিনারা থেকে গড়িয়ে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভাবা হত। এবং এখন আমরা নিয়মিত উড়ানে মাত্র আট ঘণ্টা সময়ে দিল্লি থেকে লন্ডনে চলে যাচ্ছি!

বৃহৎ উৎপাদন প্রণালী এবং তার সঙ্গে ততোধিক বৃহৎ ও জটিল বাণিজ্য ও পরিবহণ পদ্ধতির সুবাদে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। এখানেও আমরা অতীতে যেখানে চিৎকার করে অথবা আগুন জ্বেলে বা হাত নেড়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম, এখন সেখানে টেলিফোন, রেডিয়ো বা টেলিভিশনের সাহায্যে সংবাদ আদানপ্রদান করছি। এইভাবে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় যে সব তথ্যের প্রয়োজন হয়, এখন সেই সব তথ্য ব্যাপকভাবে কম্পিউটার বা যন্ত্রগণকে সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনমতো আমরা সেই তথ্য পাঠ করি।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বৃহত্তর সমাজচালনার সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য পরিচালনার নতুন নতুন পদ্ধতি ও ধারা উদ্ভাবিত হয়েছে। এইভাবে সেই আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত জীবনধারা থেকে ধাপে ধাপে মানবসমাজের দাস-সমাজ, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে বিবর্তন ঘটেছে।

মানবসমাজের বিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভূ-সম্পদ, জল-সম্পদ ও বায়ু-সম্পদ থেকে শক্তি আহরণ করে উৎপাদন ও পরিবহণের চাকা সচল রাখতে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সক্ষম করেছে। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি আরও অনেক ত্বরান্বিত হতে চলেছে।

উৎপাদন, বণ্টন, যোগাযোগ ও প্রশাসনের এই বিশাল সমন্বয়ের পরিচালনার জন্য আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সেই কারণেই দরকার জ্ঞানের ক্রমাগত প্রসার ও মানবকল্যাণে উৎপন্ন বস্তু-সামগ্রীর উন্নতিসাধন। দরকার কল্পনাশক্তিসম্পন্ন নর-নারীর, একটি বিশেষ সমাজের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় যারা প্রশিক্ষিত। সেই শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ, পুস্তক প্রকাশনের ছাপাখানা, কাগজ তৈরির কারখানা, শ্রবণ-দর্শন সহায়ক যন্ত্র, গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—এ সমস্তই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল। অধিকন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের বর্তমান সময়ের ভাবনা-চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রভাবিত করে।

৩১.২.২ সমাজবিজ্ঞানের উন্নতিকে প্রভাবিত করে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন আমাদের সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বন্ধনী-শক্তি ও ধ্যান-ধারণার জোগান দেয়, তেমনি সমাজও এমন একটি পরিবেশ ও বাতাবরণ সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটতে পারে, স্থিতাবস্থা বজায় থাকতে পারে বা বিনাশও ঘটতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অস্তিত্ব সমাজ, তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের নিরপেক্ষ নয়। এগুলি একটি নির্দিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর একটি অংশ।

সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ও উন্নতির তাগিদ সৃষ্টি হয়। সমাজের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতি সামাজিক কার্যক্রম এবং উৎপাদন ক্রিয়াকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং বিজ্ঞানের উন্নতির প্রেরণা জোগায়। অবশ্য কি ধরনের অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হবে, কোন কোন সামাজিক কার্যক্রম কতটা কার্যে রূপায়িত করা যাবে, এই সবই নির্ভর করে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের ওপর। এইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজের সাধারণ নীতি ও সামাজিক কাঠামোর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনও কোনও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি বাজার চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই সব সমাজ ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিমালিকানা শিল্পের কায়েমি স্বার্থ দেখে। এমন কি যে সব পণ্যের খুব একটা জরুরি প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেই সব পণ্যেরও কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করা হয়। বেতার, দূরদর্শন, এমনকি শিক্ষার মাধ্যমেও অপপ্রচার চালিয়ে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। আরও বেশি পণ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতা, মুনাফা বৃদ্ধি বা জনসমাজের সম্পন্ন অংশের জন্য শৌখিন পণ্য সরবরাহের আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক ধরনের উন্নতি ঘটায়। পক্ষান্তরে যদি কোনও সমাজ গ্রামীণ জীবনধারায় উন্নতি চায় বা জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে চায় বা সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানের পুষ্টিবিধান করতে চায় এবং সেইমতো পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কর্মসূচি ও অনুবর্তী বিকাশ একটি ভিন্ন ধারা অনুসরণ করবে।

আর একটি উদাহরণ যেটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি হচ্ছে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রসংগ্রহে অর্থব্যয়ের প্রশ্ন। আমরা জানি, বর্তমান পৃথিবীতে অস্ত্র ও তার উন্নতিকল্পে প্রতি বছরে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যে শুধু মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য বা বাসস্থান সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি ঘটায় তাই নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গঠনমূলক বিকাশেও ব্যাঘাত ঘটায়।

অনুশীলনী ১

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিকাশ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, সংক্ষেপে আলোচনা করুন। প্রদত্ত শূন্যস্থানে উত্তর লিখুন।

১। পরিবহণ

....

....

....

....

....

২। যোগাযোগ

....

....

....

....

....

৩। শিক্ষা

....

....

....

....

....

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বৃহত্তর সমাজতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার অন্য অংশগুলি হতে পারে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পণ্যবন্টন, যোগাযোগ, শিক্ষা, সরকার, প্রশাসন ইত্যাদি। মানবকল্যাণে আগ্রহী মানুষ হিসেবে যদি আমরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি মহান মানবিক সম্পদগুলির সমৃদ্ধি ও বিকাশ কামনা করি, তা হলে আমাদের একটি সামগ্রিক বা সুসম্বন্ধ পথ অনুসরণ করা দরকার।

৩১.৩ সুসম্বন্ধ অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা

শুধুমাত্র বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রচেষ্টায় অথবা শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্ভব নয়। সার্বিক বিকাশের জন্য সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন।

৩১.৩.১ সামাজিক লক্ষ্যবস্তুর প্রাথমিকতা

অধিকন্তু আমরা জানি, প্রত্যেক জিনিসেরই ভালো ও মন্দ দুটি দিক আছে। বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগে আমরা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি, ভূ-সম্পদের সদব্যবহার করতে পারি, সকলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান করতে পারি এবং অনেকরকম ব্যাধির চিকিৎসা করতে পারি। আবার আমরা গণ-ধ্বংসের অস্ত্রেরও উন্নতিসাধন করতে পারি; প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্র-ভাণ্ডার এত বৃহৎ যে, জ্ঞানত বা ভুলবশত মাত্র এক শতাংশ ব্যবহার করলে পৃথিবী থেকে প্রাণের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সমাজের মানুষকে এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

সমাজকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন অথবা সর্বাধিক মানব-কল্যাণের লক্ষ্যে সংগঠিত করা যায়। সমাজ 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'কে প্রাধান্য দিতে পারে, যার ফলে ধনীরা আরও ধনী ও দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হতে পারে; আবার সমাজ সুযোগসুবিধার সমবণ্টনের সঙ্গে বিকাশকে সমন্বিত করতে পারে। মানুষের পরিবেশ বা পৃথিবীর সীমিত সম্পদের ওপর কি প্রভাব পড়বে, তা বিবেচনা না করেই সমাজ শিল্পায়নকে প্রাধান্য দিতে

পারে, যেমনটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প-বিপ্লবের পর কিছু দেশে ঘটেছিল। আবার সমাজ এমন কিছু প্রযুক্তি বা শিল্প বেছে নিতে পারে, যেগুলি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে।

স্পষ্টত ভারতের মত দেশে আমরা যা অর্জন করতে চাই, সেই সামাজিক লক্ষ্যবস্তুগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তারপর শিল্প, কৃষি, পরিবহণ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছকে ফেলতে হবে। তা হলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে বা কিভাবে উন্নত করতে হবে, আমাদের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে পরিকল্পনা ও ধাপে ধাপে অভীষ্ট বস্তু অর্জন করা প্রয়োজন।

একটি সুস্থ সামাজিক চেতনা, যা আমাদের অন্যদের কথা ভাবায় এবং তার থেকে উদ্ভূত একটি দায়িত্বশীল সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই প্রাথমিক পাঠক্রম যদি এই ধরনের কিছু ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে আপনারা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যা অধ্যয়ন করেছেন, তারই একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

৩১.৩.২ বিজ্ঞান ও কিছু সামাজিক ধারণার বিবর্তন

আদিম মানুষ যখন অন্য জন্তুর দিকে তাকে হত্যা করার জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করত, তখন থেকেই মানব জাতির ও বিজ্ঞানের বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছিল। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উন্নতির ধারাটি অন্যান্য প্রাণীদের থেকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খাতে বইতে থাকে, এবং তার চারপাশে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি জটিল তন্ত্র গড়ে ওঠে। এর ফলে তাদের দু'ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যে সমস্যাগুলি আজও বিরাজমান ঃ

- বস্তুগত জগতের নিয়ন্ত্রণ।
- মানুষকে নিয়ন্ত্রণ।

বস্তুগত জগতের নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ব্যবহার মানুষের কাছে নানা ধরনের বস্তু-সামগ্রীর জোগান দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে আরও বেশি ক্ষমতা, সাধারণ প্রাণী হিসেবে যা তার হস্তগত ছিল না। প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, সামান্য যন্ত্রপাতি থেকে জটিল যন্ত্রের বিবর্তন অবশ্যই একটি দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। তবে এই দীর্ঘ যাত্রা এক অর্থে সেই প্রথম পদক্ষেপেরই প্রসারণ ও যুক্তিসম্মত সংযোজনকেই সূচিত করে। প্রস্তরখণ্ডে যার সূত্রপাত, প্রকৃতি-লব্ধ বা প্রয়োজনমতো সংশোধিত অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও তার প্রসারণ ঘটল। বস্তুর সংশোধন বা বস্তু থেকে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তির। শক্তির প্রথম উন্মেষ হল আগুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই। পরবর্তীকালে আরও অনেক শক্তিশালী বা নমনীয় ধরনের শক্তির উৎস আবিষ্কৃত হল।

এইসব জাগতিক বস্তুর ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হল জ্ঞানের; এই জ্ঞানের নির্যাসের সুসংহত রূপই হল বিজ্ঞান, এবং নতুন নতুন দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে ও উৎকর্ষ-সাধনে এই জ্ঞানের ব্যবহারই হল প্রযুক্তি।

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ

জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতিতে ব্যবহারের দক্ষতা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে একটি সাধারণ প্রচেষ্টায় সামিল করেছিল। কাজের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজগুলি সম্পাদনের জন্য মানুষকে অবগত করানো ও নির্দেশ দেওয়ার সমস্যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। করণীয় কাজগুলি হাতে-নাতে সম্পাদন এবং নির্দেশ সাধারণভাবে এই দুটি ক্ষেত্রে বিভাজিত হল। সেই অনুযায়ী যারা কাজ করে এবং যারা নির্দেশ দেয়, মানুষও এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হল; ফলে কিছু মানুষের পক্ষে হাতে-নাতে কোনও কাজ না করা সত্ত্বেও জীবনধারণ সম্ভব হল। এই বিভাজনকে আরও দৃঢ় করল হস্তলিপি আবিষ্কার। যারা অন্যদের দিয়ে কার্য সম্পাদনের নির্দেশনায় রইল, তারাই ধীরে ধীরে জ্ঞানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে উঠল। এই বিভাজন যতই প্রকট হতে থাকল, মানুষকে দিয়ে প্রত্যাশিত কাজগুলি করিয়ে নেওয়ার প্রশ্নটি ততই জরুরি হয়ে উঠল। জ্ঞানের তত্ত্বাবধায়কদের দিয়ে পরিচালিত কর্ম-পরিকল্পনায় মানুষকে সামিল করতে কলা-কৌশলের উদ্ভব ঘটল। এক শ্রেণির মানুষের কায়িক পরিশ্রমে উৎপাদনে যে উদ্‌বৃত্ত ঘটল, সেই জ্ঞানের তত্ত্বাবধায়করা নিজেরা কোনও কাজ না করে সেই উদ্‌বৃত্তের ওপরেই জীবনধারণ শুরু করল।

মানবসমাজের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, মানবজাতির নিয়ন্ত্রণে তিনটি স্বতন্ত্র ধারা অনুসৃত হয়েছে ঃ

- স্বেচ্ছা সহযোগিতার মাধ্যমে
- শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের মাধ্যমে, যেমন সেনাবিভাগে এবং
- ভীতিসঞ্চারের মাধ্যমে।

মানুষ কি ধরনের সমাজ গড়তে চেষ্টা করছে, তার ওপরেই নির্ভর করছে কোন্ বিশেষ পদ্ধতি প্রযোজ্য। একটি সমদর্শী ও ন্যায়সংগত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা সহযোগিতার রীতিই যথেষ্ট ছিল। এই রীতিটির অর্থ হল সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নাগরিকদের তরফে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বর্তমান জ্ঞানের বিচ্ছুরণ। অতীতে কোনও কোনও সময় ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হত। আবার যে সমাজে কতিপয় ব্যক্তি অন্যদের পরিশ্রমের মূল্যে সমস্ত মুনাফা কুক্ষিগত করে বসবাস করত, সেখানে অন্য দুটি রীতি প্রযুক্ত হত। এই দুই রীতির ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ছিল নিয়মভঙ্গের জন্য কঠোর শাস্তি, এবং সেই সঙ্গে কিছু মানুষের অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু কল্প-কাহিনি, অথবা ভবিতব্যতা বা যারা ইহজীবনে কষ্ট পাবে, তারা মৃত্যুর পরে পুরস্কৃত হবে, এই ধরনের কিছু গল্পকথা।

ঠিক যেমন পাথরের ব্যবহার মানুষের পক্ষে একটা দু-মুখী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, মানুষকে নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও তেমনি একটি দ্বৈত দর্শনের সৃষ্টি করল ঃ একটি সমদর্শী ও ন্যায়সংগত সমাজের, ধর্মীয় গুরু, সমাজসংস্কার ও রাজনীতিবিদরা যেমনটি প্রচার করে থাকেন, এবং অপরটি অল্পসংখ্যক মানুষের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ওপর অনিয়ন্ত্রিত আধিপত্যের, যেখানে কিছু মানুষ বাকিদের নিজেদের আদেশ পালন করতে ও নির্দেশমতো কাজ করতে বাধ্য করে। এই প্রক্রিয়ায় একটা আপাত বৈপরীত্য থেকে যায় যে, যে বস্তুগত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি আনার বনিয়াদ সৃষ্টি করেছিল, মানুষের নিয়ন্ত্রণে সেটাই গৌণ হয়ে দাঁড়াল। সমাজ যত বিন্যস্ত হল, প্রচার-যন্ত্র ও সমরাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণে বস্তুর ব্যবহার তত বৃদ্ধি পেল। অবশ্য বস্তু নিয়ন্ত্রণের থেকে মানবজাতির নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কঠিন প্রতিপন্ন হয়েছে।

অনুশীলনী ২

উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে নিম্নের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন ঃ

১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে .... জন্য ব্যবহার করতে চাইলে একটি .... অভিগমনের প্রয়োজন।

২। বস্তুজগৎ সম্পর্কে সুসম্বন্ধ জ্ঞান হল ....। একে নতুন নতুন বস্তু বা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হল ....।

৩। যেখানে বস্তুজগতের ওপর নিয়ন্ত্রণ মানব-কল্যাণের জন্য বিশাল .... খুলে দিয়েছে, সেখানে মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করেছে .... দ্বন্দ্ব।

৩১.৪ বর্তমান কালে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান সমাজে এই সবের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অতীতে যা ঘটে গেছে, তাই নিয়ে কেন আমরা মাথা ঘামাব? পুরনো ইতিহাস না ঘেঁটে বর্তমানের সমস্যার দিকে নজর দেওয়াই কি বেশি সমীচীন নয়?

আমাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যদিও আজকের দিনের সমস্যাগুলি ভিন্ন মাত্রার, তথাপি এগুলি মূলত মানবজাতি নিয়ন্ত্রণের প্রাচীন সমস্যারই অনুবৃত্তি। এটা কি স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টায়, বর্তমান জ্ঞানের আলোকে সমস্যাগুলি বোধগম্য করে, একটি সাধারণ ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে মানুষকে প্রণোদিত করে এবং জনসমষ্টির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সম্পাদিত হবে? আমি একটা বিশাল অজ্ঞতা ও ভয়ের বাতাবরণ বজায় রেখে মানুষ ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হবে কতিপয় ব্যক্তির কল্যাণের জন্য? আমরা আজ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, তার ওপরেই ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা নির্ভর করবে।

এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, পূর্বতন প্রতিটি সমাজের সংকটই তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিয়েছে। একটি অনৈতিক, বিষম সমাজ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। সম্পদের অপচয় অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে, সামাজিক সংস্কার ছাড়া যা অতিক্রম করা যায় না। প্রতিটি সামাজিক সংস্কার বা পুনর্বিন্যাস একটি ন্যায়সংগত সমাজের প্রত্যাশা ও ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অচিরেই তা দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে আর একটি নতুন বৈষম্যমূলক, অনৈতিক সমাজের পথ দেখিয়েছে।

আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই কোন না কোন সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমান সংকটের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাতের আগে দেখা যাক, শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে বর্তমান সমাজের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কিভাবে উদ্ভব ঘটেছে।

৩১.৪.১ বিজ্ঞান ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে, যখন থেকে বস্তুজগতের ক্রিয়াকলাপ বোধগম্য হতে শুরু করল, তখন থেকেই ইউরোপে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে একটা প্রবল আস্থাবোধের উন্মেষ

ঘটল। তার থেকেই এই সম্ভাবনার সৃষ্টি হল যে, সামাজিক ব্যাপারেও সমস্যার সমাধানে ও সকলের উন্নততর জীবনযাপনে যুক্তিবাদ ব্যবহৃত হবে এবং মানুষের নতুন শ্রীবৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। প্রযুক্তির বিকাশ বিশেষ করে বাষ্প ও তড়িৎশক্তির মতো নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করল এবং মানুষের হাতে এমন অনেক বস্তুসামগ্রী তুলে দিল, যা এতদিন তাদের নাগালের বাইরে ছিল। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ, প্রতিটি নতুন সাফল্য নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিল এবং এমন একটা অনুভূতির সঞ্চার করল যে, সারা জগৎ জুড়ে একটি ন্যায়সংগত, সর্বাঙ্গসুন্দর ও মানুষের প্রতি মর্যাদাশীল সমাজের সৃষ্টি হবে।

এই প্রক্রিয়ায় কিছু সুফল পাওয়া গেল এবং কিছু বিস্ময়কর নতুন সুযোগের সৃষ্টি হল, কিন্তু অচিরেই দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অবনমন ঘটল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে যে সমস্ত দক্ষতার সৃষ্টি হল, মানবজাতি ও সামগ্রিক সমাজের শোষণ এবং যুদ্ধ ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তার অপব্যবহার শুরু হল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যে সমস্ত সুফলের অংশীদার হতে পারত, সেগুলির বণ্টন শুধুমাত্র কয়েকটি দেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত থাকল। উদাহরণ হিসেবে, ইংল্যান্ডে মানুষের মধ্যে অসাম্য প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। ভারতীয় সম্পদের শোষণ এবং ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বিপণন এখানেও আরও বেশি দারিদ্র্যের সৃষ্টি করল এবং ভারতীয় কারুশিল্প ও শ্রমিশিল্পকে ধ্বংস করল। ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা পদদলিত হল। উপনিবেশগুলির দখল নিয়ে অসংখ্য যুদ্ধ ঘটল, এবং অস্ত্র-প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই যুদ্ধ ক্রমশই আরও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠল।

বিগত পাঁচ দশকে অনেক দেশই ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই দেশগুলি এখনও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কলা-কৌশলের জন্য উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে তারা তাদের উন্নতির জন্য নিজেদের পছন্দমতো পথে চলতে পারছে না। এই সব দেশের মানুষদের মধ্যে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে উপলব্ধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩১.৫ নতুন উপলব্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সামাজিক ফলাফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব সাফল্য ও হতাশা বৈজ্ঞানিকদের সমস্যার একটি নতুন মাত্রার প্রতি সজাগ করেছে, এতদিন যার সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কি কি নতুন উপলব্ধি উদ্ভূত হচ্ছে, আমরা সেটা এক নজর দেখে নিতে পারি।

কয়েক দশক আগেও আমরা বিশ্বাস করতাম, প্রযুক্তি আত্মীকরণে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের অসীম ক্ষমতা আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি। এই ধারণা ভ্রান্ত, প্রযুক্তি আত্মসাৎ করতে গিয়ে এই তিনটিরই সাংঘাতিক ক্ষতি ঘটে গেছে। সেই কারণে আমরা কিছু বিকল্পের কথা চিন্তা করছি।

বিগত কয়েকশো বছর ধরে ব্যক্তি, তার অধিকার, বিশেষ সুযোগসুবিধা, বুদ্ধিগত উৎকর্ষ, এই সবের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলিকে ব্যক্তিগত চাহিদা, এমনকি ব্যক্তিগত শখ-শৌখিনতা মেটাবার লক্ষ্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। নানান ধরনের পণ্য, তা সে পোশাক-পরিচ্ছদ বা শৌখিন দ্রব্যই হোক, বা খাদ্যদ্রব্য ও ধূমপান বা এমনকি বিনোদনের সামগ্রীই হোক, এমন কি তাদের প্রতিটির বহুসংখ্যক বিকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলির বিপণন বাড়াবার জন্য বিজ্ঞাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আমরা

বুঝতে পারছি, এইসব করতে গিয়ে আমাদের পরিমিত সম্পদের অপব্যবহার, শক্তির অপচয়, নগরায়ণ-সম্পর্কিত নানান সমস্যা ইত্যাদি অনেক চরম মূল্য দিতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি নির্মাণের কথা—সেখানে প্রতিটি গাড়ি অন্যটির চেয়ে আরও সুন্দর, আরও বড়ো, আরও চকচকে করে তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণ পেট্রল খরচ করতে হচ্ছে। তা ছাড়া রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং গাড়ির ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অথচ বেশিরভাগ মানুষ প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে ভিড়ের বাসে চলাফেরা করছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে গেলে এবং ভোগ্যপণ্যের অপচয় ও অন্যান্য সমস্যা এড়াতে গেলে ব্যক্তি বিশেষের চাহিদাকে সীমায়িত করতে হবে এবং সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধানে সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করতে হবে।

একটা সময় ছিল, বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে আরও বেশি অর্থের জন্য চাপ দিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। আরও বেশি শক্তিশালী বোমার মতো যুদ্ধাস্ত্রের ওপর বা তাদের উড়োজাহাজ, রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে নিক্ষেপণের পদ্ধতির ওপর গবেষণায় প্রচুর অর্থ খরচ করা হচ্ছে। উপগ্রহ ইত্যাদিতে শক্তিশালী লেজার (Laser) প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে। এটা ক্রমশই আরও বেশিভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, এই ধরনের গবেষণা ও তার ব্যবহার মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। অথচ রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে অথবা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে না। এই সামাজিক উপলব্ধি দু'ধরনের চিন্তার জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, কিছু উন্নত দেশ এই সুযোগে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বদলে বিজ্ঞানকেই আক্রমণ করে বসেছে। বিজ্ঞানকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, যেন বিজ্ঞান স্বভাবগতভাবে মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজের ধ্বংসের কারণ এবং শোষণের একটি হাতিয়ার। অন্য একটি প্রবণতা হল, মানবিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফলের নিরিখে প্রযুক্তিগত সমাধানগুলির মূল্যায়ন করা এবং এই সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রযুক্তির বাছাই ও প্রয়োগ করা।

বলা যেতে পারে, এই সব বিবর্তন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আরও পরিশীলিত ও পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান সূচিত করছে। একটা যুগে যখন প্রযুক্তিবিদ্যা একটি অবিমিশ্র আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হত, তখন বিশ্বাস করা হত যে, প্রযুক্তিগত উন্নতিগুলি অবধারিতভাবে সহজতম থেকে শুরু করে জটিলতমের দিকে নির্দেশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশ কিছু অপরিহার্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার থেকে পারমাণবিক শক্তি পর্যন্ত উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে 'প্রগতি' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু যে সব বৃহৎ শিল্প বায়ু, নদী ও সমুদ্রকে দূষিত করছে এবং এবং কয়লা, কাঠ, খনিজ তেল ইত্যাদি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে ব্যাপক হারে হ্রাস করছে, সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তির সংকট স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বিপন্নতা আমাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনছে সেইসব অচিরাচরিত শক্তির উৎসের দিকে, যেগুলি শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। আমরা উপলব্ধি করছি, প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে দীর্ঘদিন এইভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এই উপলব্ধি আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যাচ্ছে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বায়ু, জল, জৈব গ্যাস, সূর্যালোকের মতো শক্তি ও বিভিন্ন মালমশলার উৎপাদনের দিকে। এর ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নতুন নতুন ক্ষেত্রে গবেষণা বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিরিখে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ সম্পর্কে এই সব উপলব্ধি উন্নয়নশীল পৃথিবীর জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের সামাজিক বাধাগুলি অতিক্রম

করে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছে; এই প্রচেষ্টা অনুন্নয়নের দুষ্ট চক্রটি চূর্ণ করতে তাদের সাহায্য করছে। এই সব দেশের জনসাধারণ সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্বনির্ভর বিকাশ ও জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের পক্ষে দাবী তুলেছে। তারা এটাও উপলব্ধি করছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সামাজিক লক্ষ্য-পূরণে নিয়োজিত করা প্রয়োজন।

অনুশীলনী ৩

১। সামাজিক কল্যাণ

নীচের শূন্যস্থানে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যোগাযোগ মাধ্যমের কমপক্ষে দুটি করে ব্যবহারের উল্লেখ করুন।

....

....

....

....

....

....

২। মুষ্টিমেয়র স্বার্থসিদ্ধি

....

....

....

....

....

....

৩১.৬ সারাংশ

এই এককে আপনারা বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু ধারণা পেলেন। আপনারা শিখলেন যে, বিজ্ঞান বস্তুগত ও আদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে, আবার বিজ্ঞান সমাজ ও তার লক্ষ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলির এবং মানবজাতি ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। সার্বিক পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে 'সামাজিক কল্যাণে'র মুখ্যতা বজায় থাকবে। সার্বিকভাবে জীবনের মান উন্নয়ন অথবা গণ-ধ্বংসের অস্ত্রনির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনার কথা মনে রেখে মানবজাতিকে সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে নতুন নতুন উপলব্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্ভব ঘটেছে।

৩১.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। সার্বিক সুসম্বদ্ধ অভিগমনে একটি বাঁধ অথবা একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিকল্পনার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের কথা মনে রাখতে হবে?

....

....

....

....

....

....

২। আপনার ধারণায় ভারতের সামাজিক লক্ষ্যবস্তুগুলি কী? কমপক্ষে তিনটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করুন, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

....

....

....

....

....

....

৩। "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনা তার ব্যবহার সম্পর্কে মানবজাতিকে নতুন করে মূল্যায়ন করাচ্ছে"— এই উক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

....

....

....

....

....

....

৩১.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) পরিবহণ ঃ পরিবহণের উন্নতির ফলে শিল্পোৎপন্ন বস্তুসামগ্রী জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে। পরিবহণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থাপনে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন ধরনের পরিবহণের সাহায্যে মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় শত শত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছে।

(খ) যোগাযোগ ঃ যোগাযোগের উন্নতির ফলে মানুষ দেশ ও পৃথিবীর অন্যত্র কি ঘটছে, তা দেখতে পাচ্ছে এবং অনেক দূরে থেকেও একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারছে। অধিকন্তু, বেতার ও দূরদর্শন মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

(গ) শিক্ষা ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ বোঝার জন্য শিক্ষা মানুষের মুখ্য প্রয়োজন। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সমর্থ হয়েছে।

২। (ক) পদ্ধতি, মানবকল্যাণ

(খ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি

(গ) সম্ভাবনা, সামাজিক

৩। (ক) সামাজিক কল্যাণ—স্বাস্থ্যবিধি, ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা।

জনগণকে তাদের অধিকার, বিশেষ সুবিধা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।

(খ) মুষ্টিমেয়র স্বার্থ রক্ষা করা—বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন সেট, টেলিফোন, গাড়ি ইত্যাদির বিজ্ঞাপন।

নতুন নতুন কেতার (ফ্যাশনের) পোশাক-পরিচ্ছদের বিজ্ঞাপন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) বাঁধের মোট ধারণক্ষমতা, তাপীয় ক্ষমতা এবং কত লোক এর দ্বারা উপকৃত হবে।

(খ) অবস্থান, অর্থাৎ শহর থেকে দূরে বা কাছে।

(গ) এলাকায় পরিবেশের ওপর তার প্রভাব কি হবে।

(ঘ) কত লোক স্থানচ্যুত হবে।

২। (ক) শিক্ষা

(খ) কৃষির উন্নতি

(গ) সুযোগসুবিধার সুষম বণ্টন

(ঘ) মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান

(বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই লক্ষ্যবস্তুগুলি অর্জন করতে কীভাবে সাহায্য করে, সেই বিষয়গুলি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করুন)

৩। বিজ্ঞান একদিকে যেমন মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি মানবজাতির ধ্বংসের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা দেশের ওপর।

একক ৩২ □ বিজ্ঞান—উন্নয়নের পথ

গঠন

৩২.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
৩২.২ সকলের সমৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান
৩২.২.১ প্রযুক্তি—প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার
৩২.৩ নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস
৩২.৪ বাতিল অতিকথা
৩২.৫ স্বনির্ভরতা
৩২.৫.১ জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৩২.৬ সারাংশ
৩২.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
৩২.৮ উত্তরমালা

৩২.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আপনারা বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে শিখেছেন। আপনারা এও জানতে পেরেছেন যে, কোনও এক বিশেষ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঠিক কী দিশা দেওয়া হবে তা স্থির করতে সামাজিক উদ্দেশ্য সকলকেই দিতে হবে প্রাথমিক গুরুত্ব। এই এককে আমরা দেখব এক অসম বিশ্বে কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকলের উন্নতিসাধন না করে প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এক "নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস"-এর ডাক। যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্ঞান মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার সেই সম্পদ ও জ্ঞানের সুষম বণ্টনের জন্য উন্নয়নশীল জগতের এ এক বিশেষ মতপ্রকাশ। যে দেশগুলি বিদেশি শাসনমুক্ত হয়েছে তারা নিজেদের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার জন্য উদগ্রীব। তারা চায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বনির্মিত কাঠামো যা তাদের দেবে স্বনির্ভরতা এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা।

উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পরে আপনাদের এই বিষয়গুলি বুঝতে পারা উচিত ঃ

- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলের ন্যায়সংগত বণ্টন ঘটছে না।
- উন্নয়নশীল দেশগুলি এক "নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস"-এর জন্য উদগ্রীব।
- উন্নয়নশীল দেশগুলির আছে স্বনির্ভরতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা তাদের দেবে বিকল্প বাছাই করার স্বাধীনতা এবং কর্মে স্বাধীনতা।

৩২.২ সকলের সমৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান

একটা সমাজ যেখানে সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে এবং ন্যূনতম ভদ্র জীবনযাপন করতে পারবে তার অনুসন্ধান চলেছে সমস্ত মানব ইতিহাস জুড়ে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদী সমাজগুলিতে কিছুদূর পর্যন্ত ছাড়া এই উদ্দেশ্য বহুলাংশেই সাধিত হয়নি। সেইজন্য আমাদের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক তো বটেই, সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রও হবে। আগেই বলা হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিজেদের থেকেই সামাজিক ন্যায় ও সাম্য নিশ্চিত করতে পারে না। ন্যায় ও সাম্য একটি সমাজ ও একটি জাতির লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষ সহায়তা দিতে পারে। ভারতবর্ষে আমাদের সংসদ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে একটি "বৈজ্ঞানিক নীতি প্রস্তাব" অনুমোদন করেছিল যার খসড়া আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু করেছিলেন বলে শোনা যায়। এই দলিলে বলা আছে যে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাটি খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, বাসস্থানের মালমশলা সবকিছু সকলের অভাব মেটানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করার ব্যাপারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কতটা সহায়তা করতে সক্ষম তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদ বা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কোন প্রতিরূপ নেই। সেইজন্য প্রতিটি দেশই কেবল নিজের জন্য কাজ করে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়। কিছু নীতি, যেগুলির কথা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি প্রথম বলেছিল, সেগুলিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে প্রভূত সমর্থন লাভ করেছে। তবুও বিশ্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত রয়েছে।

> এই নীতিগুলি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের বান্দুং সম্মেলনে প্রথম সহাবস্থানের পাঁচটি নীতি বা 'পঞ্চশীল' হিসাবে উপস্থাপিত হয়। ২৬ এককে আপনারা পড়েছেন যে জওহরলাল নেহেরু পঞ্চশীলের অন্যতম রূপকার ছিলেন।

প্রথম রয়েছে "উন্নত" বা "শিল্পায়িত" দেশগুলি, যার মধ্যে আছে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, জাপান ইত্যাদি যে দেশগুলি বহু শতাব্দী ধরে উপনিবেশগুলির ওপর প্রভুত্ব করেছিল ও উপনিবেশগুলি থেকেই অর্থসম্পদ শোষণ করে নিজেরা উন্নত হয়েছে।

দ্বিতীয়, ভূতপূর্ব "সমাজতন্ত্রবাদী" শিবিরের দেশগুলি, যেমন ভূতপূর্ব সংযুক্ত সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাদি। এদের মধ্যে নিকট অতীতে এক মজবুত পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

তৃতীয়, "উন্নয়নশীল" দেশগুলি বা "তৃতীয় বিশ্বের" দেশগুলি, যারা মুখ্যত প্রথম বিভাগের দেশগুলির ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও যারা এখনও বাণিজ্য ও তথাকথিত "বিশ্ব বাজার"-এর সূত্রে "উন্নত" দেশগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে বাঁধা।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য অত্যধিক ও তা ক্রমবর্ধমান, যেহেতু অত্যুন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলির অধিগত। বিভিন্নভাবে এই বৈষম্যগুলির প্রকাশ দেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ আয়, বিনিয়োগ, পরিসেবা এবং প্রায় সমস্ত গবেষণা এই উন্নত দেশগুলির হাতে, যে দেশগুলিতে রয়েছে বিশ্বের মাত্র এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা, যদি এদের থেকে বাদ দেওয়া হয় ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলিকে। আমেরিকাতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য গ্রহণ ১৫৫০ পাউন্ড (১৯৬৫) থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯০০ পাউন্ড (১৯৭৫)—দেশ বছরে মাথাপিছু ৩৫০ পাউন্ডের বৃদ্ধি—যা কিনা ভারতবর্ষে প্রতিবছরে মাথাপিছু খাদ্যশস্য গ্রহণের প্রায় গোটাটাই। অনুরূপে মাথাপিছু শক্তি ব্যবহার আমেরিকায় এত বেশি যে বিশ্ব যদি এই হারে শক্তি ব্যবহার করত তবে এক দশকের মধ্যেই গ্রহের নবীকরণ অযোগ্য সব সম্পদই নিঃশেষিত হয়ে যেত। বৈষম্যগুলি প্রধানত উপনিবেশের সময়ে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আগেই যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একবার লব্ধ সুযোগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩২.২.১ প্রযুক্তি—প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার

জ্ঞানের উৎপাদন ও পুস্তক পত্রিকাদির মাধ্যমে তার বণ্টন বহুলাংশে উন্নত দেশগুলির করতলগত। মনে করা হয় যে ভূতপূর্ব "সমাজতান্ত্রিক" শিবিরের দেশগুলিকে বাদ দিলে বৈজ্ঞানিক ও উন্নয়ন গবেষণা খাতে ব্যয়ের ৯৮%-ই হয় এই "উন্নত" দেশগুলিতে। বাকি দু শতাংশ ভাগাভাগি করে শতাধিক দেশ, যার মধ্যে পড়ি আমরাও!

আমাদের ভারতবর্ষে শত শত গবেষণাগার আছে এবং তাতে আমরা গর্বিত। কিন্তু যখন আমরা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের প্রচেষ্টার তুলনা করি তখনই বুঝতে পারি নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে। গবেষণা ও উন্নয়নের খাতে আমাদের ব্যয় ততটা উৎপাদনশীল হয় না, কারণ এর বেশিটাই কর্মীদের বেতন এবং গবেষণাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয়। উপকরণ, যা বহুলাংশে উন্নত দেশগুলি থেকে ক্রীত তা'ও আধুনিকতম নয়। এ ছাড়া আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথভাবে যুক্ত নয়। সাধারণভাবে আমাদের সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি এখনও এত অনগ্রসর যে আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) কার্যক্রমের কাছে তার খুব একটা চাহিদা নেই। অতি সামান্য প্রয়োজনে আমরা প্রযুক্তি, যন্ত্র বা অন্য উপকরণ আমদানি করি, অনেক সময় সে প্রয়োজন আমরা নিজেরাই মেটাতে পারি।

অধিকন্তু, মস্তিষ্ক নির্গমন (Brain drain) দ্বারা আমরা আক্রান্ত। হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় দশ লক্ষ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে গিয়ে উন্নত দেশগুলিতে বসবাস ও কাজকর্ম করছেন। এর পিছনে বহু কারণ আছে। উন্নত দেশগুলিতে আছে উৎকৃষ্টতর সুযোগসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ। দেশে উৎকৃষ্ট মানের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চাহিদা কম ও সেজন্য কর্মসংস্থানের সুবিধাও স্বল্প। উন্নত দেশগুলির দিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব সম্পদের এই প্রবাহের মূল্য উন্নয়নশীল দেশগুলি এদের থেকে যা সহায়তা পায় তার চেয়ে অনেক বেশি, এমনকি আর্থিক দিক থেকেও।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, সব নূতন আবিষ্কারই উন্নত দেশগুলি থেকে জন্ম নিচ্ছে। তারা চমকপ্রদ প্রযুক্তি সৃষ্টি করছে, আমরা শুধু চমৎকৃত হচ্ছি! আমরা একেবারে আধুনিকভাবে যা কিছুই করতে যাই—বিশেষ রকমের ইস্পাত তৈরি বা সার বা বিমান, আমাদের খুঁজতে হয় উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তি। যদি আমরা পুরানো হয়ে যাওয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিনিস উৎপাদন করি, আমরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তা বিক্রয় করতে পারব না। একই ব্যাপার প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম, রেডার (RADAR) বা ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে। হয় আমরা তাদের সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করব, নতুবা নিজেদের সুরক্ষিত করতে পারব না।

আমরা পর্যায় ৭-এ দেখেছি যে, প্রযুক্তির আমদানি আমাদের পর-নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। উন্নত দেশগুলি তা জানে। তাই তারা শুধু উচ্চ মূল্যই আদায় করে ক্ষান্ত হয় না, বরং অন্য নানা অর্থনৈতিক ও কখনও কখনও রাজনৈতিক সুবিধাও আদায় করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বলে থাকে যে আমাদের মুক্ত বাণিজ্যে বিশ্বাস রাখা উচিত এবং আমাদের নবীন শিল্পকে সুরক্ষা বা ভরতুকি বাবদ সাহায্য করা উচিত নয়। তারা আমাদের বলে যতটা কম সম্ভব জনকল্যাণকর পরিকল্পনা করতে যেহেতু সেই ব্যয় উৎপাদনশীল নয়। অপর দিকে তারা তাদের নিজেদের শিল্পকে সুরক্ষিত করে এবং বাজারকে বাঁধে এমনভাবে যে আমাদের কাঁচামাল সস্তায় বিকায় আর তাদের তৈরি মাল অধিক আয় করে।

উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকটাই এমন এমন ক্ষেত্রে বিকশিত হচ্ছে যেগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আদৌ নেই। আমাদের মতো একটু অগ্রসর দেশও বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রের বড়ো বড়ো উন্নতির

পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছে না, গোপনতার কারণে অথবা প্রযুক্তির সেই কৌশলগুলি অত্যন্ত অগ্রসর বলে। উন্নত দেশগুলি প্রতি বছর শত শত কোটি ডলার ব্যয় করে কাঁচামালের কৃত্রিম বিকল্প (synthetics), প্লাস্টিক, তন্তু (fibres) ও কাচের পিছনে। অনেক ক্ষেত্রেই এই দ্রব্যগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎপন্ন রবার, কার্পাস, টিন ও বনস্পতি তেলের মত কাঁচামালের স্থান নিয়ে নেয়।

অধিকন্তু, উন্নত দেশগুলিতে বিকশিত প্রযুক্তিসমূহ বেশি মূলধন নির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম শ্রমনির্ভর। এধরনের প্রযুক্তিসমূহ আমদানি করে আমরা অধিক মূলধন ব্যয় করে ফেলি। আমাদের শ্রম-বল ব্যবহৃত হয় না এবং উৎপন্ন সামগ্রীর অধিকতর মূল্য হয়, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয় না। এভাবে উন্নত দেশগুলির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত মান আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর খুব একটা সুস্থ প্রভাব ফেলে না। উপরন্তু তা আমাদের সাধারণ অনগ্রসরতাকে চিরস্থায়ী করে, যদিও আমাদের জনসংখ্যার ছোটো একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বর্গ এর সুফল ভোগ করে।

অনুশীলনী ১

আপনি নিশ্চয় সংবাদপত্র পড়েন। দুটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতে পারবেন, যেখানে প্রযুক্তি আমদানি করা হয়েছে? প্রদত্ত পরিসরের মধ্যে উত্তর লিখুন।

....

....

....

....

৩২.৩ নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস

উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশই পঞ্চাশের দশকে ঔপনিবেশিক জোয়াল অপসৃত করেছে এবং তিরিশ বছর বা তার বেশি সময় ধরে সেই ধরনের বিকাশের জন্য কষ্ট করছে যাতে তাদের সমগ্র জনগণের উপকার হতে পারে। আপনারা উপলব্ধি করে থাকবেন যে, আমাদের সময়ের বিশেষ আবশ্যকতা হল এমন উন্নয়ন বা উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় প্রয়োজন তথা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা মেটাবে। এই মুহূর্তে এই দেশগুলির জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে জমা হচ্ছে দারিদ্র, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, বেকারি এবং অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। এই সমস্যাগুলি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং পরিবেশের ওপর চাপের একটা ক্রমিক কারণ সর্বব্যাপী মানবিক বিকাশের জন্য সংস্থানের অভাব। অনেক দেশই এমন একটা সমাজ পুনর্গঠন চেয়েছে যেখানে সমগ্র জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোই হবে উন্নয়নের প্রথম দাবি। কিন্তু এধরনের বিকাশ বহুল পরিমাণেই আমাদের হাতের বাইরে থেকে গেছে।

আমরা আমাদের জাতীয় প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নীতি বাছতে পারিনি। আজকের প্রচণ্ডভাবে পরস্পর নির্ভরশীল জগতে অনেক শক্তিশালী দেশের ক্ষমতাবৃদ্ধির সার্বিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিল্প-সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত ঘটছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অবস্থার চাপে উন্নয়নশীল দেশগুলি যা উন্নত দেশগুলির পক্ষে সবথেকে সুবিধাজনক তাই করতে বাধ্য হয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্য উন্নত দেশগুলি থেকে আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে হয় এবং যেমন যেমন তারা নূতন অস্ত্র প্রবর্তন করে তেমনভাবেই আমাদের বদলে নিতে হয়। আমরা তাদের কাছ থেকে আধুনিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করি বা ওই দ্রব্যসমূহের উৎপাদন করার জন্য তাদের কাছ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করি। এমনকি আমরা যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করি সেগুলির রপ্তানী মূল্যও তারাই নির্ধারণ করে।

ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের জীবনধারণের দৈন্যদশা দূর করতে চাইলেও তাদের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের এক সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। সে পথটি উন্নত দেশগুলি যে স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে তার অনুকরণ হবে না। এই প্রসঙ্গে "উন্নয়নের বিকল্প রণনীতি" কথাটি ব্যবহৃত হয়। আমরা অপর কাউকে অনুকরণ করব না, জনসাধারণের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব পথ বার করব।

আমরা এক নূতন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই যা হবে একদিকে প্রতিযোগিতা ও উদ্যম এবং অন্যদিকে মানবকল্যাণ ও পরিকল্পনার এক সমন্বয়। এমন রণনীতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে উন্নয়নের চরিত্র, বিষয়, দিশা এবং গতি দৃঢ়ভাবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। রণনীতির পর আসবে উৎপাদনের পুনর্বিন্যাস, সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও সমস্ত প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বণ্টনের এক পরিকল্পনা। জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৃজন ও প্রয়োগের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে এ ভাবনাগুলি এত প্রবল ছিল যে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ এক প্রস্তাব অনুমোদন করে যার নাম হল "নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস—কর্মের ঘোষণা ও পরিকল্পনা"। তা থেকে এমন কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যার মধ্যে চলতি অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে। এই সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ১-এ বলা হয়েছে, "গত কয়েকটি দশকের বৃহত্তম ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব এই যে, অনেক জাতি ও দেশ ঔপনিবেশিক ও বিদেশি-প্রভুত্ব থেকে মুক্ত জাতিদের সংঘভুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে। গত তিন দশকে অর্থনৈতিক কাজের সর্বস্তরে এসেছে প্রযুক্তিগত প্রগতি যা গড়ে তুলেছে জাতির কল্যাণসাধনের এক জোরদার সম্ভাবনা। তবু বিদেশি ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের রেশ, বৈদেশিক দখলদারি, জাতিগত বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ ও নয়া ঔপনিবেশিকতা আজও সংশ্লিষ্ট উন্নয়নশীল দেশ ও জাতিগুলির পরিপূর্ণ মুক্তি ও প্রগতির পথে বৃহত্তম বাধা। প্রযুক্তিগত উন্নতির লাভ আন্তর্জাতিক পরিবারের সব সদস্য সমানভাবে উপভোগ করছে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যার ৭০%, কিন্তু তারা উপায় করছে বিশ্ব আয়ের মাত্র ৩০%। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিন্যাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবারের বিকাশের সমতা বিধান ও ভারসাম্য রক্ষা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেরই স্বাধীন রাষ্ট্র বলে অস্তিত্ব ছিল না এবং যা কেবল বৈষম্যকেই চিরস্থায়ী করে সেই অবস্থার মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে।"

অনুচ্ছেদ ৪-এ স্পষ্ট করে যে নীতিগুলির ওপর নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তিকে দাঁড় করানো যেতে পারে সেগুলির কথা বলা হয়েছে। উদ্ধৃতি ঃ "নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস অনুবর্তী নীতিগুলিকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ...প্রতি রাষ্ট্রের নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর সম্পূর্ণ ও স্থায়ী সার্বভৌমত্ব থাকবে। এইসব সম্পদকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজের নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ উপায়ে সম্পদ ও তার ব্যবহারের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার অধিকার থাকবে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই। এই উপায়গুলির মধ্যে থাকবে জাতীয়করণ অথবা দেশীয় ব্যক্তির নামে মালিকানা বদল করার অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় রাষ্ট্রের পূর্ণ ও স্থায়ী সার্বভৌমত্ব। এই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বাধীন ও সম্পূর্ণ প্রয়োগকে বাধা দেওয়ার জন্য কোনও রাষ্ট্রকেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনরকম চাপ দেওয়া যাবে না।"

আরও ঃ "উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্য-শর্তের (terms of trace) অসন্তোষজনক অবস্থার ক্রমোন্নতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রসারের উদ্দেশ্যে (দরকার) তাদের রপ্তানি করা কাঁচামাল, প্রাথমিক দ্রব্য, সম্পূর্ণ তৈরি ও আধা তৈরি মালের মূল্য এবং আমদানি করা কাঁচামাল, প্রাথমিক দ্রব্য, তৈরি মাল, মূলধনি দ্রব্য ও উপকরণের মূল্যের মধ্যে ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য সম্বন্ধ।"

এটা বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেমন অবস্থা বর্তমান রয়েছে তার একটা ধারণা দেবে। যে সমস্ত দেশের শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিকাশে এখন একটা বড় রকমের উন্নতি দরকার চালু অবস্থা তাদের পক্ষেই অসুবিধাজনক।

অনুশীলনী ২

ঠিক ঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান ভরতি করুন :

(ক) চালু .... -এর মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবারের .... এবং .... উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব ....।

(খ) প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব .... ও সব .... -এর ওপর সম্পূর্ণ .... -এর ওপর ভিত্তি করে নুতন আন্তজার্তিক অর্থনৈতিক বিন্যাস নির্মাণ করা উচিত।

৩২.৪ বাতিল অতিকথা

অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে, যে সমস্ত ধ্যানধারণাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) ঠিক পরে জনপ্রিয় ছিল বাস্তবে সেগুলির যথার্থতা প্রমাণ হয়নি। যেমন, ভাবা গিয়েছিল যে প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে ক্রমশ তার আগের পঞ্চাশ বা একশো বছর ধরে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, ভূতপূর্ব সোভিয়েত সংঘ বা জাপান যে দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। ভাবা গিয়েছিল যে, শিল্পে অত্যুন্নত দেশগুলি ব্যাংকের ভূমিকা নেবে যেখান থেকে মূলধন, দক্ষতা, প্রযুক্তি, পরিচালন প্রভৃতি "সাহায্যের" মাধ্যমে হস্তান্তর হয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জীবনের মান উন্নত করতে পারবে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণ ধারণা ছিল যে, জনহিতার্থে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনায়াসে চলে আসতে পারবে। এই ধারণাগুলি ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে।

স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে 'পাগওয়াশ' নামের এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমাবেশে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল : "এটাই বাস্তব যে (তথাকথিত বিশ্ব) প্রযুক্তি বিপ্লব সৃষ্ট, পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হয়েছে কেবলমাত্র অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত উদ্দেশ্যগুলি হাসিল করার জন্য; অধিকন্তু এটি ঘটাচ্ছে প্রাথমিক সম্পদের এক অভূতপূর্ব অভাবে এবং তাদের ব্যবহারে দুশ্চিন্তাজনক এক অসম বণ্টন—ক্রমবর্ধমান একটি অংশ ভোগ করছে শিল্পোন্নত দেশগুলি"।

> অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও বারট্রান্ড রাসেলের ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের একটি আন্দোলনের নাম 'পাগওয়াশ'।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে মানব অগ্রগতির চাবিকাঠি হচ্ছে জ্ঞান। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর উন্নত দেশগুলি আমাদের দেশের ভিতরে জ্ঞান বিস্তারে আর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেনি। কিন্তু তাদের ও আমাদের কাছে লভ্য জ্ঞানের স্তরে এক বিরাট ফারাক বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। একক ২৮-এ আপনারা পেটেন্ট আইন সম্বন্ধে পড়েছেন যা জানা পদ্ধতিতে কিছু তৈরি করতে আমাদের বাধা দেয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও জ্ঞানের প্রবাহ অবাধ নয়। জ্ঞানের আছে সম্ভাব্য প্রয়োগ। তার ফলে যদি উন্নয়নশীল দেশগুলি নূতন ধরনের দ্রব্য তৈরি করে ফেলে! তাই আছে বাধা। বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ছাড়াও আছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তারের ওপর সরকার আরোপিত বিধিনিষেধ। উদাহরণস্বরূপ একক ৩০-এ আপনারা পড়েছেন অতিপরিবাহিতার কথা। অতিপরিবাহিতার বিষয়ে যা অবাধে প্রকাশ করা হয় তা উন্নত দেশগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যা আবিষ্কৃত হচ্ছে তার এক ভগ্নাংশ মাত্র জীবপ্রযুক্তি, আলো-বিবর্ধনের লেসার যন্ত্র, পরমাণু বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও অনেক নূতন উদ্ভুত বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তারা চায় না যে, আমরা এ সবের কিছু কিছু ধারণাকে পরিণত করি উৎপন্ন দ্রব্যে, যেগুলি তাদের দেশে বাজার পাবে অথবা আমাদের দেশে তাদের ওই ধরনের মালের বাজার বন্ধ করে দেবে।

শুধু তাই নয়, বেশ কিছু উদাহরণ থেকে দেখা যায় যদি আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে এক নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায় তবে সেটিকে ডুবিয়ে দিতে সবরকম প্রয়াস করা হয়। আমাদের দেশে এমন হতাশ গবেষকের সংখ্যা বিরল নয়, যাদের সমর্পিত প্রয়াস শেষ মুহূর্তে প্রণালী বা বস্তুটিকে আমদানি করার ফলে কোন কাজেই আসেনি।

৩২.৫ স্বনির্ভরতা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জাতীয় বিকাশের রূঢ় বাস্তবতার এই ঐতিহাসিক শিক্ষার ভিত্তিতে "স্বনির্ভরতা"র এক নূতন ধারণা জনপ্রিয় হয়েছে বিশেষত উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে। এটা বোঝা গেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা চরম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা এমন অধীনতার অবস্থায় সম্ভবপর নয়, যেখানে ব্যক্তি বা জাতি থাকবে দাতার করুণার অপেক্ষায়। অতএব দেশকে তার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিকে এমনভাবে যুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে যে বহির্গত চাপ সত্ত্বেও সে নিজের স্বার্থে স্বাধীনতা সিদ্ধান্ত নিতে ও তাকে কার্যকরী করতে পারবে।

স্বনির্ভরতা মনের সেই অবস্থাকে বলা যেতে পারে যা নিজের প্রতি ও নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির উক্তি প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে এ ধারণাকে অর্থময় করা যেতে পারে। যেমন, যদি অর্থনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যের মধ্যে নানা বিকল্প থাকে সেগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত যেগুলি অন্যান্য দেশের ওপর সবচেয়ে কম সম্ভব নির্ভর করে পূরণ করা যেতে পারে। যদি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে নানা বিকল্প থাকে সেগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হবে যা আমাদের নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যদি বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে বাছাই করার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে যেগুলি দেশের মধ্যে লভ্য, ইত্যাদি। স্বভাবতই তার সাথে সাথে চালাতে হবে যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সাহায্যে আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ। এভাবে আমাদের বিকল্প খোঁজার মোট ক্ষেত্রটিকে ক্রমাগত প্রসারিত করতে হবে।

"Every country must follow its own path to consolidate its independence and to solve its problems with its own inner capacity. The experiences of others do help, but each must make its own assessment and choice and decide what to accept and what to reject. We feel that if our sights are fixed on the star of self-reliance, we cannot go wrong. Independence does not conflict with interdependence, nor self-reliance with co-operation but all relationships must be on the basis of equality and mutual respect."

—Indira Gandhi

স্বনির্ভরতা মানে বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, যা আবশ্যক বা অপরিহার্য তার আমদানি বন্ধ করাও নয়। আসলে তার মানে "পরিহার্য" ক্ষেত্রটিকে বৃদ্ধি ঘটানোর ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা।

এর অর্থ বিলাসের দ্রব্য নির্মাণ বা আমদানির গুরুত্ব হবে সর্বনিম্ন। রেলে প্রতি ঘণ্টায় ২০০ কিমি বেগে গাড়ি চালানো তেমন জরুরি নয়, যেহেতু মালমশলা ও প্রযুক্তি আমদানি করতে হবে। বরং গুরুত্বপূর্ণ আরও বেশি রেলগাড়ি চালানো এবং আমাদের দেশের দূর প্রত্যন্তের জন্য আরও বেশি রেলপথ খোলা। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের ক্রমোন্নতিশীল প্রযুক্তির দ্বারা যা নির্মাণ করতে পারি তার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে হবে, তবে তার পরেও যা পড়ে থাকবে এবং যাকে সর্বাধুনিক হতে হবে তা ক্রয় করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা সোভিয়েত সহাতায় মিগ ২১ যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে কারখানা স্থাপন করেছিলাম, তখনই তার ক্রমোন্নতির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন ক্রিয়াকলাপও আরম্ভ করা উচিত ছিল যাতে বিমানের পরবর্তী নকশায় আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি আরও বেশি করে থাকতে পারত।

বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ যে সব সমস্যার সঙ্গে জড়িত সেগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে স্বনির্ভরতার নীতি চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়। আমাদের জনসংখ্যার ৭০% গ্রামে বাস করেন। তাঁরা কদাচিৎ এমন জিনিস ব্যবহার করেন যার জন্য আমদানিকৃত দ্রব্য যা প্রযুক্তির প্রয়োজন হতে পারে। আজ যদি ডাল ও ভোজ্য তেল আমদানি করা হয়, তবু আমরা অতি সহজেই এসব ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের বিরাট জনসংখ্যার এত ধরনের দাঁতের মাজন, চুল ধোয়ার শ্যাম্পু, সাবান, বৈদ্যুতিক দাড়ি কামাবার যন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন নেই, আছে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, বাসস্থান ও অনুরূপ বস্তুর প্রয়োজন। তাঁদের অবস্থার উন্নতি সাধনের দিশায় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন হবে না, তাদের প্রলোভন এবং চাপের সম্মুখীন হতে হবে না, এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি জাতিকে অধিকতর সন্তুষ্ট ও দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সংগতভাবেই এটা বলা যেতে পারে যে, আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি যা প্রচার করেছিলেন ও ব্যক্তিগতভাবে যা পালন করেছিলেন তারই অনুসারী হবে এই স্বনির্ভরতা। এ বিষয়ে তিনি 'স্বদেশী' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

স্বদেশীয় প্রচার ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত অস্ত্র। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসাধারণের কল্যাণ ছাড়াও তা এনে দিয়েছিল এক জাগরণ যা ভারতবাসীদের দিতে সমর্থ হয়েছিল শক্তি, ঐক্য ও সর্বোপরি নিজেদের সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এ ধরনের অস্ত্র গান্ধিজি ব্যবহার করেন জেলাস্তর থেকে গ্রামের স্তর পর্যন্ত এবং এর ফলে সমস্ত দেশ জেগে উঠেছিল।

আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমরা যে ধরনের স্বনির্ভরতার আলোচনা করছি তাতে জড়িত আছে বিভিন্ন স্তরে বিকল্প বাছাই ও ক্রিয়াকলাপ; ব্যক্তি স্তরে (আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তি), গ্রাম, জেলা ও রাজ্য স্তরে, অথবা খেতে, কারখানায়, বিদ্যালয়ে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। তাই এটিকে এমন একটি আন্দোলন হয়ে উঠতে হবে যার মধ্যে জনসাধারণ অংশ নেবে এবং সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে এটি হয়ে দাঁড়াবে উন্নতির নূতন রণনীতি।

৩২.৫.১ জাতীয় উন্নতিবিধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক প্রধান জাতীয় সম্পদ ও স্বনির্ভরতা অর্জনের কাজে মরণ-বাঁচনের এক উপাদান। যে স্বনির্ভরতার আদর্শের কথা ওপরে বলা হল তার পটভূমিকায় জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কী ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে? আপনারা তো জানেন যে, সকলের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা আজও আমাদের সমাজের সবচেয়ে জরুরি আবশ্যকতা। এই অভাবগুলি দ্রুত পূরণের জন্য চাই কৃষি, খাদ্য প্রযুক্তি,

স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও ঔষধ, বাসস্থানের সরঞ্জাম, বস্ত্র ও নূতন সম্পদ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নূতন অগ্রগতি। আমাদের নিজেদের সমাজ বা অর্থনীতির পক্ষে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধান আমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি কর্মের সামনে এক মৌলিক চ্যালেঞ্জকে হাজির করেছে এবং এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নূতন প্রশ্নাবলি ও নূতন উত্তরমালা, নূতন নূতন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান কর্মের নূতন নূতন ক্ষেত্র বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এই প্রচেষ্টায় উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করতে লাগবে মানুষ, সরঞ্জাম ও চিন্তার সম্পদের সমবেত ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি। ভারতবর্ষে আমাদের আছে বস্তু উপাদান ও বুদ্ধিমান মানুষের বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ সমাহার। আমাদের একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও আছে যার মাধ্যমে ধারণা পরীক্ষিত হতে পারে এবং যা সর্বশ্রেষ্ঠ তা গৃহীত হতে পারে। করণীয় কাজ হচ্ছে সবধরনের জ্ঞানের এমন অনুকূলে ব্যবহার করা, সে সমাজবিজ্ঞানই হোক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি, যাতে তা সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার কাছে পৌঁছাতে পারে। ভালো হয় যদি আমাদের সমাজ শিক্ষার সর্বস্তরে এমন সৃজনশীল ও সমালোচনাক্ষম চিন্তাবিদ সৃষ্টি করতে পারে যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সমস্যাগুলির ওপর ভিত্তি করে সামাজিক বাস্তবতাকে প্রশ্ন করবেন। যে ধারণাগুলি জনসাধারণ ও আমাদের সমাজের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান কোনও প্রশ্ন না করে গ্রহণ করেছে সেই ধারণাগুলিকে আবার পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। অনুন্নতির দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কাজটিকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য ধরনের জ্ঞান সমাজগুলির বর্তমান কাঠামো, তাদের ব্যবসা, শিল্প ও উপকার বণ্টনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আশা করা যাক ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঠিক পথে আমাদের দেশকে নিয়ে যেতেও এদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা দেখা যাবে।

অনুশীলনী ৩

ঠিক ঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান ভরতি করুন :

(ক) স্বনির্ভরতা ....-এর এমন একটি .... যা নিজের ওপর .... বাড়ায়।

(খ) .... র ....-তে ....-এর স্বাধীনতা অসম্ভব।

(গ) স্বনির্ভরতার জন্য আমাদের .... উন্নয়নের সাহায্যার্থে লাগবে ...., ... ও ....।

৩২.৬ সারাংশ

এই এককে আপনারা শিখেছেন যে আবহমানকাল ধরে মানুষের সমতা ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজের অনুসন্ধান সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র। একদিকে রয়েছে ধনী ও উন্নত দেশগুলি যারা বিশ্ব সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে রয়েছে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলি যারা এই জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে স্বহিতার্থে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে না; পারে না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফল তাদের বিশাল জনসংখ্যার কাছে পৌঁছে দিতে। এই উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ সম্পদ ও জ্ঞানের সমবণ্টনের ভিত্তিতে এক নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির আহ্বান। তারা চায় স্বনির্ভরতা যাতে তাদেরও থাকে বিকল্প ও কর্মের স্বাধীনতা। তারা বিকাশের এমন এক পথের সন্ধান করে যে পথ ধরলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যাবে তাদের বিশাল জনগণের উন্নতির জন্য।

৩২.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। নূতন আন্তর্জাতিক বিন্যাসের সারমর্ম বর্ণনা করুন। ভারতবর্ষ এতে কীভাবে লাভবান হতে পারে?

২। (ক) স্বনির্ভরতার জন্য কী কী আবশ্যক?

(খ) দুটি ক্ষেত্রের উদাহরণ দিন যেখানে আমরা বহিরাগত প্রযুক্তি বা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নই।

৩২.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। বিমান, কম্পিউটার, রঙিন দূরদর্শন যন্ত্র ইত্যাদি।

২। (ক) আন্তর্জাতিক বিন্যাস, সুষম, ভারসাম্যযুক্ত, নয়।

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সার্বভৌমত্ব।

৩। (ক) মন, অবস্থা, বিশ্বাস।

(খ) পরনির্ভরতা, অবস্থা, ক্রিয়াকলাপ/কর্ম।

(গ) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। এতে অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় :

- ঔপনিবেশিক ও বৈদেশিক প্রভুত্ব থেকে মুক্তি।
- প্রযুক্তিগত উন্নতি ও তার বণ্টন।
- প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর সার্বভৌমত্ব।
- বিশ্ব অর্থনীতির বিস্তার ও বাণিজ্যের জন্য উৎকৃষ্টতর শর্তাবলি।
- কাঁচামাল, প্রাথমিক দ্রব্য, মূলধনি দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি-রপ্তানির জন্য ন্যায্য মূল্য।

যেহেতু ভারতবর্ষ উন্নত দেশগুলিতে অনেক কাঁচামাল সরবরাহ করে ও তাদের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রীও আমদানি করে, তাই এই বস্তুগুলির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে সহায়ক হবে।

এই নির্দেশক-রেখাগুলির ওপর ভিত্তি করে আপনার উত্তর বিস্তৃত করুন।

২। (ক) আত্মবিশ্বাসের বিকাশ।

কর্মের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তের স্বাধীন প্রয়োগ।

আপন স্বার্থে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির অগ্রগতি।

(খ) রেল, এইচ. এম. টি. ঘড়ি ইত্যাদি।

উপসংহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর এই বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমে আমরা অনেকটা ক্ষেত্র পরিক্রমা করেছি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যার বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন এক মহৎ মানবিক প্রচেষ্টা হিসাবে বিজ্ঞানকে উল্লেখ করে আমরা আপনাদের বিশেষভাবে ভারতের প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলেছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের পদ্ধতির ওপর মন্তব্য দিয়ে ওই অংশটি শেষ হয়েছিল।

তারপর আধুনিক ভারতের একজন নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশেষ বিশেষ আকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে যাত্রা করার সময় এল। কিছুটা খুশিমতোই আমাদের বিষয় নির্বাচন হয়েছে। এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী গ্রহকে অবস্থিত করার জন্য আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপর আমরা আলোচনা করেছি প্রাণের উদ্ভব এবং মানবজাতি অবধি তার ক্রমবিবর্তন নিয়ে। আপনাদের সঙ্গে আমরা আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীর পরিবেশ, পরিবেশ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহে অভিযান চালিয়েছি।

খাদ্য, কৃষি ও রোগ আমাদের কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাই এই বিষয়-সংক্রান্ত কিছু কিছু খুঁটিনাটি ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটানো হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা মন ও

দেহের অতি চিত্তাকর্ষক বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি। সেখানে আমরা আভাস পেলাম মনোবিজ্ঞানের এবং যোগাযোগ নামে সেই শক্তিশালী হাতিয়ারটির যেটি আজ মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন ও ব্যবহারের বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপর আমাদের বিচরণ আমাদের নিয়ে গেল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলীর দিকে। এর পর একটু ভবিষ্যতের ইঙ্গিত—নূতন, আগতপ্রায় প্রযুক্তিগুলি।

হয়তো খুব অল্প পরিমাণে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যম ছাড়া যাঁরা আদৌ বিজ্ঞান পাঠ করেননি সেই যুব-পাঠকদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিস্তৃত নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেকার বাস্তবমুখী, যুক্তিনির্ভর ও খোলামনের ভাবটি দেখাতে চেষ্টা করেছি। আমরা এও নির্দেশ করতে চেয়েছি যে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞানের কিছু বিমূর্ত কথাই নয়, পরিবেশ থেকে দেহে, মনে, মানবসমাজে বিরাজমান যে বাস্তবতা, এটি তারই জ্ঞান। বাস্তবেরই এক অংশ হওয়ার জন্য বিজ্ঞান ভিতর থেকে বস্তুজগৎ ও সমাজের বাস্তবতায় পরিবর্তন আনতে পারে।

যখন বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার মিলনতল নিয়ে আলোচনা চলে তখন লেখকেরা বাস্তবকে কেমন চোখে দেখেন বা তাঁদের বিশ্বদর্শন কী, সেই প্রশ্নও এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। এটি অবশ্যম্ভাবী। অতএব ভারতীয় সমাজ ও তার সমস্যাবলি বা ঔপনিবেশিকরা যে দেশগুলিকে শাসন করেছিল তাদের কী করেছিল বা কীভাবে সংযোগ-মাধ্যম সাধারণ মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যোগায়, বাস্তবিকপক্ষে সব কিছুতেই আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত থেকেছে। আমাদের যদি কোনও দৃষ্টিভঙ্গি না থাকত অথবা আমরা যদি আপনাদের সামনে একটি নির্বীজিত চিত্র তুলে ধরবার জন্য সেটিকে দমন করে রাখতাম, তবে আপনাদের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হত। এই ধরনের পরিবেশন হত তথ্য-তালিকা-সারণির এক খিচুড়ি, তাতে কোনও বক্তব্য থাকত না। কোনও কোনও লেখক এরকম করতে সমর্থ কিন্তু তাঁদের আবার প্রতিটি বিষয়কে এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য দায়ীও করা হয়—হয়তো তাঁরা কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই এটি করে থাকেন।

কিন্তু আমরা অনবরত আপনাদের নিজেদের চিন্তা করার জন্য চাপ দিয়েছি। চাপ দিয়েছি সামনে উপস্থাপিত বিষয় নিরীক্ষণ করতে ও নিজস্ব ধারণার একটি বুনট গড়ে তুলতে। হয়তো আপনারা এই বিষয়গুলির কোনো কোনোটি আরও অনুধাবন করতে চাইবেন, সেটা হবে আমাদের সকলের পক্ষে একটি ইতিবাচক লাভ।

আমরা এই শিক্ষাক্রম বিভিন্নভাবেই শেষ করতে পারি। আমরা তা করব জওহরলাল নেহেরুর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি শুধুমাত্র একজন চিন্তাবিদ, একজন বৈজ্ঞানিক, আমাদের দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা, আধুনিক ভারতের একজন নির্মাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিত্তাকর্ষক বক্তা, চমৎকার বাক্যপ্রতিমা দিয়ে তিনি জনমানবের হৃদয় হরণ করতেন।

"যদিও আমি বহুদিন ভারতীয় রাজনীতির রথে তাড়িত ক্রীতদাস হয়ে আছি, অন্য চিন্তার জন্য থেকেছে অতি কম অবকাশ, তবু আমার মন প্রায়ই সেই দিনগুলিতে চলে যায় যখন ছাত্রাবস্থায় আমি বিজ্ঞানের আবাস কেম্ব্রিজের গবেষণারগুলিতে হানা দিতাম। যদিও অবস্থা বিপাকে বিজ্ঞানের সাথে আমি সংযোগ ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আমার চিন্তা সেদিকে ফিরে যেত। পরবর্তীকালে ঘুরপথে আমি আবার বিজ্ঞানের কাছে পৌঁছালাম যখন আমি উপলব্ধি করলাম যে বিজ্ঞান শুধুই সুখকর শখ বা মনন নয়, পরন্তু জীবনের সেই বুনট যাকে ছাড়া আমাদের আধুনিক বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে যেত। রাজনীতি আমাকে অর্থনীতিতে নিয়ে গিয়েছিল এবং তা অনিবার্যভাবে আমাকে নিয়ে এল বিজ্ঞানে ও আমাদের সমস্ত এমনকি জীবনকেই দেখার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। একমাত্র বিজ্ঞানই পারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ও প্রথা-পরম্পরার মারণচাপের এইসব সমস্যার সমাধান করতে। অপচয় হয়ে যাচ্ছে বিশাল সম্পদ, এক ধনী দেশে বাস করছে উপবাসী মানুষ—বিজ্ঞানই পারে এমন সমস্যার সমাধান করতে।"

(কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৩৭, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রদত্ত সম্ভাষণ থেকে।)